ঝরাপাতা

শ্রীসুরুচিবালা রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রাবণ—১৩৩১

মূল্য ২৲ টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙা

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকা

ঝরাপাতা

১
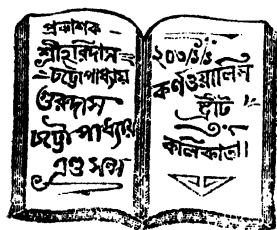
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া, অসময়ে ঘুমটা ভাঙ্গিয়া মনটা ত তিক্ত হইয়াছিলই, তাহার উপর প্রায় আধঘণ্টাতেও যখন একটা নিতান্তই সাধারণ অঙ্কও কিছুতেই মিলাইতে পারিলাম না, তখন মাথাটা গরম হইয়া স্কুলের উপর একটা বিদ্বেষ ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। আর মোটে একটা ঘণ্টা সময়, ইহারই মধ্যে সব পড়া শেষ করিয়া, স্নানাহার শেষ করিয়া স্কুলে ছুটিতে হইবে। স্কুলের 'বাস্' আসিয়া ত একটা মিনিটও দেরী করিতে পারে না, কোচম্যানের সেই গুরুগম্ভীর 'গাড়ী আয়া বাবা' শুনিলেই বুকের ভিতর যা কাঁপুনি উঠে!—স্নান খাওয়া সে ত সময়ের অনুগ্রহ এবং নিজের ইচ্ছা—কিন্তু বাকী কাজগুলো করা ত চাই-ই! হায়, হায়, যাব না আজ আমি স্কুলে—পড়া হইল না, যাব কি খালি বকুনী শুনিতে? কাল রাত্তিরে কেন কতগুলি বাজে গল্প শুনিতে বসিয়াছিলাম,—কি'সে আমায় পাইয়াছিল—যার জন্য শত ইচ্ছা সত্বেও পড়িবার ঘরে উঠিয়া আসিতে পারি নাই!

মা পাশের ঘরে জমা খরচের হিসাব করিতে করিতে ডাকিলেন—"যূঁথিকা, ঠাকুরকে একটু ঘি দিয়ে এসো ত মা, হিসেবটা না মিলিয়ে আমি উঠ্‌তে পাচ্ছি না।"

হুড় মুড় করিয়া চেয়ার টেবিল সরাইয়া, ধুপ ধাপ করিয়া জোরে

জোরে পা ফেলিতে ফেলিতে নীচে নামিয়া চলিলাম। মনে হইল, মা যদি এই রাগটা বুঝিতে পারেন ত ভালই হয়। রাগটা যদি মানুষে না-ই বুঝিতে পারে, তবে রাগের আর সার্থকতা কি! রাগের মাথায় মনে হইল, মা ভাগ্যিস 'মেয়ে' নন, আজ তা'হলে, এই জমাখরচের হিসাব ফেলেই না উঠ্‌তে হ'ত—আমার অঙ্ক মার জমাখরচের হিসাবের চেয়ে কোন অংশে কম? বরং মাকে কারো কাছে ত জবাব-দিহি কর্ত্তে হবে না—কিন্তু—হায়রে ছাত্রী জীবন!

আবার আসিয়া অঙ্কে হাত দিলাম, যতই রাগ করি, ক্লাশের পড়াটা না করিয়া গেলে ত আর চলিবে না!

মস্ মস্ মস্—নতুন জুতার শব্দ! চমকিয়া মাথা তুলিয়া চাহিলাম—কে?—প্রমোদ বাবু যে!

প্রমোদ বাবু ঘরে ঢুকিয়াই অভিনয়ের ভঙ্গিতে আমায় অভিবাদন করিয়া বলিলেন "মিস্ যূঁথিকা, সুপ্রভাত!"

আমি হাসিয়া বলিলাম "এসব কায়দা বুঝি আপনার বিলেতে শেখা!"

"নিশ্চয়! যাহোক একটা কিছু ত শিখে আসা উচিত,—হয় বিদ্যা—নয় ত অন্ততঃ পক্ষে কায়দাটাই!—কিন্তু সে যাক্,—আপাততঃ এক পেয়ালা গরম চা পেতে পারি কি?"

"হ্যাঁ, পারেন বৈ কি! আপনি মার ঘরে গিয়ে বসুন, আমি চা করে আন্‌চি।"

খাতার অঙ্কটা আমার আর শেষ হইল না, মনের মধ্যে কি ভাব নিয়া যে আমি অতিথি সৎকার করিতে উঠিলাম,—তা আমিই জানি!

অতিথি সৎকারটা সব সময়ে সত্যি ভাল লাগে না, বিশেষতঃ যখন ক্লাশে শিক্ষয়িত্রীর রক্তচক্ষুর কথা মনে জাগিয়া উঠে! দ্রুতহস্তে এক

পেয়ালা চা এবং এক থালা খাবার ঝির হাতে মার ঘরে পাঠাইয়া, আমি আবার আমার অঙ্কটা লইয়া বসিয়া পড়িলাম।

কিন্তু আবার সেই জুতার শব্দ!—চক্ষু চাহিতেই দেখিলাম, চায়ের পেয়ালা হাতে আবার ঘরে প্রমোদবাবু! হাসিয়া বলিলেন—"মনটা কোথায় ছিল কে জানে! তা, সে কথা মুখ ফুটে বল্লেই ত হোত, এ অভাগার মুখটা কেন আর নষ্ট করলে!"

আমি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম "বাঃ, সে কি! কিন্তু কেন বলুন ত, কি হয়েচে চা-টা?"

"চায়ে ত চিনি মোটেই দাও-ই নি, আর কি রকম ষ্ট্রং হয়েছে ছ্যাখ।"

"সত্যি! কি জানি! তা দিন, আমি বদলে আন্‌চি।" আবার উঠিলাম।

সাড়ে আটটা বাজিয়া গেল, প্রমোদবাবুর উঠিবার তবু নামটী নাই,—গল্পের পর গল্প—গল্প তাঁর আর ফুরায়ই না! আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম,—কিন্তু অগতির গতি না কি ভগবান,—তাই সিঁড়িতে দাদার পায়ের শব্দ শুনিয়া আশান্বিত হইয়া উঠিলাম, দাদা 'যূঁই' বলিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

অত্যন্ত অনুনয়ের সহিত দাদা বলিল, "পাঞ্জাবীর বোতামটা আমার কি করে হঠাৎ ছিঁড়ে গেছে, লক্ষ্মি দিদি, এক্ষুনি যদি না দিস্ একটু"—

চট্ করিয়া মাথাটা গরম হইয়া উঠিল, এবং বেশ একটু কড়া স্বরেই বলিলাম, "সত্যি দাদা, তোমাদের যদি একটু সময় অসময় জ্ঞান থাকে, আশ্চর্য্য!—এখনো আমার হিষ্ট্রি পড়া হয় নি, আঁকগুলো পর্য্যন্ত কষা হোল না,—কখন সব শেষ করব,—কখন বা খাব বল ত? 'বাস্' ত গেলো বলে—"

দাদা হটিবার ছেলে নয়, বলিল "অঙ্ক হয়নি? তা দে না, আমি

দিচ্ছি কসে। আর পড়া? বেশ ত, তার আবার অত ভাবনা কিসের! হিষ্ট্রি ত? তা হিষ্ট্রির প্রোফেসরই ত আমার সঙ্গে এসেছে, তোর আবার ভাবনা!—ও নরেন, নরেন, ও প্রোফেসর!"

"না, না, দাদা কর কি! ছি ছি, কি লজ্জা! না, কাউকে আমার কিছু করে দিতে হবে না, ক্লাসে গিয়ে বকুনী খেতে হয় তাও খাব, দাও তোমার পাঞ্জাবীটা,—অত সবাইকে ডাকাডাকি করে আন্‌তে হবে না।"

কিন্তু হায়, বৃথাই আমার অত কথা! নীচ হইতে সিঁড়ি বাহিয়া জুতার শব্দ ক্রমে বারান্দায় আসিয়া থামিল, নরেনবাবু দাদাকে ডাকিতে ডাকিতে ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন।

আমি লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলিলাম—"না, কিছু করতে হবে না. দাদার যত সব কাণ্ড!"

নরেন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "কেন তাতে হয়েছে কি? আমার ব্যবসাই ত ঐ, দিন না আমি দিচ্ছি পড়িয়ে, আপনাদের কোন্ হিষ্ট্রিটা আজকাল পড়াচ্ছে?"

আমি হাসিয়া বই বাহির করিয়া দিলাম, নরেনবাবু আপনি পড়িয়া পড়িয়া আমায় বুঝাইতে লাগিলেন, আমি দাদার বোতাম সেলাই করিতে করিতে নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, এত সব গোলমালে গৃহে বহুক্ষণ আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া প্রমোদ বাবু বহুপূর্ব্বেই মার ঘরে পলায়ন করিয়াছিলেন।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল, মা আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—"পড়া ছেড়ে একটু আগে উঠে গেলে কি হয় না যুঁই? তার পরে ত 'বাস' এলে তখন না খেয়েই গিয়ে উঠতে হবে!"

আমার বোতাম পরান হইয়া গিয়াছিল, কোনমতে টেবিলে ছড়ান বইগুলি একটু গুছাইয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

কিন্তু আমার ভাগ্য! প্রায় প্রতিদিনই যা হয়, খাইতে বসিবামাত্র কোচম্যানের সে গুরুগম্ভীর ভয়ানক শব্দ আসিয়া কাণে প্রবেশ করিল, মাখা-ভাতগুলি কিছু গিলিয়া কিছু চারিধারে ছড়াইয়া ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

তাড়াতাড়িতে তখন বইগুলি ভাল করিয়া গুছাইয়া নেওয়া হয় নাই, তাহার ফলে বাড়ীর গেটের কাছে আসিবামাত্র দুই তিনখানা বই এবং হাতের রুমালখানা কেমন করিয়া কি জানি হাত হইতে পড়িয়া গেল—প্রমোদবাবু বাহিরের ঘরটায় দাঁড়াইয়া বাবার সঙ্গে কথা বলিতে-ছিলেন, আমি নত হইয়া বইগুলি তুলিবার আগেই তিনি বইগুলি তুলিয়া লইলেন। রুমালখানাতে রাস্তার ময়লা কি কাদা, কে জানে কি লাগিয়া-ছিল, প্রমোদবাবু তাড়াতাড়ি নিজের পকেট হইতে একখানা পরিষ্কার ধোপাবাড়ীর পাট করা এবং হাস্নুহানার গন্ধে অভিষিক্ত রুমাল বাহির করিয়া আমার হাতে গুঁজিয়া দিলেন। 'বাস' ভরা মেয়ে—আমি চকিতে একবার সকলের মুখ চাহিয়া দেখিলাম। সেখানে দাঁড়াইয়া আপত্তি করাটা ভাল নয়, তাই কথাটি না বলিয়া ধীরে ধীরে 'বাসে' আসিয়া উঠিলাম, দেখিলাম, আমার সেই ময়লা রুমালখানা প্রমোদবাবু তাঁর পকেটে তুলিয়া ফেলিলেন। 'বাসে' দুই একজন আমায় হাসিয়া বলিল—"উনি কে ভাই ?"

আমি দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "কে, উনি ?—আমার দাদা !"

মেয়েরা পরিহাস করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া বোধ হয় একটু নিরাশ হইল, কিন্তু অন্তর্যামী ভগবান দেখিলেন, আমার মনে তখন কত লজ্জা !—ওপর হইতে কেহ দেখিয়া ফেলিল না ত !—

আশ্চর্য্য কিন্তু!—এই বিলাত-ফেরত নবীন ব্যারিষ্টারটির এত

করিয়া গায়ে পড়িয়া ভাব দেখান কেন? এ ভাবটা আমার মনে যেন ঠিক পরিপাক হয় না।

* * * *

সাড়ে চারটায় বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম,—'বাস্' খানিকটা দূরে থাকিতেই চোখে পড়িল, কি একখানা বই হাতে বাহিরের বারান্দায় আবার সেই প্রমোদবাবু! ক্রীম রংএর চাদরখানি ঘুরাইয়া গায়ে দেওয়া, এক হাতে বই এবং একটী রুমাল, অন্য হাতে একটী পেন্সিল,—ধীরে ধীরে সারা বারান্দাটীতে পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু আমাদের গাড়ীটী অতদূরে থাকিয়াও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে বাদ পড়িল না। কেন জানি না,—কিন্তু ইহাঁকে দেখিয়া আমার মনটি কোন দিনই খুব সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিত না—'বাস'টি নিকটে আসিতেই প্রমোদবাবু সরিয়া পার্শ্বস্থিত দাদার ক্ষুদ্র বৈঠকখানাটিতে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তথাপি প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার কেবলই তাঁহার সম্মুখে পড়িবার আশঙ্কা হইতে লাগিল।

বাস্তবিক আমার আশঙ্কাটা নিতান্ত অমূলক হইল না, দোতালায় উঠিবার পথে সহসা সিঁড়ির সামনে সহাস্যবদন প্রমোদবাবু আসিয়া আমায় অভিবাদন জানাইলেন এবং একটা হাস্যজনক গম্ভীরভাবে করজোড়ে বলিলেন—"আমার একটা আরজি পেস কর্ত্তে হবে, হুকুম হোক্।"

এই অভিনয়দক্ষ সুন্দর সুবেশী যুবকটীর উপর আমি মনে মনে যতই বিরূপ হই না কেন, প্রতি কথা এবং প্রতি চালচলনে ইহাঁর যে অদ্ভুত ভঙ্গিমা প্রকাশ পাইত, মনে মনে তাহাতে আমি যথেষ্ট আমোদই উপভোগ করিতাম—হাসিয়া বলিলাম—"কেন, কি চাই?"

উপর হইতে দাদার উচ্চধ্বনি শুনিলাম—"যূঁই এসেছিস? বাঁচিয়েছিস্, বাবা—আমার র‍্যাপারটা যে কোন্ ট্রাঙ্কে রেখেছিস্, শিগ্‌গীর বার করে দিয়ে যা, ওধারে—আমার মিটিংয়ের সময় হয়ে গেল; ঘণ্টা খানেক ধরে খুঁজে খুঁজে একেবারে হয়রাণ—"

আমি হাসিয়া প্রমোদবাবুর পানে চাহিয়া বলিলাম—"আপনি কি বলছিলেন?"

এবারে পরিহাস ত্যাগ করিয়া মুখে অনেকখানি অনুনয়ের ভাব আনিয়া প্রমোদবাবু বলিলেন—"চল, বায়স্কোপে যাই।"

"বায়স্কোপ?"

"হ্যাঁ,—আপত্তি আছে কিছু?"

"আর কে যাবে?"

"আবার কে! তুমি, আমি, আর মাসিমা।"

এই তুমি-আমির উপর ইচ্ছা করিয়াই, যে জোর টুকু দিলেন আমার তাহা ভাল লাগিল না। বলিলাম—"আচ্ছা, আগেতে উপরে যাই।"

উপরে, সম্মুখের ঘরটীতে পা দিয়াই প্রথমে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমার গায়ের সমস্ত রক্ত নিমেষে মাথায় উঠিয়া পড়িল,—আলনার উপর ধোপা বাড়ীর পাটকরা চাদরখানা রাখিয়া দাদা রাজ্যের যত বাক্স ট্রাঙ্ক ব্যাগ খুলিয়া ঘরময় জামাকাপড় ছড়াইয়া চাদর খুঁজিতেছে!—পুরুষ মানুষের চোখ কি ভগবান্ উল্টা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? আশ্চর্য্য বটে!

* * * *

সকাল বেলার সোণালী মনমাতানো রোদটী! দিনটী শনিবার—

স্কুলে যাইবার তাড়া নাই। ছাতের কোণে ইজিচেয়ারটীতে পা হাত ছাড়িয়া কুড়ের মত পড়িয়া ছিলাম। কাল “ইষ্টলিন” দেখিয়া আসিয়াছি। দুঃখিনী ইসাবেলের জন্য প্রাণটা আমার আজও কাঁদিয়া মরিতেছে। হায়রে হায়—স্বামীর অগাধ প্রেমে সন্দেহ করার ফলে সারাজীবন ভরিয়া এ কি নিদারুণ শাস্তি!—দোষ কিন্তু ছিল কারলাইলেরই। তিনি ইসা-বেলকে এত ভালবাসিয়াও তাঁহাকে কোন কাজের পক্ষেই বিশেষ প্রয়ো-জনীয় বলিয়া মনে করিতেন না,--এবং এই জন্যই বার্‌বারার সম্বন্ধে কোন কথাই তাঁহাকে জানান আর আবশ্যক মনে করেন নাই। এমন কি ইসাবেল যখন ঝি চাকরের পরস্পর কথোপকথন হইতে কিছু কিছু শুনিয়া এবং স্বচক্ষেও কিছু দেখিয়া কারলাইলকে কোন কিছু প্রশ্ন করি-তেন, কারলাইলের তখন তাঁহাকে কিছু গোপন করা উচিত হয় নাই। প্রাণমন দিয়া ইসাবেলকে তিনি কেবল ভালই বাসিয়াছিলেন, কিন্তু পুরুষোচিত ভাবে স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য করিতে পারেন নাই। অভিমানিনী ইসাবেল ইহাতে নিদারুণ আঘাত পাইয়া যাহা করিলেন, তাহাতে তাঁহার উপর মানুষের সহজে রাগ আসিতে পারে না। আমাদের বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে বোধ হয় এরকমটা করিত না। কিন্তু সেটা ইসাবেলের দোষ নয়, দোষ পাশ্চাত্য সমাজের সংযম-শিক্ষার অভাবে।

মনটা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মেয়েরা যতখানি ভালবাসিতে পারে, পুরুষ তাহা পারে না। অনুতপ্ত ইসাবেল আবার স্বামী-গৃহেই ফিরিয়া আসিয়াছিল, স্বামীকে ছাড়িয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু কারলাইল সে ছদ্মবেশিনী পত্নীকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি নবীন পত্নীর প্রেমে ভরপুর। ইসাবেলের অত ভালবাসা ভুলিয়া বার্‌বারার প্রেমে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া ডুবিয়া রহিলেন।

এই ত পুরুষ,—পুরুষের ত এই প্রেম! এই প্রেমে মেয়েরা এত

নির্ভর করিয়া কি করিয়া থাকে! যাহাকে সর্ব্বস্ব দিয়া নিজে রিক্ত হইয়া পড়ে;—হায়রে হায়, সে যে একটা নিছক্ ফাঁকা বই আর কিছুই নয়! এই ত পুরুষ!—ধিক্!

"ঈশ, যূঁই, বড্ড আরাম যে, শনিবারটা খুব করে উপভোগ করে নেওয়া হচ্ছে, না?—ওঠ্, ওঠ্,—" দাদার লাঠির খোঁচা খাইয়া আমার স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিয়া, ভারী রাগ ধরিল।—আমি বসিয়া বলিলাম,—"যাও দাদা, সব সময় তোমার ফাজলামী ভাল লাগে না—জান? ভারী এসেছেন আমায় শাসন কর্ত্তে! দাঁড়াও না, আমি বাবাকে সব বলে দিচ্ছি,—"

দাদা হাসিয়া বলিল—"ওরে, থাম্, থাম্, ভদ্রলোকের সম্মান রক্ষা কর্—ওহে প্রোফেসর, এসো এসো, বসো এখানটায়।—"

আমি চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম,—হরিবোল হরি—দাদা ত একলা নয়, সঙ্গী আছেন নরেন বাবু! আমি লজ্জা পাইয়া চলিয়া যাইতেছিলাম, দাদা বলিল "ওরে, যাস্নে, বোস্—নরেনের এস্রাজের একটা গৎ শুনে যা।—"

বাজনা চলিতে লাগিল, কি সে বাজনা, কি সে সুর!—উঃ—আমার বুকটা কেমন করিতে লাগিল। বার বার নীচে যাইবার কথা মনে পড়িতেছিল, কিন্তু পারিলাম না—কতক্ষণ যে এমনি ভাবে কাটিল, বলিতে পারি না। সহসা সমুখে মাকে দেখিয়া আমার সে চমক ভাঙ্গিয়া গেল। মা আসিয়া একটা মোড়া টানিয়া সেখানেই বসিয়া পড়িলেন এবং আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"যূঁই, নীচে দুটো সেমিজ কেটে রেখেছি, সেলাই কর্ গে যা।"

বারান্দায় সেলাইর কল লইয়া বসিতেই, সুমুখের সিঁড়ি বাহিয়া যাহাকে উপরে উঠিতে দেখিলাম, মনের এখনকার এ অবস্থায় আমি

তাহাকে মোটেই প্রত্যাশা করি নাই, মনটা তাই খুব খুসীও হইল না ; যেন কিছুই লক্ষ্য করি নাই, এম্‌নি ভাবে ঘর্ ঘর্ করিয়া কল চালাইয়া দিলাম।

"জয় হোক মহারাণী !"—

বাধ্য হইয়াই আমাকে মুখ তুলিতে হইল,—জোড়-কর, নত-মস্তক, একটা বিনম্র ভাবের ব্যঙ্গ অভিনয় !—আমি হাসিয়া বলিলাম "মাগোঃ, এ কি ঢং !—"

"আমি তব মালঞ্চের হ'ব মালাকর।—"

"ভাগ্যিস্ তবু চয়নিকাটা মুখস্থ করা ছিল,—নইলে কোথেকে এ কথাগুলো যোগাত কে জানে !—"

"বল কি ! আমি কি কেবল তোমায় মুখস্থকরা বুলিই বলি ? তুমি ত আমার সব কথা শুন্‌তে চাও না, খালি ঠাট্টা কর, হাস !—"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"কি করবেন বলুন, নিতান্তই অরসিক যে আমি ! তা সংসারে ত কত লোকই আছে, যারা আপনার এমন সব মূল্যবান কথাগুলো শুন্‌বে, বুঝ্‌বে,—কিন্তু কেন বলুন ত আমায় শুনিয়ে মিথ্যে আপনার এ বাজে খরচ করা ?"

মা সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিলেন—"কে, প্রমোদ না কি ? বোস, বোস, উঠ্‌তে হবে না ; যূঁই, আমি ছানা আন্‌তে দিয়েচি, এলে পর ডেকে পাঠাব, নীচে যাস্। প্রমোদকে আজ কিছু পিঠে করে খাইয়ে দেত—দু'বছর, বিদেশে থেকে ও সব খাওয়া কি আর ওর মনে আছে ?"

মা নীচে নামিয়া গেলেন।

"যূঁথিকা !"

"কেন ?"

"কেন ? কি বল্‌বো ! কত কথাই বল্‌তে চাই, কিন্তু তোমার ঐ হাসি ঠাট্টার চোটে সব কথা আমার কোথায় তলিয়ে যায় ! তুমি কি সত্যি যূঁথিকা, এত ছেলেমানুষ ?"

আমি হাসিলাম।

* * * * *

বারান্দায় ষ্টোভ জ্বালিয়া আমি ও মা পিঠে তৈয়ার করিতে বসিলাম, রাশিকৃত ছানা ক্ষীর থালায় স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়াছিল, কাজের আনন্দে মনটা খুসী হইয়া উঠিল। ওপর হইতে দাদা ও নরেনবাবু নীচে নামিয়া আসিলেন, দাদা সিঁড়ি হইতেই উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"বাঃ যূঁই, এ বেশ আয়োজন, দে দে—দুটো ভেজে দে, খাই,—"

মা হাসিয়া বলিলেন—"আরে আগে হোতেই দে,—খাবিই ত, তোদের জন্যেই ত হচ্চে।"

"না, না, কর্ত্তে কর্ত্তে খেতেই ত আরাম, করা হোয়ে গেলে যে থালা সাজানর বাহার দেখেই খাওয়ার সুখ উবে যায়,—এখন যা হয় তাই ত খাওয়া। দে না যূঁই, গোটাকতক ভেজে দে না ? ওহে নরেন, আমাদের যুঁই কেমন পিঠে কর্ত্তে শিখেচে, খেয়ে ছ্যাখ ত !" মা বলিলেন "যা, নরেনকে নিয়ে ও ঘরে বসাগে যা ;—হাঁরে যুঁই, প্রমোদ কি একলাটি ওপরে না কি রে ? যা না মা, একটু নীচে তাকে ডেকে আনগে।" আমি আপত্তির সুরে বলিলাম "আমি এখন কেমন করে যাই মা, ঠাকুরকে পাঠাও না ?—" কিন্তু প্রমোদবাবু ডাকের অপেক্ষা রাখিলেন না, আপনিই নামিয়া আসিলেন।

মার ইচ্ছায় সেদিনকার পরিবেশনটা আমাকেই করিতে হইল।

তাঁহার প্রধান অতিথি এবং নিমন্ত্রিত প্রমোদবাবুর হাসিতে খুসিতে আহারের স্থানটী খুব জমিয়া উঠিল।—কিন্তু নরেনবাবুকে আজ কেমন যেন নিতান্তই একটি 'চেবারা'র মত বোধ হইতেছিল! প্রমোদবাবুর অত গল্পের চাপে তাঁহার বাক্যের এবং প্রাণের উৎস যেন আজ চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

সেদিন সন্ধ্যার পর শুনিলাম, মা দাদাকে মৃদু ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছেন—"ছি যতীন, ওকে অত ঘন ঘন ওপরে আনবার দরকার কি?—ওসব আমার পছন্দ হয় না।"

দাদা হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, তোমার যত খালি মিথ্যে ভয়! আর নরেন, তোমার ওই প্রমোদ বোসের চেয়ে অনেক ভাল।—"

"তা হোক গে, নরেনের বাপের ওসব কীর্ত্তির কথা কে না জানে বল? ও রকম বাপের ছেলেকে একেবারে বাড়ীর অত ভেতরে এনে অত মেলামেশা করাটা ভাল নয়, লোকে নিন্দে কর্ত্তেও পারে; আর তা নাই হোল,—ও ত আমাদের এমন একটা খুব কিছুও নয়; সমাজের ছেলেও নয়; কি কাজ বাপু ওর সঙ্গে অত মেশামেশি করায়!"

দাদা বলিল "ওঃ, সমাজের ছেলে নয় বলেই বুঝি তোমার এত আপত্তি ওকে বাড়ীতে আনতে? তা মা, তোমাদের এই সমাজের ছেলেরাই—যাঁ'রা বাড়ীতে দিবারাত্রি আস্‌ছেন, আমি ত তাঁদের কারুকেই এই নরেন মিত্তিরের মত দেখতে পাইনে!—ব্রাহ্ম সমাজের ছেলে হ'লেই যে সে ভাল হবে, এমন একটা প্রকাণ্ড ভুলকে মনের মধ্যে জাগিয়ে রেখো না মা; ভাল মন্দ দু সমাজেই আছে।—আর ওর বাপের কথা বল্‌চ? বেশ ত, তোমাদের এই সমাজেরই সুরেন ঘোষের কথা মা, তুমি অত শীগ্‌গীর ভুলে যাচ্ছ কেন, যার বাড়ীতে তোমরা মাসখানেক আগেও নেমন্তণ্ণ খেয়ে এসেচো?—"

মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য, তোকে কথা কাটাকাটি কর্ত্তে কে বল্লে?—ও সব কথা শোনবার আমার কিছু দরকার নেই,—আমার মত নেই ওকে বাড়ীতে আনা, ব্যস্, আর কোন কথা আমি শুনতে চাইনে।"—দাদা রাগ করিয়া বলিল, "তোমার মত নেই—সে হচ্চে অন্য কথা। তাই বলে তুমি একজনের চরিত্রের ওপর দোষ দিতে পার না। আমি যখন প্রথম ওকে এ বাড়ীতে নিয়ে আসি, তখন আমিই একেবারে ওকে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাই নি মা, সে নিয়েছিলে তুমিই, এখন তোমার ভাল না লাগে মুখ ফুটে তুমিই সে কথা তাকে বলো, ও সবের মধ্যে আমি নেই।"

দাদা রাগ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল, আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। কথাটা খুব ভাল বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু অনুমান যাহা করিলাম, তাহাতে মনটা খুব সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল না।

সন্ধ্যার পর দক্ষিণের জানালাটার পাশে একলাটি বসিয়া ছিলাম, নীচের বাগান হইতে ভিজা-ফুল-পাতার-গন্ধে-ভারী বাতাস ভাসিয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যার আগে এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃতির মুখ কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই, বরং সিক্ত-দেহ ধরণীর স্নানচিক্কণ পত্রবল্লরীতে ভিজা-জ্যোৎস্না পড়িয়া সৌন্দর্য্য যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল; ছোট ছোট লালফুলে-ঘেরা আমাদের সবুজ মাঠখানি একটি ফ্রেমে-আঁটা ছবির মত পড়িয়া ছিল। আর মাথার উপরে মেঘের সঙ্গে চাঁদের দিব্যি লুকোচুরি খেলা চলিতেছিল। ইচ্ছা করিতেছিল, এম্‌নি আনমনা বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকি; কিন্তু স্কুলের ভাবনা মনটাকে এক একবার চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল।—আঁক কষা হয় নাই বলিয়া আজ ক্লাসে মিস্ সেনের কাছে বকুনি খাইয়াছি।

সোমবার আবার জিওমেট্রির সেই শক্ত থিওরেম্‌টা শিখিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং আর অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

উঠিয়া সুইচ্‌টা টিপিলাম এবং তাক হইতে বই বাছিয়া টেবিলে আসিয়া বসিলাম। সমুখের পর্দ্দাটি তুলিয়া মাও আসিয়া তখনই ঘরে প্রবেশ করিলেন, ও সামনের একটা চেয়ার টানিয়া আমার কাছে আসিয়া বসিলেন। তার পর আমারই পড়া সম্বন্ধে একথা ওকথার পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "যূঁই, আমার বোধ হচ্ছে, এবারে আর তুই প্রোমোশন পাবি নে—তোকে ত পড়তে আমি দেখিই না! স্কুলের সময় ছাড়া বাকি সময়টা তোর গল্পে গল্পেই ত কাটে। পরীক্ষা আসছে, সেদিকে ত একটু খেয়ালও নেই; যখন যে আস্‌ছে তারই সঙ্গে কেবল গল্প করা! উনি ত এসব কিছু খোঁজ রাখেন না, কিন্তু শুন্‌লে পরে ভারী রাগ করবেন।" আমি অবাক্ হইয়া গেলাম, বলিলাম, "গল্প!—কা'র সঙ্গে আমি গল্প করি মা?"

"কেন, সারাক্ষণই করিস্, আর নিজেদের আত্মীয় স্বজন, কি সমাজের লোক হ'লেও বা এক কথা; তা'ত নয়, কে-না-কে সব সহরশুদ্ধু হিন্দু মোচলমান এসে জুটবে, তাদের সঙ্গে অত মেলা-মেশা, গল্প গুজব না করলেই নয়? অতবড় মেয়ে, একটু ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয় ত! আর স্কুলের মেয়েরা ইস্কুলের কথা ছাড়া, পড়ার বিষয় ছাড়া, অন্য কিছু নিয়ে আলাপ করবেই বা কেন?"

আমার কেমন অসহ্য বোধ হইল। আশ্চর্য্য! আমাকে এমনি করিয়া বলা! এত অবিশ্বাস! এমন সন্দেহ! মা এ কি বলিলেন। আমাকে তিনি কী ভাবেন?

টেবিলের উপরে জিওমেট্রি, খাতা, পেন্‌সিল চোখের সম্মুখে সব যেন ঘুরিতে লাগিল। আমি আলো নিবাইয়া আমার ছোট্ট ঘর-খানির

ছোট্ট বারান্দায় আসিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। রাস্তায় তখন ভারী ভিড়, আমি অন্যমনে একদিকে চাহিয়া রহিলাম, দুঃখে অভিমানে বুক ফাটিয়া, দু'চোখ ছাপাইয়া জল উঠিতে লাগিল। প্রতিবছর প্রথম হইয়া এই এত বছর পর্য্যন্ত ক্লাসে ক্লাসে উঠিয়াছি, আমার পড়ায় মন নাই এ কথা ত কেহ কোন দিন বলে নাই! আজ মা মিছিমিছি কেন খোঁচা দিয়া এমন কথা আমাকে বলিয়া গেলেন?

মৃদু কথোপকথনের শব্দ শুনিয়া নীচে রাস্তায় আমার চোখ পড়িল। দেখিলাম, দাদা কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া, আবার বাড়ীর সামনে রাস্তায় দাঁড়াইয়া কাহার সঙ্গে গল্প করিতেছে। দাদার সব চেয়ে বড় বন্ধু যে কে, তাহা আমি জানিতাম; সুতরাং অস্পষ্ট আলোতে খুব ভাল দেখিতে না পাইলেও লোকটিকে চিনিতে আমার বিলম্ব হইল না। সহসা বুকটা আমার ধ্বক্ করিয়া উঠিল, মা কি ইঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিয়াছেন? তাই হবে, নরেন বাবু ত হিন্দুই।—কিন্তু, না, না, অসম্ভব, আর কাহারও সঙ্গে কি ইঁহার তুলনা হয়? নরেনবাবু হিন্দু, কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মসমাজে ইঁহার মত ছেলে ক'টি আছে? আর তা না-ই-বা হইল, তিনি হিন্দু হোন, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান বা খুসি হোন—আমার তাতে কি? তাঁহার সঙ্গে কথা বলি, আলাপ করি, এই কি আমার দোষ? তাই যদি হয়, তবে মা ইচ্ছা করিয়াই কেন ইঁহাকে বাড়ীর ভিতর আমাদের চা এর টেবিলে আনিয়া বসাইলেন? কে তাঁকে সাধিয়াছিল? চা তৈয়ার করিয়া, সম্মুখে গিয়া পরিবেশন করিব, অথচ মুখ বুজিয়া বোবার মত চুপ করিয়া থাকিব!—আচ্ছা, মা ত অন্য কিছু ভাবেন নাই? অন্য কোন রকম অর্থ করেন নাই ত? যদি তাই হয়! বিস্ময়ে আতঙ্কে আমার হৃদ্‌পিণ্ডের দ্রুত ক্রিয়া এক নিমেষে স্থির হইয়া গেল,—আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যাহা কখনও ভাবি নাই,

মনেও করি নাই, মা নিজের মনে তাই ভাবিয়া, অন্যায় সন্দেহ করিয়া আজ আমাকে বকিয়া গেলেন! ছিঃ ছিঃ, বাবা শুনিলে কি বলিবেন!

বিশেষ কিছুই নয়, তবু কিন্তু আমাদের ছোট্ট সংসারখানিতে এই যে সামান্য একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়া পড়িল, ক'দিন ধরিয়াই ইহার আর নিবৃত্তি হইল না—মা যখনই সুস্পষ্টরূপে দাদাকে যেভাবে সতর্ক করিতে যাইতেন, তাহাতে প্রায় প্রতিদিনই দাদার সঙ্গে মার একটুখানি সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকিত; আমাকেও মা প্রায়ই অস্পষ্টভাবে যেরূপ সতর্ক করিতে চাহিতেন, আমারও মনে তাহাতে বিরোধের সৃষ্টি কিছু কম হইত না।

যেদিন শুনিলাম দাদা বলিতেছে—"মা, তোমার কেন এত ভয়? তার চেয়ে বাড়ীর ভিতরটা হিন্দুদের অন্তঃপুরের মতই করে রেখে দাও না কেন? আর সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও তেমনই পর্দ্দানশীন হ'য়ে পড়, ব্যস্, কেউ আর তোমাদের এ ধারটাতে আস্‌বেও না! তোমরা নিজেরাই লোকদের ডেকে ঘরে এনে আদর করে বসাবে, তারপর আবার তাকে নিয়েই অত খুঁৎ খুঁৎ করা কেন বাপু? ও সব আমার ভাল লাগে না।"

মা রাগ করিয়া বলিলেন, "তুই যেন বুঝেও কিছু বুঝিস না যতীন, এ কিছু পর্দ্দানশীন হয়ে পড়বার মত কথাও নয়, ঘরকে হিন্দুর অন্তঃপুর করে তোলার কথাও হচ্চে না, একটা কথা বল্‌তে গেলে, অনেকখানি ভেবেই তা বল্‌তে হয়। তা, স্পষ্ট করে বলতেই বা কি,—তোদের এই নরেনকে প্রমোদ পছন্দ করে না, আমিও করি না; যার বাপ এত বড় একটা মাতাল, তা ছাড়া আরো কত—"

"আঃ—রেখে দাও মা তোমার ও সব পুরনো কথা; কিন্তু তুমি পছন্দ কর না সেটা সয়ে নিতে পারি। তাই বলে তোমার ঐ প্রমোদ

বোস্—আজকাল কি তার পছন্দ বা অপছন্দকেও আমাদের ভয় করে চল্‌তে হবে না কি?" মা বেশ শান্তভাবেই উত্তর দিলেন, "কতকটা তার পছন্দও দেখতে হবে বই কি, প্রমোদের সঙ্গে আমি যূঁইর বিয়ে দেবো।"

"যূঁইর বিয়ে! প্রমোদের সঙ্গে! মা"—কথাটা শেষ হইল না, দাদার সে উচ্চ হাসিতে মা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন; আমিও আর সেখানে দাঁড়াইলাম না, যেমন আড়ালে ছিলাম, তেমনি আড়াল হইতেই চুপি চুপি তেতলায় আমার পড়িবার ঘরটিতে উঠিয়া আসিলাম। আমার গা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, আমার পা কাঁপিতে লাগিল, আমি চোখে হাত চাপিয়া ধরিয়া ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম।

মাগো মা,—এরা কি আমায় পাগল করিয়া দিবে? নরেনবাবুর সঙ্গে আমার ব্যবহার, আমার কথাবার্ত্তা কি এমন সন্দেহজনক হইয়াছে, যাহার জন্য আজ আমায় এতখানি সাবধান করাও দরকার! ছিঃ ছিঃ, এ কি লজ্জা! তাঁহার নামের সঙ্গে আমার নামই বা এক সঙ্গে উঠে কেন? দাদারই বা তাঁর হইয়া এত ওকালতী করার কি দরকার? কিন্তু—প্রমোদবাবুর কথা মা ও কি বল্লেন!—তাঁর ও রাগকে আমি মোটে কেয়ারও করি নে! ও ত ভাব্‌তেই আমার হাসি পায়। আমায় যদি সতর্ক হ'তে হয়, সে আমি নিজের জন্যই হব, প্রমোদবাবু রাগ করবেন, কি তাঁর মনে ব্যথা লাগবে, সে কথা ভাববার আমার কিছুমাত্র দরকার নাই।

কিন্তু, ক'দিন ধরিয়া বাড়ীতে এ যে কি কাণ্ড চলিয়াছে, এর মধ্যে নিজেকে আমি লুকাই কোথায়! বাড়ীতে তেমন ত গুপ্তগৃহ কোথাও একটা নাই, যেখানে সকলের দৃষ্টির অগোচরে আপনাকে আমি সম্পূর্ণরূপে আবরিত করিয়া রাখিতে পারিব! মনে একবার যখন এ ভাবনা

আসিয়া ঢুকিয়াছে, তখন সঙ্কোচের হাত হইতে আপনাকে আমি বাঁচাইব কি করিয়া? তার চেয়ে এ বাড়ী ছাড়িয়া, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও অন্য কোথাও গেলে কি চলে না? মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল, আমি ছুটিয়া গিয়া বাবাকে বলিলাম, "বাবা, আমায় বোর্ডিংয়ে পাঠিয়ে দাও।"

বাবা আমার অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং হাতের সংবাদপত্রখানি টেবিলে রাখিয়া বলিলেন, "সে কি রে!"

"হ্যাঁ বাবা, বাড়ীতে আমার পড়া হচ্ছে না।"

"কেন?"

"জানিনে, কিন্তু বোর্ডিংয়ে না গেলে এবার আর আমার পাশ করা হবে না।"

বাবা আমার গায়ে হাত বুলাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "কই, আমার বুঁই মায়ের পড়া নিয়ে কেউ ত কোন দিন আমায় কোন অভিযোগ করেনি, চিরকালই ত সে প্রথম হয়ে, মেডেল পেয়েই আস্‌ছে,—আজ আবার তার কি হোল?"

"না বাবা, এবারে বোর্ডিংয়ে না গেলে আমার আর পড়া হবে না।"

* * * * * * * *

প্রাণে একটা তুমুল ঝড় বহিতেছে, কি তার শক্তি, আশ্চর্য্য! আমি যে একেবারে নিষ্পেষিত হইয়া গেলাম! মনের ভিতর এ কি একটা বিরোধের ভাব আমায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে! কিন্তু তবু যেন মনটা এক একবার কেমন হইয়া যায়,—ঝড়ের এ উন্মত্ততার মাঝে যেন বিদ্যুতের একটা চমক আমার মনটাকে এক একবার ঝল্‌সিয়া দিয়া যায়!—এ যে এক নূতন বেদনা, এ যে এক নূতন ভাবনা গো!—অসহ্য

বেদনার আঁধারে, এ কি একটা হাস্যোদ্দীপ্ত শান্ত দৃষ্টি ধ্রুবতারার মত মনের কোণে জ্বলিয়া উঠে! আমি সে কথা ভাবিতে চাই না, সে কথা ভাবিতে আতঙ্কে আমার বুক শিহরিয়া উঠে, কিন্তু তথাপি, এ ভয়ের মাঝেও এ যেন কেমনতর একটা মাধুরী আমার মনটাকে কেবলই আকর্ষণ করিয়া তোলে! ওগো, এ কি অধঃপতনের পথ?...মরণের পথ?...

সংসারের সবাই যেন আমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে! অমন করিয়া সবাই আমার পানে এত তাকায় কেন! না, কি, এ আমারি মনের ভ্রম? মনটা এমন ভীরু হইয়া উঠিল কেন?

আজ সকালে নরেনবাবু আসিয়াছিলেন। খাবার ঘরে টেবিলে আমরা চা খাইতে বসিয়াছিলাম, তিনি আসিয়া নিঃসঙ্কোচে একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমি সাবধানে চাহিয়া দেখিলাম। মা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করিতেছেন। প্রথমে কিন্তু আমি বেশ ছিলাম, তার পর মার ঐ অগ্নি-দৃষ্টিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন পুড়িতে লাগিল। আমি স্পষ্ট অনুভব করিলাম, আমার মুখ ও কাণ অস্বাভাবিকরূপে গরম ও লাল হইয়া উঠিয়াছে, এবং আমার হাত কাঁপিতেছে। এমন অবস্থায় আর অধিকক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব বোধ হইল, চাএর পেয়ালা হাতে করিয়া সেখান হইতে আমি উঠিয়া আসিলাম, এবং পড়িবার ঘরে আসিয়া কতকগুলি বই লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিলাম। মা আসিয়া বলিলেন, "ও সমস্ত ন্যাকামো আমি ভালবাসি না। সবাই আমরা সেখানে ছিলাম, হঠাৎ তুই উঠে বেরিয়ে এলি কেন? ও সব ব্যবহারে লোকে বলে কি?"

আমার কান্না আসিতেছিল, মাকে একটা শক্ত কথা বলিতে গিয়াও সামলাইয়া লইলাম। আজ সকালে আর পড়া হইল না, ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া কি জানি কেন, অকারণেই খালি কাঁদিতে লাগিলাম।

মা আমার ভাল করিতে গিয়া অজ্ঞাতে যে কেবল শত্রুতাই করিতেছেন, সে কথা আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে বুঝাইব ?

সাড়ে ন'টায় স্কুলের "বাস" আসিয়া ফিরিয়া গেল, মা নীচে আমাকে বকিতে লাগিলেন ; শুনিতে পাইলাম, বলিতেছেন—এবার স্কুল হইতে আমার নাম কাটাইয়া দিবেন। বাবা কিছু না বলিয়াই কাজে চলিয়া গেলেন, আমার অস্বাভাবিক ব্যবহারে আজ তিনি দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু কি করিব, আমি ত এমন ছিলাম না, এমন পরিবর্ত্তন আমার কেন হইল !

দুপুর বেলা দরজা খুলিয়া বাহির হইলাম, মা রাগ করিয়া আমার সঙ্গে কথাটীও বলিলেন না। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া মন আমার তখন শান্ত হইয়াছিল, অনুতপ্ত মনটা বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাই মার ঘরের আশে পাশে কেবলই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আশা হইয়াছিল, মা হয় ত ডাকিবেন ; যদি ডাকেন, তাহা হইলে সকল কথা পরিষ্কার করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিব। মা গম্ভীর হইয়া থাকিলে বাড়ীর সবটুকু সৌন্দর্য্যই যে চলিয়া যায়। মার সঙ্গে বিদ্রোহ কি ভাল লাগে ?

কিন্তু মা ডাকিলেন না। মার ভয় হইয়াছে, পাছে আমি এই হিন্দু যুবককে ভালবাসিয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিয়া ফেলি ! হায়রে মাতৃহৃদয় ! তোমার স্নেহ যে এক একবার আগুন হইয়া সন্তানকে পুড়াইয়া, ভস্ম করিয়া ফেলে, তাহা ত তুমি বুঝিবে না ! কিন্তু ভগবানের এ কি বিচিত্র লীলা ! বাস্তবিক আমার তখন হাসি পাইতেছিল।

বাবা রাত্রে বাড়ী আসিলে তাঁহাকে গিয়া বলিলাম, "বাবা, পরীক্ষা আস্‌ছে, আমায় বোর্ডিংয়ে পাঠিয়ে দাও।" বাবা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, "আমার যুঁই-মা চলে গেলে, আমার কাপড় জামা, আমার খাবার কে গুছিয়ে দেবে রে ?"

আমার বুকের ভিতরে একটা প্রবল ঝড় বহিয়া গেল,—ঈস্, কি স্বার্থপর আমি! বাবা উঠিয়া খানিক এদিক ওদিক পায়চারি করিয়া, আমার পাশে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "তাই দেবো, মা, তা কবে যেতে চাস্? কাল ত পয়লা, কাল থেকেই যাবি কি?"—"না বাবা থাক, এখন আর যাব না।"—"সে কিরে! এক মুহূর্ত্তে তোর মত বদ্‌লে গেল?"

বাবাকে ছাড়িয়া যাইতে কিছুতেই আমার মন সরিতেছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া বুঝিলাম, বাবারও ইচ্ছা যে, আমি বোর্ডিংয়ে যাই।

আমি ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। মা যে তাঁহার সকল সন্দেহের কথাই বাবাকে খুলিয়া বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে আমার আর বিলম্ব হইল না।

বোর্ডিংয়ে যাওয়া ঠিক হইয়া গেল। আশা হইল, এত দিন যাহা কিছু ঘটিয়াছে, যত কিছু মিথ্যা ক্রমে ক্রমে সারা সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, সকলই এবারে যেমন হাওয়ায় আসিয়াছিল, তেমনি আবার হাওয়ার সঙ্গেই উড়িয়া যাইবে। যা কিছু দুঃখ এবং ভাবনা—সে বাবার জন্য। বাবার কাজগুলি আমি না থাকিলে ত ঠিক হইবে না। কিন্তু কি করিব—আমি যে আজ নিতান্তই—নিতান্তই নিরুপায়।

২

এ এক নতুন জীবন! সন্দেহাকুল, ভয়সঙ্কুল,—আপনাদেরই সেই চিরনির্ভর গৃহকোণটী হইতে পলায়ন করিয়া, এই যে হাসি-গীতি-মুখরিত পবিত্র সুন্দর আশ্রম-ভবনটীতে আসিয়া প্রাণ বাঁচাইলাম, এ যেন আমার নতুন জীবনলাভ! এতগুলি সরল প্রাণের সংস্পর্শে প্রাণটা আমার তাজা হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু তবু,—মনে যে কি একটা ভাব হঠাৎ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সহজে ত সেটাকে দূর করিতে পারি নাই। মনটার সে কি এক আশ্রয়হারা, দিশাহারা ভাব,—ভয় হইত, মনে হইত, এত বড় এ পৃথিবীতে আমি যেন বড় একা গো, বড় একলা! প্রাণটা যেন শূন্যে শূন্যে হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইত, মনে হইত কোথা ঠাঁই, কোথা সে শক্ত আশ্রয়, যেখানে এ প্রাণটা আপনাকে আপনি সমর্পণ করিয়া দিতে পারে!—

সে ভাব আমার গেছে—মিলি-দি'র স্নেহভরা প্রাণটীর তলায় ডুবিয়া গিয়া আমি আজ আশ্রয় পাইয়াছি। আজ মনে হইতেছে, ভগবান ঠিক সময়েই মিলি-দি'কে আমার জুটাইয়া দিয়াছেন। জন্ম জন্ম যদি এই বুকটীরই তলায় চোখ মুদিয়া পড়িয়া থাকিতে পারি, তবে বুঝি সংসারে আমার আর কিছুই চাই না!—

যেদিন প্রথম বাড়ী ছাড়িয়া বোর্ডিংএ আসিলাম, সেদিন মনটা ভারী খারাপ ছিল। সন্ধ্যার পর বোর্ডিংএর নিত্যকার উপাসনার ঘণ্টা পড়িতে তখনও প্রায় পনর মিনিট বাকী। মেয়েরা তাই গান গাহিয়া, গল্প করিয়া, ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এত স্ফূর্ত্তি করিবার মত

আমার মনের অবস্থা তখন ছিল না, আমি তাই একলাটি চুপ করিয়া এক কোণে বসিয়াছিলাম। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মনে হইতেছিল, ঝোঁকের মাথায় এ কি কাজ করিয়া ফেলিলাম!—আর একটু সতর্ক ভাবে চলিলেই ত সব গোল মিটিয়া যাইত,—একেবারে বাড়ী ছাড়িবার কি প্রয়োজন ছিল! বাবা আমার, এতক্ষণে কোর্ট হইতে ফিরিয়াছেন, আজ কেবা একটু তাঁর কাছে বসিবে, তাঁর পোষাক ছাড়িতে কেবা একটু সাহায্য করিবে? একলাটি ঘরে বসিয়া বাবা আজ কত অভাবই বোধ করিতেছেন!—আর মা,—ভাবিতে কষ্ট হয়,—কত-কালের অনভ্যাসের পর মা আমার আজ বাবার চা করিতে গিয়াছেন! হায়! আমার ভাগ্য!—

খানিকটা দূরে কয়েকটি ছোট মেয়ে গান করিতেছিল—

'তোমারে বাসিতে ভাল, তুমি দাও শিখাইয়ে,
হাতে ধরে পিতা মোরে শুভপথে যাও নিয়ে,—

চলিতে সত্যের পথে, দুঃখ যদি হয় পেতে
দাও মোরে হেন বল, তাও যেন থাকি সয়ে।'

—এ যেন আমাকেই উপদেশ দেওয়া! সত্যের পথ কোন্ দিকে কে জানে! জীবনের কতটুকু বা কাটিয়াছে, সত্য মিথ্যার কিই বা জানি!—তবু নিজের মতের সঙ্গে অন্যের মতের একটু এদিক ওদিক হইলেই মনে এত বিরোধের সৃষ্টি হয় কেন!—কিন্তু এ কি এক নতুন ভাবনার ধারা আসিয়া মনে আমার ঢুকিল! ওগো, এ যে কিছুতে ভুলিতে পারি না। এর ভিতর হইতে কে আমায় পথ দেখাইয়া দিবে?

উঃ—বুকের ভিতরটা ভয়ানক কাঁপিতেছে! কি করি আমি,—কোথা গেলে এর বিস্মৃতি আসিবে?

সহসা চমকিয়া উঠিলাম,—এ কেগো, কে! কার এমন মিষ্টি কোমল স্পর্শটুকু!—এ কি মিলি-দি? মুহূর্ত্তে আমার কি যে হইয়া গেল, বলিতে পারি না—কিন্তু বিশ্বাস যে হয় না, সত্যি কি এ মিলি-দি? আমার গোপন প্রাণের কামনার ধন, আমার প্রথম প্রেমের—কি বলিব জানি না, কিন্তু কেন তাকে এমনি আত্মহারা হইয়া ভালবাসিয়াছি—কে জানে! আমি চক্ষু মুদিয়া আমার পিপাসিত বুকের ভিতরে তাহার গরম নিঃশ্বাস এবং হাতের স্পর্শটুকু অনুভব করিতে লাগিলাম। বোর্ডিংএ আসিবার আগে প্রতি দিন স্কুলে আসিয়া মিলি-দিকে কি ব্যাকুল চিত্তেই না দেখিয়াছি! তাহার সঙ্গে মিশিবার জন্য একটা উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা প্রতি দিন আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিত; কিন্তু উপরের ক্লাসে পড়ে বলিয়া কোন দিন যাচিয়া তাহার কাছে যাইতে পারি নাই, কেমন একটা সঙ্কোচ আসিয়া সারাটি মনে আমার জড়াইয়া থাকিত। আজ সে আমার এত কাছে! এই আমার সেই মিলি-দি—যার একটু হাসি দেখিবার জন্য আমার গোপন অন্তর হাহাকার করিয়া মরিত। এই আমার সেই-গো সেই! তাহার উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে আজ আমার সমস্ত দেহ মন যেন ঝিম ঝিম করিয়া অবশ হইয়া আসিতে লাগিল।

মিলি-দি আমার পিঠে হাত রাখিয়া, একটুখানি সামনে ঝুঁকিয়া, হাসিয়া বলিল, "বড্ড বুঝি মন কেমন করচে? ও রকম সবারই করে প্রথম প্রথম বাড়ী থেকে এলে,—তাই বলে বুঝি একলাটি বসে বসে কাঁদতে হয়, ছিঃ—এসো আমরা একটু ওধারে বেড়াই।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম।

*   *   *   *

মানুষ এমন বদও হয়, ছিঃ! মিলি-দি আমাকে একটু ভালবাসে, আমার খোঁজ খবর একটু বেশি করিয়াই নেয়,—বেশ ত, তাহাতে হইয়াছে কি? এত হাসি, এত ঠাট্টা কেন যে তাতে উঠিতে পারে, বুঝি না।

ইহাদের ব্যবহারে আমার মনও যেন বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। কেহ সাম্‌নে থাকিলে আমি অসঙ্কোচে মিলি-দির কাছে যাইতে পারি না। কথা বলিবার সময়ও প্রতিক্ষণই মনে কেবলই একটা কেমনতর ত্রাসের সঞ্চার হয়! কে যেন কোথা হইতে দেখিয়া ফেলিল! ছিঃ ছিঃ, এমন অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হইল কেমন করিয়া?

তার কাচা কাপড়খানি ছাদ হইতে আনিয়া পাট করিয়া রাখি, তার ছোট্ট বিছানাখানি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া দিই, মেয়েরা তাই দেখিয়া হাসে, ঠাট্টা করে।

কিন্তু আশ্চর্য্য! এ আমার হইল কি? মিলি-দির সঙ্গ ছাড়া এখন আর অন্য কিছুই ভাল লাগে না! এত শীগগীর কি করিয়া আর সব ভুলিয়া ফেলিলাম!

কাল বেড্‌রুমে সবাই তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, রাত্রি প্রায় ১টা।— আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম্ আসিতেছিল না, উঠিয়া বসিয়া দেখিলাম। মিলি-দিও জানালায় মুখ রাখিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে। 'বেড্‌রুমে' ঘুরিয়া বেড়ান, কিংবা কাহারো সহিত কথা বলা আমাদের নিষেধ। তবুও আমি অনেকক্ষণ ভাবিয়া, অন্যায় জানিয়াও আস্তে আস্তে, অতি সাবধানে গিয়া, তাহার চোখ টিপিয়া ধরিলাম। মিলি-দি হাত

ছাড়াইতে চেষ্টা না করিয়াই বলিল, "চিনি গো চিনি, ও হাত কি ভুল হবার ?" "ঈস্—তা বই কি !" বলিয়া আমি হাসিয়া হাত তুলিয়া দাঁড়াইতেই, মিলিদি দুহাত দিয়া টানিয়া আমাকে তাহার বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল। কি এক আবেশে কতক্ষণ যে আমার কাটিয়া গেল, বলিতে পারি না। কতক্ষণ পরে মিলিদি আমার কাণের কাছে তার মুখ লইয়া বলিল, "বোর্ডিংএর নিয়ম ত খুব মেনে চল্লুম ! এখন শোওগে ভাই।"

"আর একটু থাকতে দাও মিলিদি !"

"লক্ষ্মিটী আমার, শোওগে ভাই, ছিঃ, এম্‌নি করে কি নিয়ম লঙ্ঘন কর্ত্তে হয় ?"

"এতক্ষণ জেগে বসে থাকাও ত বোর্ডিংএর নিয়মে নেই,—তোমারও কি নিয়ম লঙ্ঘন হোল না ? তুমি কি বলে এতক্ষণ জেগে বসে ছিলে ?—"

"আমি ? আমার ভাই ঘুম আসছিলো না। তাই বলে আমি ত জায়গা ছেড়ে উঠে যাই নি,—আমি চুপ ক'রে বসে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনছিলুম।"

"আহা, কি কবিত্ব গ্যাখ না ! ঘোড়ার ক্ষুরের আবার শব্দ ! তাই না কি আবার মানুষে রাত জাগিয়া শোনে ! তোমার সবই অদ্ভুত মিলি-দি।"

মিলি-দি হাসিয়া বলিল, "কেউ না শোনে, আমি শুনি। এত রাত্তিরে চুপচাপ রাস্তাটীতে ছ্যাকড়া গাড়ীগুলোর বিশ্রী শব্দের আড়ালে ক্লান্ত ঘোড়ার ঐ চলনের শব্দটুকু আমার কাছে কি মিষ্টি শোনায় ভাই ! ভাই যুঁই, কি বল্‌বো, আমার মনটা তখন কেমন যে হোয়ে যায় !—কিন্তু, তুমি কেন জেগে ছিলে মণি ?"

"সত্যি বল্‌বো মিলিদি ? তোমার কাছে আস্‌বো বলে !" আমি জোর করিয়া মিলিদির বুকে মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিলাম। এখন ত আর কেউ দেখিবার নাই, এখন আর উপহাস করিবার কেউ নাই—ওগো, এখন কি তোমার সঙ্গ আমি ছাড়িতে পারি ?

* * * *

ভোরে জাগিয়া দেখি, কোণের ঐ শিউলী তলাটী ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। গাছের জটিল শাখার ভিতর দিয়া তরুণ রবির স্বর্ণ কিরণ জানালার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের বেড্‌রুমের ভিতর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আকাশ বেশ গাঢ় নীল। এক রাশ উড়ন্ত সাদা মেঘ আকাশের এপাশে ওপাশে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। বর্ষাশেষে নতুন শরতের সূচনা,—প্রকৃতিতে একটা নতুন জাগরণের সাড়া—মনটা খুসী হইয়া উঠিল।

আমরা ব্রাহ্ম, পুত্তলিকা পূজার বিরুদ্ধে আশৈশব কত কথাই শুনিয়া আসিয়াছি। তথাপি পূজা আসিতেছে ভাবিয়া বুকে একটা আনন্দের স্পন্দন জাগিয়া উঠিল।

গান শুনিয়া জানালা দিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, একদল ছেলে আগমনী গাহিতে গাহিতে বোর্ডিংএ আসিয়া প্রবেশ করিল। ইহারা না কি রামকৃষ্ণ আশ্রমের ছেলে। আশ্রমের ছেলেরা কাঙ্গালী ভোজন করাইবে, তাই বাড়ী বাড়ী চাঁদা নিতে আসিয়াছে দেখিয়া একটু অবাক্ হইলাম। এখানে এই ব্রাহ্ম বোর্ডিংএ কে এদের চাঁদা দিবে ? বেচারাদের সরল মন, অত কথা বোধ হয় ভাবে নাই !

দারোয়ান উহাদের তাড়াইয়া দিতে গেল দেখিয়া মনটা চঞ্চল হইয়া

উঠিল; কিন্তু আমি নিজে বোর্ডিংএর ছাত্রী মাত্র, দারোয়ানকে কোন কাজে বাধা দিবার কিংবা উহার সঙ্গে কথা বলিবার কোন অধিকার আমার নাই, তাই নির্ব্বাক ক্রোধে চুপ করিয়া শুধু দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু দারোয়ানের কোন নিষেধ ছেলেরা মানিল না, উহারা সারি বাঁধিয়া গেটের ভিতর ঢুকিয়া গান গাহিতে লাগিল। গোলমাল এবং গান শুনিয়া 'টীচাররা' প্রত্যেকেই তাঁহাদের নিজেদের জানালায় আসিয়া দাঁড়াইলেন; কেহ বা একটু চাহিয়াই চলিয়া গেলেন, কেহ বা দারোয়ানকে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু, উহাদের তাড়াইবার চেষ্টা করিতে দেখিয়াও কেহই কিছু বলিলেন না। ছেলেরা কিন্তু দারোয়ানের পানে ভ্রূক্ষেপমাত্রও না করিয়া চড়া গলায় গান ধরিল,—

'আমার নয়ন ভুলানো এলে !
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলী তলার পাশে পাশে,
ঝরাফুলের রাশে রাশে,
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে, অরুণ-রাঙা চরণ মেলে !

* * * *

বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি তোমার শঙ্খধ্বনি,
আকাশ বীণার তারে তারে
বাজে তোমার আগমনি

রবিবাবুর শারদোৎসবের গানটী,—এ গান ত আমরাও শিখিয়াছি;—আমরাও গাই,—কিন্তু এদের কি প্রাণঢালা আবাহন গো! এমন করিয়া ত কোনদিন আমরা গাই নাই! প্রাণে যার আবাহনের সাড়া নাই,—নিত্যকারই কাজে কর্ম্মে, নিত্যকারই ভাবে যে সব মন সদাই আপ্লুত তা'রা একথাগুলির 'নূতনত্ব কি বুঝিবে? আমার কাণে কেবলি বাজিতে লাগিল—

'বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি তোমার শঙ্খধ্বনি,
আকাশ বীণার তারে তারে
বাজে তোমার আগমনি।'

সহসা সচকিতে ফিরিয়া দেখিলাম,—রমাদি,—আমাদের লেডী স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—গানে মুগ্ধ হইয়াই বোধ হয়—একখানা পাঁচ টাকার নোট নীচে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন! মনটা একটু আশ্বস্ত হইল, একটু সাহসও হইল; তাই এবারে জন্মদিনে-পাওয়া আটগাছি চুড়ি হইতে এক গাছি খুলিয়া নীচে ফেলিয়া দিলাম। পেছন হইতে মৃণাল বলিয়া উঠিল,—"ঈশ, দাতাকর্ণ যে! যুঁইর আবার এত বড় মন হোল কবে থেকে?"

রমা বলিল, "ও সব বাজে কাজে দান, দেখ্‌লে আমার রাগ হয়।"

ইহাদের কোন কথাতেই উত্তর দিবার মত প্রবৃত্তি আমার হইল না, আমি শুধু চুপ করিয়া এই গমনোদ্যত গায়কদের পানে চাহিয়া রহিলাম। সোফিদি আসিয়া বলিল "যুঁই বুঝি ভাই, চুড়ি দিয়েছিস্? মা বক্‌বেন না ত?"

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম—"না—না।"

সোফিদি বলিল—"বেশ করেছিস্ ভাই।"

মৃণাল বলিল "কিন্তু সোফিদি, এ সব কুসংস্কারে প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত ভাই? তুমি এ কাজের প্রশংসা কর?"

সোফিদি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আহা, কুসংস্কার কি রকম? কাঙ্গালী ভোজন কুসংস্কার হোল?"

"শুধু কি কাঙ্গালী ভোজন? এ পুত্তলিকা পূজা না?"

"পুত্তলিকা পূজার মানে কিছু বুঝিস্ মৃণাল? নিজে যা বোঝ না, তাই নিয়ে কথা বোল না। তুমি নিজে এ মানতে না পার,—তাই বলে অন্যকে নিন্দে কোরো না। আর বিশেষ করে তুমি যার মানেও বোঝ না!"

ঘণ্টাখানেক পরে, কেউ যখন কাছে ছিল না, মিলিদি আসিয়া আদর করিয়া বলিল—"কত খুসী হয়েচি আমি যূঁই,—আমার লক্ষ্মী মণিটি!"

আমার মন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল।

৩

মৃণালের সঙ্গে এ কি বিরোধ আমার প্রতি দিন চলিতেছে !—ক্লাসে পড়ায়, বোর্ডিংএর নিয়ম পালনে—প্রতি কাজে, প্রতি কথায় কিছুতেই কেন আমরা উভয়েই পরস্পরের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিতে পারি না? ক্লাসে 'পপুলারিটির মেডেল' নিয়া যে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব প্রত্যেকের ভিতরেই চলিতেছে এবং বিশেষ করিয়া আমাদের দুজনের উপরেই সকলের যে সতীক্ষ্ণ সশঙ্ক দৃষ্টি পড়িয়া আছে, তাহাতে এক একবার আমার চেঁচাইয়া বলিতে ইচ্ছা করে, আমরা কেহই ও মেডেলের যোগ্য নই। হৃদয়ের নীচতা আমাদের এত বেশী যে, নিজের প্রতি নিজেরই ঘৃণা জন্মে,—'পপুলারিটির মেডেল' লইব আমরা কোন্ অধিকারে?—কিন্তু, এ ভোটের ব্যাপার,—কার ভাগ্যে কি আছে কে জানে? মনটা আমার অন্যায় জানিয়াও কিন্তু কেবলই বলে, 'আমি না পাই, ক্ষতি নাই, মৃণাল যেন কিছুতেই না পায়।'

তার পর, আরো যা কিছু মৃণালের সঙ্গে আমার চলিতেছে, সে কথা ভাবিতে মনের ভিতরটাও যে আমার শিহরিয়া উঠে। আজ দুদিন মৃণালের ব্যবহারে যাহা কিছু লক্ষ্য করিতেছি,—চোখে তাহা এমন বিসদৃশ ঠেকিতেছে কেন?

কিন্তু এ কি ক্ষুদ্র মন, এ হিংসার ভাব মনে আমার কেন জাগে? মিলিদি কি আমার একলার সম্পত্তি? আর কাহারো সঙ্গে—থাক্, মনের সে নীচতা, মনেই আবার লুপ্ত হইয়া যাক্, সাদা কাগজখানি আমার মনের সে কলঙ্ক-কালিমায় না-ই বা কলঙ্কিত করিলাম! কিন্তু তবু এ যে কি ব্যথা গো, কি ব্যথা! ওঃ—

*　　*　　*　　*　　*

বুকটা আমার বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে,—এ কি খবর মিলিদি আমায় হাসিতে হাসিতে দিয়া গেল! এ বোর্ডিং ছাড়িয়া সে না কি কটক বোর্ডিংএ চলিয়াছে!—তার বাবা দিন কয়েকের মধ্যেই আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবেন।—শুনিলাম, শুধু শুনিলামই—বলিবার কিছু নাই, আমার বুকের বেদনা কথায় কি বেশী ফুটিবে? মনে তবু আর একটা কথাও উঠিল,—আমি দেখিতে পাইব না, সে বেদনা আমারই থাকিবে, কিন্তু মৃণাল—মৃণালের ঐ ভয়ানক কবল হইতে ত তাহাকে দূরে রাখিতে পারিব, অত দুঃখে তা-ই আমার সান্ত্বনা। ভগবান জানেন, মৃণাল কি আমার মত মিলিদি'কে অত ভালবাসে? ওগো—অত ভাল কি আর কেউ বাস্‌তে পারে? কি ভাল আমি তোমায় বাসি, মিলিদি'—তুমিই কি ভাই সে কথা জান?—

মনে পড়িতেছে, শুধু তাহাকে একটু দেখিবার জন্য বোর্ডিংএর কত নিয়ম আমি লঙ্ঘন করিয়াছি, কাজে অকাজে, নানাছলে কতবার তাহার পাশে গিয়া একটু বসিবার জন্য কি যে করিয়াছি, আমার সে গুপ্ত কথা জানেন শুধু আমার ভগবান।

'ষ্টাডিরুমে' আজ আমি আর বসিতে পারিলাম না,—মিস্ রায়কে মাথা ব্যথার দোহাই দিয়া উপরে চলিয়া আসিলাম। বেডরুমে এখন আর কেহ ছিল না, আমি চুপি চুপি একলাটি গিয়া আমাদের ওধারের বারন্দাটায় দাঁড়াইলাম, সেখান হইতে নীচের ঘরে মেয়েদের স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, দেখিলাম, মৃণাল নিজের জায়গা ছাড়িয়া মিলিদির পাশে আসিয়া বসিয়াছে।

*   *   *   *   *

কতক্ষণ ওখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, জানি না, সাড়ে ন'টায় মেয়েদের উপরে আসিবার বেল্ পড়িলে,—সেই শব্দে চমকিয়া উঠিলাম, আর দেখিলাম, চোখের জল পড়িয়া কাঠের রেলিংটা ভিজিয়া গিয়াছে !

৪

প্রাণটা গভীর একটা শূন্যতায় ভরিয়া গিয়াছে, এমনি একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব বোর্ডিংএ আসিবার আগেও বোধ হইত! এ আমার তরুণ প্রাণটা আপনার ভারটুকু যে আপনি আর বহিতে পারে না, এ আমার দারুণ বোঝা কোথায় আজ নামাই?

চিঠি!—মেয়েদের এক তাড়া চিঠি আনিয়া দ্বারোয়ান মিস্ রায়ের টেবিলে রাখিয়া গেল। খাম খুলিয়া খুলিয়া মিস্ রায় চিঠিগুলি দেখিতে লাগিলেন। মিলিদি'র যাবার পর হইতে প্রতিদিন কি আকুল আগ্রহে তাহার চিঠির আমি প্রতীক্ষা করিতেছি,—পড়া, খেলা, গল্প, গান—সব তাতেই মনটা আমার কেন যে এমন ভারাক্রান্ত হইয়া আছে,—সে কথা আর কেউ কি জানে?

চিঠি বিলি হইয়া গেল,—মিলিদি'র চিঠিও সত্যই আসিয়াছে,—কিন্তু সে আমার নয়,—মৃণালের!

—আজ আর দুঃখে নয়, রাগে আমার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল,—মিলিদি তাহা হইলে ইচ্ছা করিয়াই আমার অপমান করিতেছে! আর কেনই বা করিবে না? যাবার আগে সে যে কয় দিন এখানে ছিল, আমি ত তাহার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি নাই! সে আমার কাছে আসিলে আমি কাজে ব্যস্ততা দেখাইয়া চলিয়া যাইতাম। সে আমার হাত ধরিলে হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া পালাইতাম। ইচ্ছা করিয়াই আমি যদি প্রতিদিন তাহাকে অপমান করিতে পারিলাম, সে কেন করিবে না? মানুষের সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে ত। কিন্তু তবু সে কি আমার মন জানিত না? সে ত জানিত আমি কেন অভিমান

করিয়াছিলাম, দূরে গিয়াও কি সে আমার অপরাধ ভুলিতে পারে নাই? আমার এত দিনের ভালবাসা কি কিছুই হইল না, আর দু'দিনের একটু অভিমান, একটু রাগই বেশী হইল? আমি তাহার জন্য কাঁদিয়া মরিতেছি, তবু আমি কিছুই হইলাম না, মৃণালই তাহার আজ সব হইল? বেশ, তাই হোক্। মিলিদি—কে মিলিদি? কাহার জন্য আমি মিছামিছি কাঁদিয়া মরি?

আমি নিজেকে বেশ শক্ত করিয়া তুলিয়াছিলাম, কিন্তু মৃণাল চিঠি হাতে নিয়া ভারী গর্ব্বভরে আমার সুমুখ দিয়া হাঁটিয়া গেল, একটু হাসিয়া বলিয়া গেল 'পড়বে ভাই, যুঁই, মিলিদির চিঠি? কত কি লিখেছেন, ত্থাখ!' আমি কণ্ঠস্বরে যথাসাধ্য স্বাভাবিকতা আনিয়া শান্তস্বরে বলিলাম, 'মাপ কর ভাই, বড্ড আজ পড়া, বাজে কাজের আজ এতটুকু সময় নেই।' মৃণাল হাসিয়া চলিয়া গেল, তাহার সেই গর্ব্বভরা দোদুল্যমান চলনভঙ্গীর পানে চাহিয়া তাহার দেহের উপর আমার হাতের বই ছুঁড়িয়া মারিতে ইচ্ছা হইল।

* * * * *

—পূজার ছুটি, দীর্ঘদিনগুলি আজকাল খানিকটা পড়াশুনায় এবং বেশীর ভাগ বেড়াইয়াই কাটিয়া যায়। পড়াশুনার ক্ষতি হইবে বলিয়া মিস্ রায় আমাকে আর বাড়ী যাইতে দিলেন না। যা হোক, তবু বেশ আছি, আমোদ আহ্লাদে দিন বেশ একরকম কাটিয়া যায়। বাড়ী যাইতে ইচ্ছা করিলেও বাড়ীর কথা ভাবিতেই ভয় হয়। বাহিরের লোকের অত্যাচারে ঘরের মানুষ আমি পর হইয়া গিয়াছি।

আজ গিয়াছিলাম বোটানিক্যাল গার্ডেনে। বোর্ডিংএর খাওয়া

দাওয়া সারিয়া চারিটা 'বাসে' আমরা প্রায় সাড়ে দশটার সময় বাহির হইয়া পড়িলাম এবং চাঁদপাল ঘাট হইতে বোটে করিয়া গঙ্গার উপরে আমোদ করিতে করিতে বাগানে আসিয়া পৌছিলাম। সেখানে খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা এবং নানারকম আমোদ করিবার সমস্ত বন্দোবস্তই ছিল। সারাটা দিন মেয়েরা দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম অবিশ্যি, কিন্তু আজ মিলিদি'র কথা খুবই আমার মনে পড়িতেছিল। আর একবার যখন এখানে আসিয়াছিলাম মিলিদিও তখন সঙ্গে ছিল, সেবার সারাটা দিন আমি আর সে অন্য কোন দলে না গিয়া, দু'জনেই কেবল এক দিকে ছিলাম। মনে পড়ে সন্ধ্যার আগে একটা গাছের নীচে দুজনে বসিয়াছিলাম, সূর্য্য তখন অস্ত যায় যায়, মেঘের উপর সূর্য্যাস্তের সেই আলো পড়িয়া সমস্ত আকাশ জুড়িয়া রং বেরঙের খেলা চলিয়াছে,—একটু একটু হাওয়া বহিতেছে, গঙ্গায় দুটো একটা 'ষ্টীমলঞ্চ' ভাসিয়া চলিয়াছে,—সে দিকে চাহিয়া, কথাটি কিছু না বলিয়া আমরা শুধু নীরবেই বসিয়াছিলাম।—অনেক সময় মুখের কথায় মনের কথা চাপা পড়িয়া যায়, মৌনতার ভিতর বুকের যত কথা ফুটে ওঠে মুখের সহস্র কথায়ও তাহা হয় কি ?—

ওধারে টীচাররা তখন বোর্ডিংএ ফিরিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন, দ্বারোয়ান চাএর পেয়ালা এবং ষ্টোভ্ ঝুড়িতে তুলিয়া ঘাটের দিকে ছুটিয়াছে, মেয়েরা তখনও সকলে আসিয়া সেখানে মিলিত হয় নাই। দেরী দেখিয়া মিস্ রায় অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। মিলিদি ও আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, মিলিদি বলিল, "এসো ভাই, গাছটায় ছুরি দিয়ে আমরা নাম লিখে যাই, এ গাছটায় আর কারো নাম খোদা নাই, আমাদের দুজনেরই শুধু থাক্‌বে।"

আজ, সেই গাছটার পাশে আসিতেই, এমনি সব হাজার রকমের

চিন্তা আমার মনের কোণে উঁকি দিয়া দিয়া উঠিতে লাগিল; দেখিলাম ছুরিতে কাটা সেই নাম দুটি আজও আছে। বুকের ভিতরটা বড় কেমন করিতে লাগিল। মিস্ সেন আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "ওর কিছুতে আনন্দ নেই, সারাটা দিনই মুখ যে কি গোম্‌ড়া ক'রে রাখে!" মিসেস্ সান্যাল বলিলেন, "ও কি যূঁই, তোমরা ছোট ছোট মেয়েরা কোথায় প্রাণ খুলে হাস্‌বে, তা নয় যেন, সব সাতকেলে বুড়ী! ছিঃ ও কি, এত গম্ভীর কেন?" মেয়েদের মধ্যে কে যেন একটু হাসিয়া চাপা গলায় বলিল, "জানেন মিসেস্ সান্যাল ওর বন্ধু কাছে নেই কিনা, তাই ও হাস্‌তে পার্‌ছে না।"

"ওমা, তাই নাকি! কে ওর বন্ধু?"

"ওমা, আপনি বুঝি জানেন না! ও যে মিলিদির এক জন মস্ত অ্যাড্‌মায়ারার্ (admirer)."

মিসেস্ সান্যাল হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ তাই বুঝি ও দিনরাত এমন গম্ভীর হ'য়ে থাকে—সত্যি নাকি যূঁই?"

মেয়েরা সবাই মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল; মাথা আমার গরম হইয়া উঠিল, আমি নতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আঁচলের সূতা ছিঁড়িতে লাগিলাম, হঠাৎ মিস্ সেনের ধমকে চমকিয়া উঠিলাম, তিনি গম্ভীর হইয়া জোরে জোরে বলিলেন, "যূঁই, মেয়েদের অত 'সেন্টি-মেণ্টাল' (ভাবপ্রবণ) হওয়া আমি পছন্দ করিনে। তোমার বাবাকে আমি এ সব লিখে দেবো। জানেন মিসেস্ সান্যাল, এ বোর্ডিংয়ের মেয়েগুলো যেন সব ই চোড়ে পেকে উঠেচে।"

মিসেস্ সান্যাল ও মিস্ সেন সেখান হইতে চলিয়া গেলে মেয়েরা পরস্পরের দিকে তাকাইতে লাগিল এবং পরমুহূর্ত্তেই যে সেখানে একটা চাপা হাসির ফোয়ারা উঠিয়া পড়িল, আমি মাথা না তুলিয়াই

তাহা বুঝিতে পারিলাম। মুখে কিছু বলিলাম না, কিন্তু মন আমার আকুল হইয়া বলিতেছিল, 'বসুন্ধরা দ্বিধা হও'।"

গঙ্গার বুকে আমাদের নৌকা আবার ভাসিয়া চলিল। মাথার উপরে শরতের সুনির্ম্মল আকাশে রূপালী থালার ন্যায় সুন্দর চাঁদখানি, আর নীচে স্নিগ্ধ শীতল জ্যোৎস্নাগলাজল। শীতল হাওয়া উষ্ণ মস্তিষ্কটাকে ক্রমেই প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিতেছিল। আজিকার মত এমন লজ্জা জীবনে আর কোনদিন পাই নাই, তবু মনে হইতেছিল আমার এ বিমর্ষভাব মৃণালকে কিছুতেই দেখানো হইবে না। সে তখন সেখানে ছিল না, যাহা কিছু বিশ্রী কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, সে তাহার কিছুই জানে না। ইহাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। মিলিদি যে আমার কেহই নয়, আমি তাকে 'কেয়ার'ও করি না, সে আমাকে অবহেলা করিলে আমার যে কিছুই যায় আসে না, মৃণালকে তাহাই দেখাইতে হইবে। অবহেলাকে অবহেলা করিতে আমিও জানি।

কিন্তু, তবু একি এ ভয়ার্ত্ত জীবন! বেশী হাসিলেও টিচাররা তাকে বলেন ভয়ঙ্কর 'লাইট্', ভয়ানক ফাজিল, আবার গম্ভীর হইলেও বলেন, 'গোমড়া মুখ', সেণ্টিমেণ্ট!

মনটা ঘৃণায় ভরিয়া উঠিতেছে,—ছিঃ! আমাকেই বা এত কথা বলিবার সুযোগ কেন আসে? আমি কি এত দুর্ব্বলচিত্ত, এমন একটা অপদার্থ? মনটায় এতটুকু কি বল নাই, যাহাতে এই 'তলিয়ে-পড়া' মনটাকে উচু করিয়া ধরিতে পারি। মনে পড়ে, দাদা একদিন উপহাস করিয়াছিল—হ্যাঁ, মেয়েরা নাকি আবার মানুষ! মেয়েরা ত একটা কাদার ডেলা! আচ্ছা, একবার পণ করিলে হয় না?

ব্যর্থ! ব্যর্থতা আবার কি? একটা জীবন কি কখনও ব্যর্থ হইতে পারে? আর, এর কিইবা কারণ?—ভাবিতে লজ্জা হয়,—হাসি পায়!

কাদার ডেলা! ছিঃ ছিঃ,—জীবনটাকে এমনিভাবে সেই চিরন্তন প্রথায় অদৃষ্টের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া কেন? কাদার ডেলাকে কি মানুষ করা যায় না?

কথাটা খুব অজানা ছিল না বটে, কিন্তু খবরটা পাইয়া প্রথমে বেশ একটু চমকিয়া উঠিলাম,—এতগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী—বিশেষতঃ যেখানে মৃণালের মত প্রতিদ্বন্দ্বী সেখানে পপুলারিটির মেডেলটা ভোটের ব্যাপারে আমারই গলায় ঝোলাটা—একটু চমক লাগিবারই কথা বটে!

সকাল বেলা মৃণাল আসিয়া বলিল, "ভাই যুথিকা,—তোমায় কংগ্র্যাচুলেট্ কচ্ছি।"

"ধন্যবাদ, কিন্তু হঠাৎ এ রকম অঘটন ঘটবার কারণটা আগে শুনি।"

"আহা, জানেন না যেন! ন্যাকা!!

আরতি বলিল, "ভাই ও রকম মেডেল পেয়ে পেয়ে ওর অভ্যেস হয়ে গেছে, তাই ওতে আর বিশেষ কিছুই ওর মনে হচ্চে না।"

মৃণাল বলিল, "কিন্তু, কি লাকী (Lucky) ভাই তুমি, আমরা যত ভাল ব্যবহারই করিনা কেন,—যত মিষ্টি কথাই সব্বার সঙ্গে বলি—মেডেলটা ঝুল্‌বে কিন্তু ঠিক তোমারই গলায়! মেয়েগুলো কি ছাই তোমায় ছাড়া চোখে আর কারুকেই ছাখে না।"

মৃণাল হাসিতে লাগিল।

মৃণালের এই প্রাণ ঢালা উচ্চহাসিতে আমি অবাক হইয়া যাই। বুকে অতখানি গরল রাখিয়া মুখে অত হাসি! এক একবার দুঃখ হয়, আমার এই ছাত্রী জীবনে, প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মৃণালকে না পাইয়া যদি বন্ধুরূপে পাইতাম!

যাহা হউক, দ্বন্দ্ববিরোধ ভুলিয়া, হাসি গল্প আমাদের বেশ অবাধে

চলিতেছিল, আরও খানিকক্ষণ চলিত, কিন্তু মিস্ সেন আসিয়া তাঁহার রুদ্ধকণ্ঠে মেয়েদের বুক কাঁপাইয়া বলিয়া গেলেন, "মেয়েদের ছুটিটা দেখছি তোমরা খালি আড্ডা দিয়েই কাটিয়ে দিলে, কিন্তু নভেম্বরের 'লাষ্ট উইক' থেকেই তোমাদের একজামিন আরম্ভ হবে, কথাটা যেন ভুলো না!—"

মিস্ সেন গম্ভীর পদক্ষেপে চলিয়া গেলেন।—ঘরটা যেন খানিক-ক্ষণের জন্য 'গুম' হইয়া রহিল,—সহসা সুরভি ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, "ভাই, একজামিনের কথাটা ভোলা যদিবা সম্ভব হয়, এই কথা-গুলো অন্ততঃ আজ সারা দিনটীতেও কিন্তু কিছুতেই ভোলা যাবে না।"

মেয়েরা হাসিয়া উঠিল। দিনটি আজ রবিবার, বোর্ডিংএর 'ভিজি-টর ডে'—বিকাল বেলা মিস্ রায় ডাকিয়া বলিলেন, "যূথিকা, নীচে নেমে এসো, তোমার 'ভিজিটর' এসেছেন।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম।

আমার ভিজিটর! এই বোর্ডিংএ! কে? দাদা নয় ত! সন্দেহাকুল চিত্তে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম।

'ভিজিটররুমে' প্রবেশ করিয়া যাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে চমকে আমার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হইয়া উঠিল, তিনি বাবাও নন, দাদাও নন,—তিনি প্রমোদবাবু।

দেখিলাম—এবং দেখিয়া অবাক হইলাম, যে আজ তাঁহার আর সেই ব্যঙ্গভরা অভিনয়ের ভাব নাই, আজিকার মূর্ত্তি তাঁহার আমার চোখে নতুন লাগিল, আমি ঘরে ঢুকিতেই স্থির শান্তস্বরে তিনি বলিলেন, "এসো যূথিকা,—বস।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—'আপনি?—'

'কেন, আস্তে নেই? অপরাধ হয়েচে?'

'না, সে কথা বল্‌চি না,—তবে কি না,—ভাবিনি,—' কথাটা বলিয়া নিজেরই কাণে ভাল লাগিল না, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিলাম।

তারপর,—সেই অতবড় নির্জ্জন হলে,একাকী তাঁহার সম্মুখে বসিয়া, ঘণ্টাখানেক ধরিয়া কত কথাই তাঁহার শুনিলাম, কত তাঁহার বুকের ব্যথা,—ক'বছরের কত তাঁর অতৃপ্ত অপূর্ণ কামনা! নীরবে, নতমুখে সমস্ত শুনিলাম, কিন্তু যখন কি একটা কথার উত্তরের জন্য, বারবারই কেবল প্রশ্নের উপর প্রশ্ন, কথার উপর কথা বলিয়া, বিব্রত করিয়া তুলি-লেন—সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া আমি তখন বাধ্য হইয়াই বলিয়া ফেলিলাম, 'ওসব কেন আমায় বল্‌চেন? ওসব কথার আমি কি জানি,—ওসব জিজ্ঞেস করবেন মাকে,—মা যা বলবেন, যা করবেন, আমি কি তাতে তাঁর অবাধ্য হব?—কিন্তু—একটা কথা,—'

'কি, বল?'

'এটা হচ্চে বোর্ডিং, বোর্ডিংএ এ সব কথা কেন? আমি কি আর বাড়ী ফিরিবো না?'

'ফিরবে, কিন্তু সেখানে তোমায় আমি পাই না, সেখানে তুমি সহস্রের, সেখানে তুমি সকলের, আমার কথা শোনবার সেখানে তোমার সময় কোথায় যুথিকা?'

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম, 'কিন্তু আজ থাক্‌—এ যে বোর্ডিং,—'

কিন্তু কে শোনে সে কথা?—সুবিধা পাইয়া, প্রমোদবাবু তাঁহার অন্তরের কত গুপ্ত কথাই আজ ভাবের আবেগে বলিয়া গেলেন, নীরবে নতমুখে আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর হঠাৎ কখন গম্ভীর কণ্ঠে 'চোললুম'—বলিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন—র অত বড় এই নির্জ্জন ঘরে, একাকী আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম,

একটীমাত্র প্রজ্বলিত 'লাইটে' অত বড় ঘরের সমস্ত ছায়া বিদূরিত হয় নাই,—সেই আলোকছায়ায় ঘেরা রহস্যাবৃত ঘরখানিতে একাকী আমি বসিয়া রহিলাম, পার্শ্ববর্ত্তী দেয়ালখানিতে ঘড়ির 'টিক টিক' শব্দটী কাণে বড় স্পষ্ট হইয়া বাজিতেছিল ! মনটা আমার উদাস হইয়া গেল।

মণিকা আসিয়া হাসিয়া বলিল, 'এত কি ভাবচ যুঁই ?'

'কিছুই না,—'

'কিছুই না বই কি, অমনি শুধু চুপ করে, আবার ঘরে বসে আছ ?— কিছুই তুমি ভাবছিলে না ? মিথ্যে কথা ? আচ্ছা যাক্,—কিন্তু কে এসেছিলেন। সেটা বল, শুনি ?'

'আহা, তুমি কি আমাদের বাড়ীর সবাইকে চেন, যে নাম বল্‌লেই বুঝতে পারবে !'

'পার্‌ব বই কি, উনি তোমার দাদা যে নন্ সে ঠিক জানি।'

আমি হাসিয়া বলিলাম 'তাই ত, সবই যে জান দেখচি, তাহলে কে এসেছিলেন তাও তুমিই কেন বল না।'

'বল্‌বো ? তোর বর,—'

'ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি যে বল তার ঠিক নেই,—'

মণিকা রাগ করিয়া বলিল 'কেন, মিথ্যে কথা ? গোপন কোরচ আমায়, যুঁই ? অত খানি 'ভালবাসি' 'ভালবাসি' বাইরের লোকেই এসে শুনিয়ে যায়, না ?'

আমি লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিলাম 'তা, মাথা গরম হলে তাও শোনায় বই কি ? কিন্তু তাতে কাণ না দিলেই হলো,—তা ঐ কথাটুকুনই ত খালি শুনেছ দেখচি, কিন্তু আমি কি বলেচি, তা শোন নি !'

মণিকা হাসিয়া বলিল 'রাগ কোর না যুঁই, আমি ইচ্ছে করে শুনি

নি, এ ধারটা পাস্ করে যাচ্ছিলাম, কাণে এসে কথা গুলো ঢুকে পড়্‌ল, তাই! আর কিছুই আমি শুনি নি।'

বাহিরে আসিতেই মিস্ রায় বলিলেন—'যুঁই তোমার ভিজিটর বোধ হয় জানেন, কিন্তু, আসছে বার থেকে বলে দিয়ো সন্ধ্যে সাড়ে ছয়টার পর, আর থাকবার নিয়ম নেই, আজ তোমাদের সাতটা হোয়ে গ্যাছে।'

মৃণাল আসিয়া হাসিয়া বলিল, "ভাই যুঁই, লোকটা কে?"

গা আমার জ্বলিয়া গেল, কিন্তু হাঁসিয়া বলিলাম, "এসেছিলেন তোমার খোঁজ কর্ত্তে, তুমি কেমন—ইত্যাদি।"

সপ্রতিভ মৃণাল দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিয়া ফেলিল, 'বেশ, বেশ, কিন্তু তাতেই কি এত মত্ত হয়ে পড়েছিলে যে, সাড়ে ছ'টার জায়গায় সাতটা হোয়ে গেল?'

* * * *

কি পরিশ্রমে কি উদ্বেগেই ক'টা দিন কাটিল, পরীক্ষার আগে এত ভাবনা আমার আর কখনও হয় নাই, কিন্তু আজ মনে হইতেছে, এত ভাবনা এত পরিশ্রম আমার বৃথাই যায় নাই, প্রথম 'প্রাইজ'টী নিয়া ফাষ্ট ক্লাশে উঠিয়াছি, আজ আমার সবখানি পরিশ্রম, আজ আমার এ বোর্ডিংএ আসা সবই সার্থক!

আজ দাদা আসিয়াছিল, বলিল 'তোয়ের হ'য়ে থাকিস্, কাল আটটার সময় এসে বাড়ী নিয়ে যাব।'—আবার বাড়ী? বাড়ীর কথায় মনের কোণে একটু ব্যথা জাগিয়া উঠিল, হাসিয়া বলিলাম 'কেন, এই ত বেশ আছি, বাড়ী কেন? কোন ঝঞ্ঝাট নেই, গোলমাল নেই, কাজকর্ম্মের তাড়া নেই, এইত বেশ! বাড়ী গিয়ে কি হবে!'

দাদা বলিল, 'না বাপু তোকে ছাড়া কি চলে? অত বড় বাড়ীটা—কি যে ফাঁকা ফাঁকা লাগে, এত দিন যা হোক তবু তোর পরীক্ষাটা ছিল তাই, আর না,—"

'আর বোর্ডিংএ আসব না! পড়বো কোথায়?'

'কেন—বাড়ীতে।'

'হ্যাঁ, বাড়ীতে আবার পড়া হয়!'

'নাঃ—বাড়ীতে কি আর কেউ পড়ে! যত রাজ্যের পড়ুয়ে ছেলে-মেয়েরা সব তোদের এই বোর্ডিংএই এসে জুটেছে আর কি!'

হাসিয়া বলিলাম 'তা—কেন, কিন্তু,—আমি বোর্ডিংএ-ই থাকবো।'

দাদা বলিল 'আচ্ছা, সে পরের কথা,—কাল ত বাড়ী চল,—তার পর মা বাবা যা বলবেন, তা'ই ত হবে।'

দাদা চলিয়া গেলে সোফিদিকে গিয়া বলিলাম "ভাই সোফিদি এবারে ত বাড়ী চল্লুম,—"

সোফিদি বিস্মিত হইয়া বলিল 'ওমা, সত্যি? আবার কবে আস্‌বি ভাই?'

মৃণাল পেছন হইতে ফোঁস্ করিয়া উঠিল, 'হ্যাঁ, ও আর আস্‌চে! ওর যে——জান না বুঝি।'

একসঙ্গে কয়েক জন বলিয়া উঠিল 'তাই না কি? তা কবে গো—কবে!—আমাদের ভাই ফাঁকী দিয়ো না,—'

আমি বলিলাম, 'মৃণাল দেখচি, অন্তর্য্যামী! তা, কবে—সে কথা মৃণালই আমার চেয়ে ভাল জানে,—তাকেই জিজ্ঞেস্ কর না।'

উপরে উঠিতে উঠিতে শুনিতে পাইলাম মেয়েরা মৃণালকে ঘিরিয়া অস্থির করিয়া তুলিতেছে,—'সত্যি না কি ভাই; কোথায় শুন্‌তে পেলি ভাই; কবে ভাই—'

*　　*　　*　　*

আজ আমি বাড়ীতে,—বহুদিন পরে নিজের ঘরে, নিজের জায়গায়, নিতান্তই অচেনা অপরিচিতের মত আসিয়া পড়িয়াছি, কে জানে কেন, সেই পুরাতন ছোট যুথিকাটির মত আসিয়া নিজের জায়গাটুকুও অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিলাম না, মনে হইতেছে যেন আমি কত বড় হইয়া গিয়াছি,—কত দেখিয়াছি, কত শিখিয়াছি! আজ আর আমি মা বাবার কোলের আবদারে মেয়েটী নই! কিন্তু দেখিতেছি, বড় হওয়ার পরিবর্ত্তনে সুখ নাই,—অভিজ্ঞতা মানুষকে কুটিল করিয়া দেয়। তাই যদি হয়, বয়সটাকে তবে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না কেন!

বাড়ী আসিয়া দেখিলাম,—মহা গোলযোগ, সবাই মহা ব্যস্ত,—আজ নাকি দমদমে আমাদের পিক্‌নিক্! এগারটার সময়, বাবা, মা, প্রমোদবাবু এবং আমি দমদমে রওনা হইলাম! আগে হইতেই সেখানে সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিবার জন্য, দাদা তাহার নিমন্ত্রিত বন্ধু ও চাকরদের নিয়া আগের ট্রেণে চলিয়া গিয়াছে। আমরা নতুন মোটরটায় করিয়া আশে পাশে নানা জায়গায় বেড়াইতে বেড়াইতে ধীরে ধীরে চলিলাম, মনের ভার ক্রমশঃ লঘু হইয়া আসিতে লাগিল,—বেশ প্রফুল্লভাবেই বাবা মার সকল কথার উত্তর দিতে লাগিলাম।

দমদমে পৌঁছিয়া দেখিলাম,—সুন্দর একটা বাগানে আমোদের হাট বসিয়াছে, মস্ত বড় তাঁবুটার এক পাশে দাদা তাহার বন্ধুদের নিয়া গান বাজনা এবং হাসি গল্পে সারা বাগানটী মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। আর দেখিলাম—রান্নার তত্ত্বাবধানে আর এক জন মানুষ,—নতুন নহে, অচেনাও নহে, কিন্তু, একরূপ ভুলিয়াই ত ছিলাম,—আবার কেন! চট্

করিয়া মনে পড়িয়া গেল—সেই সব অনেক কথা—সেই মার ভয়, রাগ, এবং আমার বোর্ডিং বাস !

মনটা যেন হঠাৎ দমিয়া গেল,—মনে হইল, ভয়ও হইল, কে জানে আবার নতুন করিয়া কোন গোলমাল বাঁধে না কি ! দাদার কি এতটুকু বুদ্ধি নাই ! মা যাঁকে পছন্দ করেন না, যাঁর সঙ্গে আমাদের মেলামেশা ভাল বাসেন না, কি কাজ তাঁকে আমাদের এই দলের ভিতর টানিয়া আনা ! আজিকার দলে একমাত্র ইনিই আমাদের সমাজ ছাড়া, ধৰ্ম্ম ছাড়া !

দাদার উপর আমার রাগ হইতে লাগিল, চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেও যার জ্ঞান হয় না, তাহাকে আর কেমন করিয়া বোঝান সম্ভব ; মনটা আমার বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল।

প্রমোদবাবু বলিলেন, 'আসুন মাসীমা, আমরা একটু বাগানটা ঘুরে দেখে আসি, এসো যুঁই,—'

মা বলিলেন 'একটু জলটল খেয়ে নিয়ে সবাই চলুক না, সবাই ঘুরে বেড়াক, চাএর জল ত দেখছি ফুটচে,—নরেন, যাও ওদিকে বস গিয়ে আগুন তাতে দাঁড়িয়ে থেকে, কেন মিছে কষ্ট পাওয়া ? ও আমাদের বাড়ীর ঠাকুর, আপনি সব করে নেবে।'

তার পর খুব হৈ চৈ, খুব গোলমাল করিয়া জলযোগ শেষ হইল ; লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, বাবা প্রতিদিনকারই মত প্রশান্ত প্রফুল্ল, মাঝে মাঝে সকলের কথাতেই বেশ যোগ দিলেন,—কিন্তু সব চেয়ে গম্ভীর, প্রমোদ বাবু। মনে একটু ঘৃণার ভাব আসিতে চাহিল—আশ্চর্য্য ! লোকের সঙ্গ ইনি এত অপছন্দ করেন কেন।

তার পর সারা দিন ধরিয়া কত রাস্তা কত বাগান ঘুরিয়া বেড়াইলাম, অনেক দেখিলাম, গাছের নাম ফুলের নাম অনেক শিখিলাম, কিন্তু

কিছুতেই ত মন খুলিয়া অসঙ্কোচে বেড়াইতে পারিলাম না। নিজের এই অকারণ সঙ্কোচে নিজেই লজ্জা পাইয়া বারবার এই নারী জন্মটায় ধিক্কার দিলাম।

প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা আবার কলিকাতায় ফিরিয়া চলিলাম ; সারা দিনের পরিশ্রমে শরীরটা এলাইয়া পড়িতেছিল। নরেন বাবু আমাদের গেট্ হইতেই বিদায় লইয়া গেলেন, দাদা বারবার বলিয়া দিল, "কাল একটু শীগ্গীর করে এসো যূঁইকে ও মাকে পার্শি থিয়েটারে রামায়ণ দেখাতে নিয়ে যাবো। দুজন হলেই সুবিধে।"

মা কিছু বলিলেন না।

৬

ক'টা দিন এ যে কি ভাবেই কাটিয়া গেল—আজ যেন সে সব ভাল মনেও পড়িতেছে না, এ যেন একটা স্বপ্নের ঘোর,—যেন একটা কি এক ভাব!

আজ বড় আঘাত, বড় লজ্জার পর, মনটা যেন অপরাধের ভারে ভারী হইয়া উঠিতেছে, আজিকার এ জাগরণটুকু আমার আরো দিন কয়েক আগে হইল না কেন?

কাল সন্ধ্যার পর, রুদ্ধ গৃহের দোরটি ঠেলিয়া প্রমোদবাবু যখন আমার সম্মুখের আসনে আসিয়া বসিলেন,—আমার তখন বলিবার আর কিছু ছিল না, অসহ্য কান্না এবং মনের যন্ত্রণায় টেবিলের খোলা বইএর উপর মাথাটা রাখিয়া চেয়ারে বসিয়াছিলাম।

পদশব্দে এবং বসিবার ভঙ্গীতে কে যে ঘরে আসিয়াছেন, তাহা না দেখিয়াও মনে আমার অজানা ছিল না, চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখা, কিংবা সরিয়া বসাটা প্রয়োজনীয় বোধ করিলেও মনের মধ্যে তেমন একটা জোর অনুভব করিলাম না। টেবিলের উপর এলায়িত আমার ডান হাতখানি নিজের হাতের মুঠায় শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া গম্ভীর স্বরে প্রমোদবাবু কহিলেন—"ওঠ যুথিকা, মুখ তোল, আমি বিশ্বাস করি নি, তবু তুমি মুখ ফুটে একটীবার বল, লোকে যা বল্‌চে তা নিছক মিথ্যে বই আর কিছু নয়? বল, বল একবার!—"

আবার সেই কথা!—মনটা জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু, সত্যই ত, অপরাধ ত কিছু কম করি নাই, ক'দিন ধরিয়া কি যে করিলাম, কি যে আমার হইয়াছিল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আমি ত এখন আর কচি খুকীটী নই, দাদা

চিরদিনই ছেলে মানুষ, অত কথা সে ভাবিয়া দেখে না, কিন্তু আমি কেন বুঝিয়াও বুঝিতাম না ?

বিকালে ঠিক পাঁচটা বাজিতেই মোটরে করিয়া প্রতিদিন দাদার সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইতাম, নরেনবাবু কোন দিন আগে হইতেই সঙ্গে থাকিতেন, কোন দিন তাঁহার মেসের দরজায় মোটর থামাইয়া দাদা তাঁহাকে তুলিয়া নিত। মোটরের শব্দে মেসের ছেলেরা জানালা দিয়া তাকাইয়া দেখিত আর লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়া আসিত। একটা সঙ্কোচ আর ভয় আমার মনটাকে প্রতিদিনই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত, কিন্তু তবু ত দাদাকে বারণ করিতে পারিতাম না, আমি যেন কেমন মোহমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। কতদিন দেখিয়াছি, কত চেনা মানুষ গাড়ীর পাশ দিয়া চলিয়া গেল, কেহ কেহ বা এমন অসম্ভব জায়গায়, একটা হিন্দু মেসের সামনে আমাকে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া হাসিয়া গেল।

কাজটা যে আমার ভাল হইতেছে না, আমি তাহা বুঝিয়া নিজেকে প্রতিমুহূর্ত্তে সতর্ক করিয়া নিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু পরের দিনই সে কথা আর মনে আমার থাকিত না। সান্ধ্য রজনীর আলো-অন্ধকারে, বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে জনবিরল গড়ের মাঠের পথে পথে যখন হাওয়াগাড়ীতে হু হু করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম, তখন মনে হইত যেন কোন্ এক স্বপ্ন-পুরীতে হাওয়ার উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছি। চৌরঙ্গীর তীব্র-আলোক-উজ্জ্বল দোকানগুলি যেন সেই মায়াপুরীর বিলাসক্ষেত্র, আর দাদাদের মৃদু গুঞ্জরণ যেন কোন্ দূরাগত সঙ্গীতের একটি অস্পষ্ট মূর্চ্ছনা। কি রকম যে একটা নেশা-জগতে চলিয়া যাইতাম তাহা বলিতে পারি না। তখন পিতামাতা, বাড়ীঘর, সংসার সমাজ—সব ভুলিয়া যাইতাম, কিছুই মনে থাকিত না। অবশেষে

মোটরখানি যখন আমাদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিত, এবং উহা হইতে অবতরণ করিতাম, তখন মাটির স্পর্শে যেন আমার চেতনা ফিরিয়া আসিত, কিন্তু নেশার ঘোর একেবারে কাটিত না। গভীর রাত্রে যখন সকলে ঘুমাইয়া থাকিত, তখন কত দিন মুক্ত গবাক্ষপথে বহুদূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আনমনা হইয়া বসিয়া রহিয়াছি,—মনে হইয়াছে ঐ দিগন্তের খুব নিকটে বৃক্ষনিবিড় সেই গড়ের মাঠ ;—তার পরিষ্কার রাস্তাগুলি কি সুন্দর, তার পথ পার্শ্বের আলোগুলি কি জানি কোন্ এক রহস্যপুরীর পথ দেখাইয়া দিতেছে !! এখন দোকানের আলোগুলি নিবিয়া গিয়াছে, পথের পথিক-প্রবাহ থামিয়া গিয়াছে, এখন সেখানে গেলে হয় ত সেই রহস্যপুরীর আভাসটা স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে। তার পর কখন যে সেই পথে পথে মোটরে হু হু করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছি ; তাহা মনে নাই, সেই মোটরে আমি ছাড়া আর কে কে ছিল, তাহা বলিতে পারি না, শুধু মনে হইয়াছে, আমার পার্শ্বের আসনে কাহারা যেন আমাকে অত্যন্ত ঘেঁসিয়া বসিয়াছে, এবং কোন্ এক অদৃশ্য চালক আমাদের মোটর খানিকে বিপুল প্রান্তরের নির্জ্জনতা এবং অন্ধকারের মধ্য দিয়া ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে—তার পর সহসা গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিতেই চমকিয়া জাগ্রতস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়াছি। ঘুমাইয়াও কত দিন এম্নি কত স্বপ্ন দেখিয়াছি। রাত্রি প্রভাত হইলেই সব স্বপ্ন, সব নেশা দূর হইয়া যাইত। তখন রাত্রির কথা মনে হইলে বোধ হইত যেন আমাকে ভূতে পাইয়াছিল, উহা যেন আমার ভূতগ্রস্ত অবস্থার একটা দুরন্ত স্মৃতি। কিন্তু বেলা পড়িয়া আসিতেই আবার যেন সেই ভূত আমার ঘাড়ে আসিয়া চাপিত, বাহির হওয়ার জন্য সমস্ত প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিত। আমার এই সান্ধ্যভ্রমণ লইয়া কত টিপ্পনী টিট্‌কারী শুনিয়াছি এবং আর বেড়াইতে যাইব না

বলিয়া কতবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ; কিন্তু সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিবামাত্র সব ভুলিয়া যাইতাম, কে যেন আমাকে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া যাইত।

এক দিন মা বলিলেন, "বোর্ডিং ছেড়ে এসে অবধি তোর যে কি হয়েছে জানিনে, রোজ রোজ এম্নিভাবে না বেড়ালেই কি নয় ? লোকে কি বলে ? দেখচি নিন্দে না রটিয়ে আর তোমাদের বেড়ানর সাধ মিট্‌বে না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এত বড় মেয়ে, তা একটু লজ্জা নেই, একটু বুদ্ধি নেই !"

সে দিন আমার ব্যর্থ সজ্জা আমাকে লজ্জা দিতে লাগিল, আমি আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলিয়া আসিলাম। যাহা বলিবার মা সকল কথাই ত বলিলেন, ইহার চেয়ে মানুষ বেশি আর কি বলিতে পারে ! তবু যদি আমার বুদ্ধি না হয় তবে আর কি ? দেখিলাম, দাদা কোটের বোতাম পরাইতে পরাইতে আমাকে ডাকিতে আসিতেছে, আমি দ্রুত-হস্তে ঘরের কবাট বন্ধ করিতে করিতে বলিলাম, "আমি যাব না, তুমি যাও, তোমার জন্যে মিছিমিছি শুধু বকুনি শুন্‌তে আমি আর পারিনে।"

দাদা খানিকক্ষণ কপাট ঠেলাঠেলি করিয়া রাগ করিয়া ফিরিয়া গেল !

সেদিন অনেক রাত্রিতে দাদা বাড়ী ফিরিয়া আসিলে মা রাগ করিয়া বলিলেন "কোথায় যাস্ শুনি, রোজ তোর বাড়ী ফিরতে কেন এত রাত হয় ?"

দাদা নির্ব্বিকার ভাবে উত্তর করিল "আর কোথাও না মা, এই নরেনের মেসেই নানা কথায় রাত হয়ে গেল।"

"রবিবার দিনটা,—একটীবার মন্দিরে গেলে হোত না ? খালি নরেন, নরেন, ঐ নরেনই তোর মাথা খেলে।"—

"খেলে আর কই ! কেন মা, তুমি কি নরেনের চেহারায় রাক্ষসের ভাব কিছু দেখেচ ?"—

মা অত্যন্ত রাগ করিয়া সরিয়া গেলেন এবং দাদা হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিয়া গেল। কিন্তু কথাটা যে ঐখানেই শেষ হইবে না তাহা আমি জানিতাম, তাই রুদ্ধশ্বাসে সেই ভয়ানক মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।—মার অত্যন্ত রাগের ভাবে এবং দাদার অসংযত বাক্যের প্রবাহে এই স্রোত যে কোথায় গিয়া থামিবে, তাহা কল্পনা করিতেও আমার বুক শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। একটা আসন্ন ঝড়ের প্রতীক্ষায় আমার হাত পা যেন অসাড় হইয়া আসিল।

তার পর দাদা খাইতে বসিল, মা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগি-লেন—'যতীন, তোর নিজের মত আমার মতামতের চেয়েও যদি বড় মনে করে' কেবলই বাড়াবাড়ি করিস, তা হলে তুই মেসে কি হোষ্টেলে গিয়েই থাক, আমার চোখের ওপর অত যাচ্ছেতাই কাণ্ড আমি ঘটতে দেবো না।'

'কি এমন যাচ্ছেতাই কাণ্ড আর বাড়াবাড়িটা হোল শুনি ?'

'বাড়াবাড়ি নয় ? তুই জানিস্ সব্বার সঙ্গে যুঁইর অত মেশামেশি আমি পছন্দ করি না, তবু তুই কি বলে, অজানা অচেনা সব্বার সঙ্গে একই গাড়ীতে ওকে বসিয়ে সারাটা সহর ঘুরিয়ে আনতে সাহস পাস্ ? তোর লজ্জা নেই—তাই,—নইলে, আমার যে মাথা কাটা গেল ! লোকের মুখে মুখে একটা সামান্য কিছু নিয়েই নিন্দে রটে যাওয়াটা ত অত কিছু শক্ত কথা নয়, যতীন !'

দাদা পরম নিশ্চিন্ত এবং নির্ব্বিকার ভাবে পাতের ভাত ক'টি শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং হাতে জল ঢালিতে ঢালিতে, তেমনই শান্ত-ভাবে কহিল—"কিছু ভয় পেয়ো না মা, কোন অজানা কি অচেনাকে

আমি তোমার মত না নিয়েই চট করে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে আসবো না, কিন্তু, অত সব বাজে কথা কেন মা ? নরেনকে অত চিনেও আজ যদি হঠাৎ বলে বস—ওকে ত চিনি নে—তাহ'লে তোমার জন্যে যে ভাববার বিষয় হ'য়ে উঠে !"

তার পর ক্রমাগত দুদিন ধরিয়াই বাড়ীর হাওয়াটী কি যে এক রকমের গুম হইয়া রহিল, ভিতরে ভিতরে তাহাতে আমি শুকাইয়া উঠিলাম। তাই, সে দিন সন্ধ্যায়, নির্জ্জন আমার ঘরটীতে এবং আমারই পার্শ্বে প্রমোদবাবুর এ অবস্থিতিটা আমার তেমন অসহনীয় বোধ হইল না,—বরঞ্চ বোধ হইল, সংসারের এখন যে অবস্থা,—আমি কে, আমার আবার কিসের মতামত ! মার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক ! নেহাৎ ত কচি খুকীটী নই, মার যে কি ইচ্ছা,—তা ত আজ দু বছর হইতেই চোখের সম্মুখে প্রতি নিয়ত নানাভাবে, নানারূপে বুঝিতেছি, এখন, আর না বোঝার ভাণ করিলে চলিবে কেন ? অকূল সমুদ্রে আমাদের এই ভাসমান সংসারটিকে কূল দেখাইতে একমাত্র ইনিই যদি কর্ণধার—তবে তাহাই হউক !—

মনের ভিতর অসংখ্য ভাবনা কেবলই জটলা পাকাইতে লাগিল,—কতক্ষণ এমনি স্তব্ধ হইয়াছিলাম, জানি না,—প্রমোদবাবুর আহ্বানে সহসা সচকিতে উঠিয়া বসিলাম।

'চেয়ে দেখ, যুঁথিকা, কথা কও,—'

'বলুন,—'

'এ কি তবে সত্যি ? লোকে যা বল্‌চে ?'

মনে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল,—লোকের কথাগুলি একবার নিজের কাণেই শুনিনা ! আমি যা জানি না, এবং কল্পনাতেও যা মনে করিতে পারি না,—তাই নিয়া শুধু এক গাড়ীতে দেখিয়াই, যে মহাকাব্যখানি লোকের মুখে মুখে সৃষ্ট হইয়া পড়িল, সেটা একবার

নিজের কাণেই শুনি না ! তাই অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি বল্‌চে লোকে ?'

'লোকে বল্‌চে,—সে অনেক কথা—কি বল্‌বো তোমায় আমি, লোকে নরেনবাবুর সম্বন্ধে—অনেক কিছু বল্‌চে, যা না কি তোমার পক্ষে—'

'থামুন, থামুন,—ছিঃ ছিঃ, তাই নিয়ে আপনারা এমন করে আলোচনা করচেন, আপনাদের একটু লজ্জাও হয় না ?'

'লজ্জা আমাদের হয়, এ লজ্জা আমারই—তাই সমস্ত বদনাম মাথায় তুলে নিয়ে, তোমার কাছে আজ ছুটে এসেছি। লোকে যা-ই বলুক, তোমায় ত আমি চিনি,—তবু একবার মুখ ফুটে তুমি বল,—তোমার এই সবখানি লজ্জা আমি নিজে বরণ করে নিয়ে, সমাজের চোখে তোমায় নিষ্কলঙ্ক বলে প্রমাণ করে দিই।

চিন্তা করিবার শক্তি মন হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কেবল মনে হইল—এ ভয়ঙ্কর মিথ্যা যে কত বড় একটা আঁধার ভবিষ্যৎকে স্বমূর্ত্তিতে গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করিতেছে, তার আমি কি করি ! এই যে নিরপরাধ, নিষ্কলঙ্ক, অতুলন, গম্ভীর মানুষ, আমার তুচ্ছ নামের সঙ্গে ইহাঁর নাম জড়িত হইল কেন ?—আজ যদি আপনাকে আমি প্রমোদবাবুর হাতে সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিই, তবে কি বাস্তবিক এ অপবাদ দূর হইবে ? তবে তাই হোক—

আমি রুদ্ধস্বরে বলিলাম—'আপনারা কি জানেন না, এ যে মিথ্যা, কত বড় মিথ্যা,—'

'জানি,—জানি বলেই ত এসেচি—

'যদি জানেন, লোকের মুখ তবে বন্ধ করতে চেষ্টা কর্‌লেন না কেন ?'

'লোকের মুখ অম্‌নিতে বন্ধ হয় না যুথিকা—'

'কিসে তবে হয় ?—'

'সে ভার আমায় দাও, তোমার লজ্জা, তোমার বদনাম সকল কিছুর ভার আমি নিজে মাথা পেতে নিই।'

'দিলম '

*　　　*　　　*　　　*

খোলা জানালার ফাঁকে ফাঁকে অনাহূত জ্যোৎস্না আমার ছোট্ট ঘর খানিতে এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু উঃ—জ্যোৎস্না কি এত ম্লান ? চাঁদের পানে চাহিলে কান্না আসে কেন ?

দূরে একটা বিবাহ বাড়ীতে সানাইর কান্না প্রাণটাকে আকুল করিয়া তুলিল,—ওগো, এ কি আজ আমারই আত্ম-সমর্পণের শুভ উৎসব ?

৭

সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতেই, এই মুক্ত সূর্য্যা-লোকে আজ আমি নিজের কাছেই অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিলাম ; কেবলই মনে হইতে লাগিল বাঁচিয়া গিয়াছি, আমি বড় বাঁচিয়া গিয়াছি। একটা অনির্ণীত আকাঙ্ক্ষা ও অনির্দ্দিষ্ট আশা যে একটা ভুলের মূর্ত্তি ধরিয়া, আমাকে কেবলই কল্পনার রাজ্যে আকর্ষণ করিতেছিল ; আজ সহসা তাহা হইতে সরিয়া পড়িয়া, বাস্তবের এ কঠোর সত্য আমায় যেন মুক্তি-দান করিয়াছে। সকল সমস্যার মীমাংসার পরে আজ কেবলই মনে হইতে লাগিল, বাঁচিয়া গিয়াছি, আমি বড় বাঁচিয়া গিয়াছি। কিন্তু তথাপি যে একটা বিষাক্ত হাওয়া, আমার অন্তরখানিকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই পচাইয়া তুলিতেছিল, আজ তাহার স্মৃতি আমার ক্ষতস্থানটীকে কেবলই আঘাত করিতে লাগিল।

মা যখন ডাকিয়া বলিলেন 'যূঁই, চায়ের জলটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে শীগ্‌গীর করে নেবে এসো,—'

তখন বহুদিন পর, তাঁহার অত্যন্ত সহজ সরল আহ্বান আমার এই দোদুল্যমান মনটাকেও যেন সহসা সরল ও স্পষ্ট করিয়া তুলিল,—সমস্ত স্মৃতির বোঝা এবং তাহার অবসাদ সবলে পদতলে পেষণ করিয়া আমি সংসারে আমার ঠিক জায়গাটীতে আসিয়া দাঁড়াইলাম, মুখ তুলিয়া চাহিতেই, তাঁহার যে একখানি প্রসন্ন প্রশান্ত দৃষ্টি নীরবে আমাকে অভিষিক্ত করিয়া দিল, তাহা আজিকার আমার ঐ প্রভাত সূর্য্যের মতই নির্ম্মল ও দীপ্তময়! আমার সারাটী মন অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া, আজ তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িতে চাহিল ; কিন্তু এই প্রসন্নতার কারণ

অনুমান করিতে আমার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না, এবং মুহূর্ত্তে মনের মধ্যে যে একটা বিরুদ্ধভাবের উদয় হইতে চাহিল, আমি সবলে সেটাকে দূরে পরিহার করিয়া দিলাম। কিন্তু সারাটা দিনই, প্রতি কাজে কর্ম্মে, কথায় হাসিতে এই যে একটা ভূতগ্রস্ত দুরন্ত স্মৃতি আমার উর্ব্বর মনখানিতে বারবারই কেমন জলসিঞ্চন করিতে আসিল, আমি সেটা হইতে সযত্নে দূরে সরিয়া রহিলাম। এই যে দুইটী পরস্পর বিরোধী ভাবের প্রবল সংঘর্ষণের তলায় পড়িয়া মনটা আমার অহর্নিশি ঘুরপাক খাইতেছে মায়ের আমার প্রসন্নতার এ আলোটী যদি চোখের উপর অনুক্ষণ না দেখিতে পাই,—সংসারের এ পথে আমি তবে হারাইয়া যাইব যে!

বেলা পড়িয়া আসিতেই প্রমোদ বাবু আসিয়া হাজির হইলেন, এবং কতকটা অধিকারোচিত আদেশের ভঙ্গিতেই কহিলেন 'খানিকটা বেড়িয়ে আসা যাক, চল—'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'সর্ব্বনাশ, রাস্তার লোকগুলো যে দেখে ফেলবে! একেই ত রক্ষা নেই, তার পর নূতন খোরাক তাদের আর জোগাতে চাইনে। আমার কথার গুপ্ত ইঙ্গিতখানি যে শ্রোতার কোন মর্ম্মে যাইয়া পঁহুছিল, সে খবর আমি তাঁহার মুখের পানে না তাকাইয়াও বেশ বুঝিতে পারিলাম, একটা উচ্ছ্বসিত আনন্দের বেগে বুক আমার ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। প্রমোদ বাবু বলিলেন 'সে ভয় যদিও করিনে, তবু আমি তেমন অবিবেচক হব না, একলা তোমায় নিয়ে যাবো না, মাসীমাও আমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

ইটটী ছুঁড়িয়া যথাযোগ্য পাট্‌কেলটী খাইলাম, কিন্তু একটা অদম্য ইচ্ছার জোরে বলিয়া ফেলিলাম, 'মা সঙ্গে থাক্‌লে নিরাপদ যে সত্যি, তা বেশ জানি, কিন্তু দাদাটিই কি আমার অতখানি বয়সে, এবং অত বড় প্রকাণ্ড দেহটা সত্ত্বেও—একেবারে একটা কিছুই না! তাকে কি

আপনাদের কারুরই চোখে পড়ে না ?' প্রমোদ বাবু হাসিয়া বলিলেন— "কথাটা খুলে বলে ফেল্লেও তাতে লোকশান বিশেষ কিছুই হোত না, তুমি আরো যা কিছু গোপন রেখেই বলচো—তাও আমি বুঝতে পারচি,—কিন্তু, আমার বেলায় ও ভুলটা তুমি করো না, কেননা, আমিও যদি তাকে চোখে দেখ্‌তে না পেতুম,—তাহলে আজ এখানে আসা আমার পক্ষে সহজ হোত না, কিন্তু যূথিকা, এ কথাটা তুমি কিছুতেই অস্বীকার কর্ত্তে পাবে না, যে দাদাটী তোমার খুব বুদ্ধি রেখে চলে, বা বুদ্ধির কাজ সে করেচে ?"

আমি অসহিষ্ণু হইয়া বলিলাম, "কেন আপনি দাদাকে দোষ দিচ্ছেন, আমি যা কিছু করেচি, সব আমার নিজের ইচ্ছেয়।"

'রাগ কোর না যুথিকা, কিন্তু এ কথাটি সত্য, তোমার দাদা যদি এই হিন্দু ভদ্রলোকটীকে তোমাদের পরিবারে এমনি ভাবে না মেশাতেন, তবে কি আজ মিছে এ কথা কতগুলো রটতো !'

'হিন্দু বলেই কি তাঁর যত দোষ ! আমরা ব্রাহ্মরা, যদি সত্যিই লোকের আদর্শ, উদাহরণস্থল, বলুন ত তবে, আমাদের সমাজে ক'জন ছেলেকে এম্‌নি একেবারে নিখুঁত পাওয়া যায়।' 'ঈশ্‌, বড্ড যে একেবারে তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েচ !'

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম, 'গুণের ভক্ত হওয়াটা কিছু দোষের নয়, কিন্তু আপনিই ভুলে যাচ্ছেন, যে মানুষের দোষ গুণ দেখতে তার সমাজ-টাকে দেখতে নেই। একটা মানুষ ভাল বা মন্দ হলে, তার ব্যক্তিগত জীবনটাকেই দেখতে হবে, কেন আপনি সমাজ নিয়ে কথা বলচেন !'

প্রমোদ বাবু বিষয়টাকে অত্যন্ত লঘু করিয়া দিবার চেষ্টায় হাসিয়া বলিলেন "ঘাট হয়েচে, কিন্তু তুমিই বা এমন বিবেচক হয়ে উঠলে কবে থেকে ?'
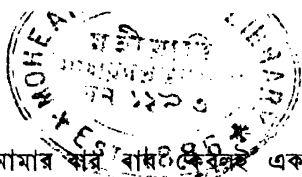
মনে আমার বার বার কেবলই একটা অকারণ সঙ্কোচের সৃষ্টি হইতেছিল, আমি জোর করিয়া সেটাকে নিরোধ করিয়া বলিলাম, 'কিন্তু আপনাদের পক্ষপাতিত্ব দোষটা এত বেশী, যে আপনারা কিছুতেই নিজেদের দোষটুকু স্বীকার কর্ত্তে চান না, আপনাদের এ গর্ব্বটা এত বেশী যে কিসের জোরে তা আমি কিছুতেই ভেবে পাইনে,—আপনারা মনে করেন, ব্রাহ্ম হলেই সে একেবারে মহাপুরুষ! কিন্তু এ সব দোষগুলো আপনাদের চোখে না পড়লেও বাইরের লোকে এগুলো এত স্পষ্ট দেখতে পায়, যে, আপনাদের প্রতি লোকের আকর্ষণ ক্রমেই কেটে যাচ্ছে।'

'তুমি কি বলিতে চাও, ব্রাহ্ম ধর্ম্মটা একেবারে একটা কিছুই নয়? রামমোহন রায় মিছেই অতটা কষ্ট করে গেছেন?'

"না, না, সে কথা আমি কক্ষনো বলবো না, ধর্ম্ম নিয়ে কোন কথাই আমি বল্‌চি না,—আমি সমাজের কথা বলচি। আর রামমোহন রায়, ধর্ম্মের একটা সহজ সরল পথই শুধু দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, তিনি ত আর মানুষের মনটা তৈরি করে দিতে পারেন না! তা বলে, আমি সমাজ শুদ্ধ সব্বারই কথা কিছু বলচি নে, আমাদের সমাজের এমন এক এক জন প্রচারক আছেন, যাঁদের পায়ে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে, এমন আরো অনেক আছেন যাঁদের দেবতা বল্লেও খুব বেশী কিছু বলা হোল না।" "হিন্দু সমাজে সব্বাই-ই খুব সাধু?"

"নিশ্চয়ই না, সে কথা আমি কখনো বল্‌বো না, আপনি কেন বারবারই ভুলে যাচ্ছেন, যে ঠিক ও রকম কথাটার জন্যেই অতগুলো কথা আমি বল্লুম! একটা সমাজের কি প্রত্যেকে কখনো ভাল হতে পারে, কিংবা সবাই-ই কিছু খারাপ হোয়ে যায়? আপনিই ত হিন্দু নাম শুনলেই তা'কে একেবারে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন।"

"তাই ত, যূথিকা, হিন্দুধর্ম্মটাই বেশ—না! কি বল! হিন্দু হবে?"

কথাটা বলবার ধরণ দেখিয়া, আমি ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, "না,—সে প্রয়োজনটা এখনো তেমন কিছু বোধ কর্চ্ছি না।"

দোতলা হইতে মা ডাকিয়া বলিলেন, 'যূঁই, কাপড় পরা হোল! গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।'

প্রমোদবাবু কাছে আসিয়া মিনতির স্বরে বলিলেন,—'হার মানছি আমি, জিৎটা তোমারি, কিন্তু আর দেরী কোরোনা লক্ষ্মীটী একটু চল ঘুরে আসি—এমন মিষ্টি চাঁদ্‌নী রাতটা!

* * * * *

সাত রাজ্যের তেপান্তরের মাঠ ঘুরিয়া যখন বাড়ী ফিরিলাম, রাত তখন বেশ অনেকটা,—মনটা ভারি হাল্‌কা বোধ হইতেছিল,—জেঠিতে হাওয়া খাইয়া নয়, গড়ের মাঠে বেড়াইয়াও নয়—কেবল মাত্র ঐ স্পষ্ট কথাগুলি বলিয়া।—ভদ্রলোকটীর অতখানি গর্ব্ব কিছুতেই আমার সহ্য হইত না, আজ কথা উঠিল—ভালই, না হইলেও যে ভাবে আমি ফাঁক খুঁজিতেছিলাম, সুযোগ পাইতে বিলম্ব আমার হইত না।

পর দিন বিকালে মা আমাকে বলিলেন, 'স্পর্দ্ধা ত তোর কিছু কম নয় যূথিকা! প্রমোদকে কি তুই ছেলেমানুষ পেয়েছিস্ যে যত সব বাজে জিনিষ নিয়ে তর্ক করবার ইচ্ছে তাকে দেখ্‌লেই তোর জেগে ওঠে? যত সব বদনাম তুমি এই ক'দিনে বার করবার মত সুযোগ বাইরের লোককে দিয়েছ, সে সব শুনেও যে সে দয়া করে তোমায় বিয়ে করতে রাজী হয়েচে—সেই তোর কত ভাগ্যি,—তার উপর আবার এ সব কি? একটু কি লজ্জাও তোর হয় না! বোর্ডিংএ পাঠিয়ে

দিন কয়েক তবু নিশ্চিন্ত ছিলুম,—কিন্তু তুই যে এমন বেহায়া তা'ত জানতুম না ; আজ যদি প্রমোদ বেঁকে বসে—'

আমি অত্যন্ত শান্তভাবে ধীরস্বরে বলিলাম,—'তা, অত দয়া উনি না-ই করলেন মা ?'

মা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, চলিতে চলিতে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু আর আমি সেখানে দাঁড়াইলাম না, কতখানি আঘাত পাইয়া, মার কথার উপরও যে আমি আজ কথা বলিতে সাহস করিলাম, সে কথা ত মা জানেন না।

বেশী কিছু অসাধারণ বা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ এবং সহজ আমার যে নারীত্বের গর্ব্বটুকু, তাহা যেন বড় আঘাত পাইয়া কোথা হইতে ফিরিয়া আসিল!—আমাকে দয়া কেন! আমি কি এমনই একটা পথের হেলা-ফেলা জিনিষ! দীন ভিখারী! অথবা মায়ের আমার আমি কি এমনই একটা বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছি, যে লোকের দয়ার জন্য বুভুক্ষার দৃষ্টিতে আমায় লোকের মুখের পানে তাকাইতে হইবে ?—

কেন ? হিন্দুর ঘরের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না,—তেমন মেয়ে ত আমি নই! আমার নারীত্বের প্রতি দয়ার অপমান সহ্য করিব আমি কেন, যে আমার সত্যমিথ্যা, আমার দোষগুণ সবখানি জানিয়া, সবখানি সহ্য করিয়া শুধু আমারই জন্যে যে আমায় গ্রহণ করিবে, আমার এ প্রাণের অর্ঘ্যটুকু তাহাকেই আমি দান করিব।—আর যাঁহার মোহ আকর্ষণ করিবার জন্য আমায় কেবলই প্রতি ব্যবহারে প্রতারণা ছলনা আনিতে হইবে,—তাঁহাকে আমার দরকার নাই।

মনটা একটু আনমনা হইয়া গেল, এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিভৃত নিশীথে, জীবনে প্রথম আজ ইচ্ছা হইল, একটীবার ভাবিয়া দেখি ত এই

আমার মনখানি জুড়িয়া কতখানি প্রেম, আমার এই ভাবী স্বামীটীর জন্য সঞ্চিত হইয়াছে! যাঁহাকে হৃদয় দিতে হইবে, এ হৃদয়ে তাঁহার জন্য কিছু আছে কি? শুনিয়াছি প্রেমে মানুষ কোমল হয়, বিশ্বসংসারের পদতলে মানুষ আপনাকে লুণ্ঠিত করিয়া দেয়, প্রেমের যে চোখে মানুষ সকলি সুন্দর দেখে, সকলকেই ভালবাসে—আমার এ মনের সে চোখ কোথায়?

একটা গভীর শূন্যতায় প্রাণটা হাহাকার করিয়া উঠিল,—প্রেমের সঞ্চার যদি মনে হইল না,—কিসে তবে আমরা যুক্ত হইব? মনে পড়িল প্রভাদির বিবাহে সে দিন উপদেশ শুনিয়াছি,—ভগবান বলিতেছেন, যে বিবাহ আমা দ্বারা ভালবাসার গ্রন্থিতে বদ্ধ হইল না, সে বিবাহ কথনও সিদ্ধ হইবে না!

শিহরিয়া উঠিলাম,—হায়, একি আঁধার ভবিষ্যৎ আমাদের, একজনের হৃদয় ধনের গৌরবে, আভিজাত্যের গৌরবে এবং সর্ব্বোপরি মোহের লালসায় সমাচ্ছন্ন, আর এক জনের হৃদয় স্তব্ধ সাহারা মরু!

ভারাক্রান্ত মনখানি ঘরের এই রুদ্ধ হাওয়ায় অতিষ্ট হইয়া উঠিল,—আমি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, নীচের ঘরে মা মাসীমার সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন,—তাঁহাদের কথার ফাঁকে ফাঁকে আলোচনার যে দুই একটা টুক্‌রা, আমার কাণে আসিয়া প্রবেশ করিল, মনটা তাহাতে বিরক্ত হইয়া উঠিল, নরেনবাবুর বাবার মাতলামোর সীমা কবে কোন্ দিন কি পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল,—তাহা নিয়া মিছামিছিই কেন আমাদের অত মাথা ব্যথা?

ভাবনাই ভাবনার গতি ফিরাইয়া দেয়, চট্ করিয়া মনে পড়িয়া গেল, সেই আমার কল্পনার রহস্যপুরী—সে-ই আমার দিগন্তের স্পর্শলোলুপ বৃক্ষনিবিড় গড়ের মাঠখানি,—দু'একবার মনটাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা

করিলাম, কিন্তু কি জানি কেমন একটা মায়াময় স্বপ্নের ঘোরে মনটা ক্রমেই কেমন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

সহসা—এ কি! কে এ! এ কে? কে আসিয়া এমন অসময়ে 'যতীন' বলিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল! এ কি ন-রে-ন বাবু?—তেমনি সুন্দর কোমল সদানন্দ মূর্ত্তিখানি! কোথাও একটু সঙ্কোচ নাই, একটু দ্বিধা নাই,—আশ্চর্য্য,—এত আলোচনা,—এমন সব বিশ্রী কথা—কিছুই কি ইঁহার কাণে আজিও পৌঁছায় নাই! কেমন এ আত্মভোলা আশ্চর্য্য মানুষ!!

কিন্তু মুহূর্ত্ত কাল,—মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র আমার এ ভাবনা। তার পরই মার গলা শুনিয়া আমি উৎকর্ণ হইয়া উঠিলাম,—মা দাদাকে সম্বোধন করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'যতীন, তোমার সব বন্ধুরাই যে এসে যখন তখন আমার বাড়ীতে ঢুকবে, এ আমি পছন্দ করিনে—তোমার ইচ্ছে হয় ত তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ কোরো!

দেখিলাম,—বাহিরে দরজায় নরেনবাবু তখনও দাঁড়াইয়া আছেন,—তাঁহার সমস্ত মুখখানির উপর, কে যেন অকস্মাৎ এক বোতল কালী ঢালিয়া দিয়াছে, তিনি একবার মাত্র উপরের দিকে চাহিলেন,—এবং তন্মুহূর্ত্তেই দ্রুতপদে রাস্তায় বাহির হইয়া গেলেন,—দাদা ঘরে বসিয়া বোধ করি একজামিনের পড়াই পড়িতেছিল কিন্তু, সেও উপর হইতে নামিয়া, ছুটিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল।

—আর আমি?—যত কিছু অপমান, অপযশ, যত কিছু কলঙ্কের কারণ—এই আমি—দুই হাতে দুধারে আশ্রয় খুঁজিতে খুঁজিতে আমার ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র শয্যাখানির উপর আসিয়া উপুড় হইয়া পড়িলাম।

রাত্রি দশটার সময় দাদা ফিরিয়া আসিল, মা তাহার খাবার নিয়া নীচে বসিয়াছিলেন, কিন্তু, সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্রও না করিয়া—

তাঁহার কথার জবাবটুকু পর্য্যন্ত না দিয়া একেবারে আমার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। নীচে তাহার পদ শব্দ শুনিয়াই, আমি আলো জ্বালিয়া টেবিলের সম্মুখে আসিয়া বসিয়াছিলাম,—দাদা ঘরে ঢুকিয়া আলোটা নিবাইয়া দিতেই একরাশ জ্যোৎস্না আসিয়া ঘরের ভিতর ছড়াইয়া পড়িল। তার পর আমার মাথায় হাত রাখিয়া দাদা গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, 'আচ্ছা সত্যি করে বল দিকিন যুঁই, আমার কাছে একটুও গোপন করিস নি বোন—তুই নরেনকে বিয়ে কর্ত্তে পারিস ?'

উঃ—এ কি ভয়ানক কথা ?—এ কি প্রশ্ন তোমার ? এ কি রকম ঠাট্টা ভাই ?

ঝর ঝর করিয়া আমার চোখ বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, আমি আর চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিলাম না,—দাদা আমার মাথাখানি টানিয়া নিয়া, তাহার কোলে চাপিয়া খানিক বাদে বলিল 'আমি জানি মা ক'দিন থেকেই তোকে কেবলই কষ্ট দিচ্ছেন, বাইরেও তোকে ঢের কথা শুনতে হচ্চে, এ যে শুধু আমারই অবিবেচনার ফল তা আমি আজ বুঝতে পাচ্ছি,—সেও যে কি রকম দুঃখিত হয়েছে,—কি বলবো তোকে ! কিন্তু এতে নিন্দের কথা কেন এত উঠতে পারে ? জানিস্ যুঁই,—নরেনের সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে দেওয়া, সে আমি গৌরব বলেই মনে করি। আমাদের সমাজে ক'জন ছেলে অমন পাওয়া যায় ? একবার তাই, তার হয়ে আমার লড়ে দেখতে ইচ্ছে কচ্ছে—কিন্তু একটিবার তুই সত্যি করে বল দিকিন্ যুঁই,—তোর ত তাতে আপত্তি হবে না দিদি ?'

'না, না দাদা সে হবার যো নেই,'—বুকে আমার সে উচ্ছ্বসিত রোদন ভার, কিছুতে আর আমি চাপিতে পারিলাম না—দাদা নীরবে আমার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল, দাদার সে স্পর্শে অযত্নে বাঁধা এলো খোঁপাটী আমার পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িল। দাদা কোমল স্বরে

কহিল—'আজ বুঝি চুল বাঁধাও হয় নি? খেয়েছিস্ ত?—কিন্তু বল না লক্ষ্মীটী সত্যি করে, কেন তার যো নেই? সে হিন্দু বলে?'

'তা নয় দাদা, তা নয়, কিন্তু তবু সে হবে না, কেন অত বারবার করে বোল্‌চ?'

'তাও নয়,—তবে কি?'

'সে আমি দিয়ে ফেলেচি,—আমার কথা দেওয়া হয়ে গেছে।'

'হয়ে গেছে? কবে? কাকে?'

'প্রমোদ বাবু—'

'প্র—মো—দ—?'

৮

জ্যোৎস্নাধৌত বিরাট আকাশের নীচে, একাকী স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, দেহে মনে যে একটা অবসাদ আসিয়া অধিকার করিয়া বসিল, তাহা হইতে কিছুতেই আপনাকে উদ্ধার করিতে পারিলাম না। এ কি বিপদ, এ কি ভয়ানক কাণ্ড!! এত সব ইতিহাস খুঁজিয়া বাহির করিবার দাদার কি প্রয়োজন ছিল? বিলাতে কে কি করিয়াছে, কাহার নামে কবে কোন নজির বাহির হইয়াছে, আমাকে তাহা শুনাইবার কি দরকার ছিল? এই যে একটা আগাগোড়া ভুলের ভিতর দিয়াই চলিতেছিলাম, তাহাই চলিতাম, তবু ত সংসারটা শান্তিতে থাকিত,—কিন্তু এখন,—হায় রে,—এ কি জ্বালা!—লজ্জায় যে আমার মরিতে ইচ্ছা হইতেছে!—

দাদা বলিল—'সত্যি করে বলনা দিদি একটা কথা, প্রমোদকে তুই ভালবাসতে পারবি?'

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম, এ কি ভয়ানক প্রশ্ন! চট্ করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর কি করিয়া আজ দিই? মুক্তির দিক দিয়াই জিনিষটাকে আমি সহজ মনে করিয়াছিলাম, মনের ভিতরে ত তলাইয়া কখনও দেখি নাই। মার কথায়, নিজের আত্মগর্ব্বে যে দিন বড় একটা আঘাত বোধ করিয়াছিলাম, সে দিন ভাবিতে গিয়াও অশান্ত মনটাকে শান্ত করিয়া তুলিলাম, আজ আবার এ কি প্রশ্ন! দাদা বলিল, 'যুঁই ভুল করিস নি বোন, এটা মনে রাখিস,—যা'কে এমনি করে সমস্ত সমর্পণ করে দিতে হবে, তা'কে ভালও বাসতে হবে—সব্বার চেয়ে বেশি; মা, বাবা, ভাই,

বোন সব্বাইকে ছেড়ে একমাত্র যাঁ'কে নির্ভর করে, নতুন সংসারে যেতে হবে, তা'র মত আপনার সংসারে কি আর কেউ হোতে পারে দিদি ?—ঠিক এমনি করে তুই প্রমোদকে ভালবাসতে পারবি ?'

আমি উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন জোর করিয়া চাপিতে চেষ্টা করিয়া বলিলাম, 'অত কথা আমি ভাবতে পারিনে, আমার যদি কোথাও ভুল হয়ে থাকে, তুমি তা বুঝিয়ে দাও।'

দাদা আমার মাথায় হাত রাখিয়া খানিকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল, তার পর বলিল, 'এ আশঙ্কাটা আমার মনে সর্ব্বদাই হোত যে মা হয় ত ঝোঁকের মাথায় অত বড় ভুলটাই বা করে বসেন,—তা হোক, বাঁচিয়েছিস আমায় দিদি, তোকে কি বল্‌বো আমি, আজ যদি মুখ ফুটে অন্ততঃ আভাসেও একটু জানাতিস্ যে প্রমোদকে তুই ভালবাসিস্, তা'হলে এ বেদনা রাখবার ঠাঁই আমার আর হোত না। তোর ভালবাসা পাবার যোগ্য সে ? যে না কি বিলেতে—এই ছাখ, নিজেই তুই পড়ে ছাখ—এ আমি সঙ্গে করেই এনেছি,—ফস্ করিয়া দাদা লাইটটা জ্বালিয়া দিল, তার পর কাটা ছাঁটা, লাল পেন্সিলে নীল পেন্সিলে দাগ দেওয়া এক তাড়া খবরের কাগজ বাহির করিয়া যে কথাগুলি সে পড়িয়া গেল, সেগুলি শুনিতে এই দেহখানা আমার কতবারই যে শিহরিয়া উঠিল, কি বলিব ! তার পর কখন দাদা উঠিয়া গিয়াছিল ভাল মনে নাই, কেবল—মনে পড়িতেছে, যাবার সময় এই বলিয়া গেল, 'কিছু ভয় নেই, যুঁই, আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ মিছে এ ভাবনা নিয়ে তুই ভেবে মরিস না দিদি, যা করবার আমিই তা কোরবো।'

না হয় আমি নাই কিছু ভাবিলাম, কিন্তু মা ত আমায় কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিবেন না।

সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া মার মুখের পানে আমি কিছুতেই

চাহিতে পারিলাম না। টেবিলে চা করিতে গিয়া শঙ্কিত কম্পিত হস্তে এমন সব যাচ্ছেতাই কাণ্ড করিলাম, যে আমার অন্যমনস্কতার উপর মা অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন।

নীচের কাজ শেষ করিয়া, আমি ধীরে উপরে উঠিয়া আসিলাম, চাএর ঘরে, কেবল মা, বাবা ও দাদা বসিয়া রহিলেন। আজ যে আমাকে নিয়াই অনেক কিছু বিশ্রী লজ্জাজনক আলোচনা এই ঘরে হইয়া যাইবে আমি তাহা বেশ বুঝিলাম, মনে হইল ইহার পর মা বাবার সম্মুখে আমি আর দাঁড়াইব কেমন করিয়া! তার চেয়ে সংসারে অনেক লোকেরই যা হইতেছে, হঠাৎ অত্যন্ত অজানিতভাবেই হার্টফেল করিয়া চট্ করিয়া একেবারে শেষ হইয়া যাওয়া,—তাই যদি হয়! হায় ঈশ্বর!! একবার মনে হইল, বিলাত ফেরতদের উপর মার যে প্রবল ভক্তি রহিয়াছে, এবারে তার উচ্ছেদ হইবে ত? মা গো মা, বিলাত ফেরত আবার মানুষ হয়? কি সর্ব্বনাশের ভুলপথে আমি রওয়ানা হইতেছিলাম! মনে প্রাণে শিহরিয়া উঠিয়া আমি বলিয়া ফেলিলাম—বড় বাঁচিয়া গিয়াছি, আমি বড় বাঁচিয়া গিয়াছি। আজ মনে হইতেছে প্রমোদবাবুর সব কথার ভিতরেই কেন আমি এমন একটা কৃত্রিমতার পরিচয় পাইতাম!

চেয়ারটা জানালার কাছে টানিয়া নিয়া বই খুলিয়া বসিলাম বটে, কিন্তু মনে আমার কেবলই পড়িতে লাগিল সে দিনকার সেই লজ্জাজনক অপবাদ এবং আমার আত্মসমর্পণ! এগুলো সত্য হওয়া তবু বা সম্ভব, কিন্তু দাদা আর একটা যে কি কথা বলিয়া গেল, সে কি কখনও সত্য হইতে পারে?—কো—থা—য়—তিনি—আর—কো—থা—য় বা আমি! যেখানে এত ব্যবধান, সেখানে কি—অসম্ভব! আমি ত এভাবে তাঁকে ভাবিতে পারি না!! কিন্তু বুকটা এত দুর্ব্বল

বোধ হইতেছে কেন? ভাল লাগে না, কিছু আর ভাল লাগে না।
জীবনটা আমার কেমন যেন হইয়া গিয়াছে।

পরদা ঠেলিয়া ঝড়ের বেগে মা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—'এ কথাগুলো তৈরি করলে কে যূঁই?'

আতঙ্কে আমি মরিয়া গিয়া বলিলাম—'কি কথা মা?'

'এ—ই প্রমোদ সম্বন্ধে বিলেতের—'

আমি ধীরে ধীরে টেবিল হইতে গোটাকয়েক কাগজের টুকরা মার দিকে অগ্রসর করিয়া বলিলাম—'জানিনে—তুমি ভাখ—'

মা মিনিট কয়েক পরে—সেখানে দাঁড়াইয়াই কাগজ ক'খানা বরাবর এপিঠে ওপিঠে দেখিয়া ম্লান বিবর্ণমুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, যাবার সময় আমার মুখের উপর যে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া গেলেন, আমার বুকে তাহা ছুরির মত বিঁধিতে লাগিল।

* * * * *

বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম—পৃথিবীর বুকখানি ভরিয়া সূর্য্যের যে আলো শ্বেত পদ্মটীর মত এতক্ষণ ফুটিয়াছিল, অকস্মাৎ কখন তাহা কেমন একটা অস্পষ্ট ধোঁয়ায় ঢাকিয়া গিয়াছে, কোথা হইতে রাশীকৃত ছাই ভস্ম উড়িয়া উড়িয়া নীলাভ আকাশখানিকে পাংশু করিয়া তুলিয়াছে!—বসন্তের ফুল, মলয়ার হাওয়া সুখের হাসি—সে কি এই পৃথিবীর জিনিষ?

* * * * *

* * * * *

সন্ধ্যার পর বাবা কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিলে, প্রতিদিনকার মতই আমি চা ও খাবার নিয়া তাঁহার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিলাম; মা

কাছেই বসিয়াছিলেন, কিন্তু, আমাকে লক্ষ্য মাত্র করিলেন না। বাবার মুখের পানে তাকাইয়া দেখিলাম,—অত্যন্ত অন্যমনস্ক,—টেবিলে আমি চা রাখিতেই, সহসা তিনি সচকিত হইয়া উঠিলেন, এবং ধীরে ধীরে বলিলেন,—'যতীনকে একবার পাঠিয়ে দিস ত মা,—সে কি পড়ছে?'

'দিচ্ছি বাবা—'

আমি সশঙ্ক চিত্তে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলাম, মনের ভারে পাপ বুঝি ভারী হইয়া উঠিয়াছিল, প্রতি পদক্ষেপে মনে হইতে লাগিল, আমার এ অস্বাভাবিক চলন-ভঙ্গীতে বাবা মা কি ভাবিতেছিলেন কে জানে!

মনে কলঙ্কের দাগ পড়িলে স্বাভাবিক সরলতা যে মানুষের কতখানি কমিয়া যায়, নিজের পানে তাকাইয়াই তাহা আমি স্পষ্ট অনুভব করিলাম, দাদার সঙ্গে বাবা মার কি গোপন পরামর্শ আমার অসাক্ষাতে হইয়া যাইবে, তাহা স্বকর্ণে না শুনিলে এ উদ্বেল প্রবৃত্তির রোধ ত আমার কিছুতেই হইবে না! প্রবৃত্তির সঙ্গে মিনিট কয়েক অবিরাম কেবলই যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আমি পা টিপিয়া টিপিয়া দোতালায় নামিয়া আসিলাম। পর্দার ভিতরে বাবা ও দাদার যে কথাগুলি হইতেছিল, রেলিংঘেরা বারাণ্ডাটির কোণে, আড়ালে দাঁড়াইয়াও তাহার কোন কিছুই শুনিতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না। বাবা বলিলেন—'এ সব যে সত্যি তার প্রমাণ কি?' দাদা বলিল—'কাগজগুলো ত আর মিথ্যে নয়—ফাঁকাও নয়, আর যদি বা তা মিথ্যেও হয়, মোকদ্দমাটা ত বাবা মিথ্যে নয়! তাতেও কি আপনার বিশ্বাস হবে না?'

মা ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, 'তুই গোড়া থেকেই ওর পেছনে যা করে লেগেছিলি, নইলে শুধু ওরই কোন্ আদ্যিকালের কবেকার কোন্ দোষ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করবার তোর কি এমন দরকার পড়ে গিয়েছিল?'

বাবা একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন,—'না, না, সেও কি একটা কথা? আমরা কি বিয়ে দিতে ভাল করে সব খোঁজ না নিয়েই দিতাম?'

দাদা উত্তেজিত হইয়া বলিল—'তা আর খোঁজ নিচ্ছিলেন কোথায়! এমনি করে যূঁইর সঙ্গে প্রমোদকে মিশবার সুযোগ তবে কেন আপনারা দিচ্ছিলেন। সমাজে আজ কে না জানে যে যূঁই প্রমোদের কাছে বাগ্দত্তা!'

মা অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিলেন—'ও রকম কথা দেওয়া বা ঠিক করা এ কিছু আমরাই আজ নতুন কচ্ছিনে।—কথা দেওয়া সমাজে অনেক হয়, আবার তা'তে খারাপ কিছু দেখলে, সে কথা আবার ফিরিয়েও নেওয়া হয়। কিন্তু, এখন তোর দোষে এমনি বদনাম সমাজের মধ্যে রটে গেছে, যে এই প্রমোদ ছাড়া আর কোন ছেলেই ওকে বিয়ে করতে এগুবে না, এ আমি জোর করে বলতে পারি।'

দাদা বিদ্রূপের স্বরে কহিল, সমাজের যে ক'টা ছেলেকে সম্প্রতি কলকাতায় আমি দেখচি, এগুবার মতো সাহস তাদের না হওয়াটাই ভাল মা, এ প্রস্তাবও যেন এঁরা কেউ না করেন।—না মা, তর্কের মাথায় তুমি চট্ করে অমনি রেগে উঠো না, কিন্তু মেয়ে ত তোমারি,— পারবে তুমি এদের যে কোনো একজনের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে?— আদর্শ আমাদের খুব বড় মা, কিন্তু তাই বলেই বড় বেশি বেশি বাজে বিনয় আর বাজে ভদ্রতায় আমাদের এতখানি চেপে রেখেচে, যে আমরা অনেকেই মানুষ হতে পারিনে।'

'এত সাহস তোর! ওঁর সামনে এত সহজে, এমনি করে তুই সমাজকে তুচ্ছ করতে সাহস পাস্! সমাজের লোকেরা কেউ মানুষ নয়?—উনি মানুষ নন!—ওঁকেও তুই গাল দিলি!'

'ছিঃ ছিঃ মা, কি যে বল, তার ঠিক নেই। আমি ত বাবা কিংবা তাঁদের যুগের কথা বল্‌চি নে, আমি বলচি, আজকালকার কথা। অত চটে উঠ্‌লে চলবে কেন মা, এ কথা কে না বুকে হাত রেখে বলবে বল, যে বিলিতি সভ্যতা এত বেশি বেশি পেয়েই আমরা এমন এক একটা অপদার্থ হয়ে উঠ্‌চি!—কিন্তু, কি কাজ মা অত কথায়, প্রমোদের সঙ্গে যুঁইর বিয়ে কোন মতেই হতে পারে না।'

বাবা বলিলেন—'কিন্তু তাহলে উপায়ও ত কিছু দেখ্‌চি নে! শুন্‌লাম যুঁই মত দিয়েচে, এ সব কথা জেনেও কি ও মত দিল?'

'যুঁই এর কিছুই জান্‌তো না বাবা, স্বেচ্ছায় ত ও মত দেয় নি, জোর করেই এক রকম ওর কাছ থেকে প্রমোদ মত নিয়েছে।'

মা বলিলেন—'জোর করে কি আর বিয়ের মত নেওয়া সম্ভব? কিন্তু এও তো হতে পারে, যে প্রমোদ এখন একেবারে শুধরে গেছে, একটা মানুষ চিরকাল কিছু খারাপ থাকতে পারে না। ভাল করে একবার খোঁজ নিয়ে দেখতে দোষ কি?'

'কিন্তু যুঁইর মত নেই, তবু তুমি জোর করেই বিয়ে দেবে? এ রকম স্বামীকে ত কেউ শ্রদ্ধা করতে পারে না, মা।—দেখ মা, এ দিকটা যখন আমাদের গেলই,—আর নিন্দেও সত্যি আমারই দোষে অনেকখানিই রটে গেছে, তা এক কাজ কর না, নরেন ত কিছু খারাপ ছেলে নয় মা, নরেনের সঙ্গেই যুঁইর বিয়ে দাও না!'

মা নীরস কঠিন স্বরে বলিয়া উঠিলেন—'চুপ কর্‌, চুপ কর্‌, যতীন, যা কোন মতেই সম্ভব নয়, কেন মিছে তা মুখে আনা! যা তুই পড়্‌গে যা, যুঁইর আমি বিয়েই দেবো না,—যুঁই আমার এম্‌নি ঘরে বড় হবে।'

পর্দা সরাইয়া মা পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। দাদা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মিনিট পাঁচেক কাটিয়া গেলে বাবা ধীরে ধীরে বলিলেন,

'সে হয় না যতীন, প্রথমতঃ ব্রাহ্ম মেয়ে নরেন বিয়ে করবে না, দ্বিতীয়তঃ তার বাপকে আমি ত অনেক কালই চিনি,—ওঁর ঘরে যুঁইকে কিছুতেই দেওয়া সম্ভব হতে পারে না,—তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্ব বলতে কিছু আর নেই। মাসের মধ্যে ক'টা কেস যে তার নামে উঠে, এ কথা কলকাতায় না জানে কে!'

'সে যদি ব্রাহ্ম হয়ে, তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হ'য়ে যায়?'

বাবা অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—'ব্রাহ্ম হবে! নরেন! কিছু বলেছে না কি?'

'এ নিন্দের হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে সে সবই করতে পারে বাবা, তার বড় মন, আমাদের বিপদে ফেলে সে পালাবে না। আর বাবা, সে ত তার বাবার স্বভাবের কিছুই পায় নি; তার মত ছেলে—এ আমাদের ভাগ্যি বাবা! আর এ ছাড়া অন্য উপায়ও নেই।'

'যুঁই রাজী হবে?'

দাদা মৃদুকণ্ঠে বলিল—'যুঁইর যা ইচ্ছে তা যদি আমি না বুঝতুম, তা হলে আমি অত জোর করতুম না বাবা।'

পর্দ্দার ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু দেখা যাইতেছিল—চকিতে একবার বাবার মুখপানে তাকাইয়া দেখিলাম, ভাবনার কালো রেখা তাঁহার শুভ্র ললাটখানি কুঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছে। আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিয়া আসিলাম, বুক আমার কাঁপিতেছিল। দাদা এ কি বলিল! আমি নিজে যা কখনো ভাবিতে চেষ্টা মাত্র করি নাই—তাহাতেই দাদা আমার সম্মতি জানাইয়া আসিল! —ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

ঘণ্টাখানেক পরে দাদা যখন উপরে আসিয়া আমার পাশে বসিয়া বলিল—"যুঁই, অমনি করে,—আমায় ভাবনায় ফেলে রাখিস নি দিদি,

সত্যি করে, মুখ ফুটে একটীবার বল্ দেখি বোন্, নরেনকে পেলে তুই অসুখী হবি না ত? তোর মুখের কথা, না শুনে, কোন্ সাহসে আমি এমনি করে সব্বার বিরুদ্ধে লাগতে পারি দিদি?'

আমার বুকের সে উচ্ছ্বসিত বেদনা আমি কিছুতেই আর তখন চাপিতে পারিলাম না,—যে কান্না বহুকষ্টে এতক্ষণ রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলাম, কথা বলিবার চেষ্টা করা মাত্রই তাহা আপনি চক্ষু ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিল। আপনাকে যথাসাধ্য সম্বরণ করিয়া বলিলাম,—'কাজ কি ভাই দাদা, মিছে এত চেষ্টা করে? যেখানে বাবা মার এত অমত, সেখানে কি আমি সুখী হব ভাই? তুমি শুদ্ধ কেন আমার সঙ্গে ভুগতে এলে?—'

দাদা মৃদুকণ্ঠে কহিল,—'ছিঃ কাঁদিস্ নে বুঁই, আমার উপর তুই নির্ভর করে থাক্—তোকে সুখী আমি করবো—এ আমার প্রতিজ্ঞা।'

ভোরের দিকে ঘুম অথবা স্বপ্ন জড়ান তন্দ্রাখানি হইতে যখন জাগিয়া উঠিলাম, তখন একটা কেমনতর কিসের আবেগে মনখানি আমার পূর্ণ হইয়া উঠিল—যে একটা অনিশ্চিত ভাবনা এবং অকথিত কামনা এত দিন আমাকে সভয়ে সর্ব্বদা দূরে পরিহার করিয়াই চলিত, আজ সকালে প্রভাতের সূর্য্য এ কি পরিপূর্ণ নিশ্চয়তায় তাহাদের অঙ্গে অঙ্গে সোণা মাখাইয়া দিল! ফাল্গুনের উতল হাওয়ায় আমার এই সদ্যজাগ্রত মনখানি ফুলের রেণুর মতই এ কি পুলক শিহরণে অবিরাম কেবলই দোল খাইতে লাগিল। আমি আমার এ কল্পনার জগতে মন খানিকে ছাড়িয়া দিয়া অবশ হইয়া পড়িয়া রহিলাম, ভয় হইতেছিল, বাস্তব জগতের সাড়া পাইয়া, কখন কে জানে আমার মনের এ গোপন অভিসার বাধা পাইয়া, ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিবে!

ফাল্গুন সকালের এই ঝিরি ঝিরি ঝিরি ঝিরি হাওয়া খানিতে অবরুদ্ধ

মনখানি আমার, তাহার শতেক দুয়ার খুলিয়া বিশ্বখানিকে বুকে আঁকড়িয়া ধরিল। ওগো, বুকে আমার আজ এ কি লোলুপ লালসা!—আজ যে সে একান্ত ভাবে আপনাকে বিলাইয়া রিক্ত হইতে চায়, রিক্ততার ভিতর পূর্ণতার যে ছায়া খানি অস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারই জন্য আজ মনে এ কি দুর্ব্বার কামনা!—

সকাল হইল। কল্পনার গোপন বিলাসক্ষেত্রে বাস্তব প্রবেশ করিয়া কি নির্ম্মম হস্তেই যে তাহাকে নষ্ট করিয়া দেয়, মর্ম্মে মর্ম্মেই আজ তাহা আমি অনুভব করিলাম।

নীচে নামিতেই বুকের মধ্যে কিসের ধাক্কা খাইয়া চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম,—হায় রে কোথায় আমার সেই উষার স্নিগ্ধ রবিকরোজ্জ্বল নিরালা ক্ষুদ্র গৃহখানি, আর কোথায় আমার এই অসন্তোষে বিরাগে ভরা সংসারের কার্য্যক্ষেত্র! প্রতি কাজে, প্রতি পদক্ষেপে শুধু আমার প্রতি নহে, বাড়ীর ঝি চাকরদের প্রতি পর্য্যন্ত মায়ের আমার এমনি তীব্র অসন্তোষ অনুভব করিতে লাগিলাম যে, আমার কল্পনার মোহখানি কাটিয়া গিয়া কঠিন সত্যটা চোখের উপর আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল।

সত্য যখন চোখের উপর আপনি আসিয়া ফুটিয়া উঠিল, তখন ভাবিবার অনেক কথাই পাইলাম। কাল শেষ রাত্রে যে একটা মায়াকুঞ্জ রচনা করিয়া ভাবিতেছিলাম, 'আর আমার কিছুরই দরকার নাই,—' আজ সুস্পষ্ট দিবালোকে অন্তরে সঞ্চিত আমার সে বিষাক্ত ভাবনা রাশি হইতে একটা দুর্গন্ধ বাষ্প বাহির হইয়া আমার সমস্ত অন্তর মন পচাইয়া তুলিল, এবং অবসাদের যে একটা দুর্ব্বলতা আমার দেহ মন অধিকার করিয়া বসিল, তাহাতে প্রতিকাজে কেবলই অন্যমনস্কতা এবং বিশৃঙ্খলা দেখাইয়া মায়ের চোখে অপরাধ আমার কেবল ভারী করিয়াই তুলিলাম।

সন্ধ্যার পর একান্তে নিভৃতে আমারই ঘর খানিতে সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া দাদাকে বলিলাম 'তোমার কথা তুমি ফিরিয়ে নাও দাদা, যা হবার নয়, কিছুতেই তা হবে না, আমায় তোমরা সবাই মিলে এমনি করে মেরে ফেলো না ভাই !'

দাদা চমকিয়া বলিয়া উঠিল—'ও কি কথা যূঁই ! কিসের কথা ফিরিয়ে নিতে বল্‌ছিস্ ?'

রুদ্ধপ্রায় অশ্রু অতিকষ্টে বুকে চাপিয়া বলিলাম, 'তুমিই ত যত গোল বাঁধালে দাদা, নইলে বেশ ত চলছিল, বেশ ত হোত, সংসারের কাউকেই এতটুকু অসুখী হ'তে হোত না, মা খুসী হোতেন, বাবা খুসী হোতেন, আর—আজ—না, ভাই দাদা—'

'সবাই ত হোত, কিন্তু তুই হতিস্ কি ? বল ?'

আমি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম—'হাঁ, কি যে বল, আমার আবার সুখ ! এতেই কি আমায় সুখী কর্ত্তে পারবে দাদা ?'

দাদা শঙ্কিত হইয়া বলিল, 'কেন ও কথা বল্‌ছিস্ যূঁই ?'

'দেখ দাদা, এমনি করে মাকে কাঁদিয়ে, বাবাকে এত দুঃখ দিয়ে তুমি যাঁর কাছে আমায় দিতে চলেছ, আমাদের এত বিপদ দেখেই শুধু তিনি তাঁর কর্ত্তব্য ভেবে আমাদের দয়া করতে চাইছেন—এ ছাড়া আমাদের উপর, তোমার বন্ধুত্বের দাবী ছাড়া তাঁর আর কি আছে দাদা ? কিন্তু এতেই কি আমরা সুখী হব ?'

দাদা হাসিয়া বলিল—'ওঃ—এ-ই ? আমি ভাব্‌চি আরো বুঝি কত কি ! এর জন্যে এত ভাবনা দিদি ? কিন্তু এটা কি কিছুতে বুঝ্‌লি না যূঁই, যে আমি কি এতখানি বোকা যে, সব কথা ভাল করে না ভেবেই এত বড় একটা কাজ করে ফেল্‌বো ?'

একটুখানি মৃদু হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিল—'সত্যি কথাটাও তবে

আমারই কাছ থেকে শুন্‌তে চাস্‌ দিদি? বল্‌বো? কেন নরেন এমনি করে ঘুরে ঘুরে বারবারই কেবল আমাদের এখানে আস্‌তো? সে কি খালি আমারই জন্যে না কি রে—দিদি, সমাজে এ কেলেঙ্কারীর কথা উঠে, মাঝখানে তার যে কতখানি লাভই হয়েচে সে খবর আমি ত সবই জানি তাই!'

'কিন্তু দাদা, মার এ রাগ ত ভাই কক্ষণো যাবে না। জীবন কি এত বড় একটা অভিশাপ নিয়ে—তার চেয়ে—দাদা, থাক্‌ গে এ সব—'

'পাগল, মার রাগ! সে আর কদ্দিন থাকবে? তবে কিনা প্রমোদের কথায় হঠাৎ মা বড় আঘাতটাই পেয়েছেন,—কিন্তু আমায় তুই চিনিস না বোন, আমি কি সব দিক পরিষ্কার না করেই এত বড় কাজটায় হাত দেব?—তবে ওঁদের ওদিক নিয়েই একটু ভাবনা হয়েচে।'

দাদা চলিয়া গেল,—আমি চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিলাম, বুকের ভিতর একটা বড় গভীর বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। এ ব্যথা সুখের কি দুঃখের—কি বলিব! কখন চোখ দিয়া আপনা হইতেই জল পড়িতে লাগিল। মনে পড়িল—আজ ক'দিন মা আমার সঙ্গে একটী কথাও বলেন নাই। আমার উপর ভগবানের একি দারুণ অভিশাপ!

পর দিনও মা আমার সঙ্গে কথা কহিলেন না। সারাটা দিন আমি নিজের ঘরেই বসিয়া ছুটির 'টাস্ক' গুলি করিলাম। সন্ধ্যার পর বাবা আমাকে ছাতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেখানে বাবার সঙ্গে আমার অনেক কথা হইল—আমার পড়া, স্কুল, বোর্ডিং, তারপর মেয়েদের কথা, সমাজের কথা নিয়া কত কথাই বাবার সঙ্গে আমার হইল। মাঝে মাঝে চুপ করিয়া বাবা কি যেন ভাবিতেছিলেন, তাঁহার চোখে মুখে গভীর চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল। আমার মনে হইতেছিল, বাবা বোধ করি আমাকে কি কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু সঙ্কোচে পারিতেছেন

না। আমার লজ্জা বোধ হইলেও বাবাকে সমস্ত কথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া নিজেকে হালকা করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু নিজে হইতে কি করিয়া বলি !

গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল। আমাদের এই রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া এবং লোক চলাচলের শব্দ ক্রমশঃই বিরল হইয়া আসিতেছিল ; চারিধারের গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে প্রকাণ্ড ছাতটায় আমি আর বাবা দুজনে শুধু বসিয়া রহিলাম। এক দল মেয়ে মানুষ আপনাদের ভীত প্রাণে জাগরণের সাড়া তুলিতে চেষ্টা করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে 'বল হরি হরিবোল' হাঁকিয়া দ্রুতপদে রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল,—অভাগিনীদের এই অমানুষিক চীৎকারে আমি আতঙ্কে শিহরিয়া বাবার হাত চাপিয়া ধরিলাম। বাবা আমাকে দুই হাতে বুকের কাছে টানিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া চলিলেন। তাঁহার গভীর স্নেহধারায় আজ আমার বহুদিনের তৃষিত হৃদয় তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতে চাহিল, আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, কাঁদিয়া বলি—'বাবা, তোমার মত এমন দৃঢ় আশ্রয় থাকিতে আর কোথায় আমি আশ্রয় খুঁজিতে যাইতেছি ? তোমার এই বুকে চিরকাল কি আমাকে স্থান দিতে পার না ? বাহিরের তুচ্ছ নিন্দা এখানেও কি আসিয়া আমাকে আঘাত করিবে ?'

নীচে বাবার ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। জলে আমার চোখ ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাই সে আলো আমি নিবাইয়া দিলাম। তাহার পর সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে বাবার পদপ্রান্তে বসিয়া, চোখের জলে ভাসিয়া কাঁদিয়া সকল কথাই আজ আমি তাঁহাকে বলিয়া ফেলিলাম, বাবা শুধু চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলেন।

৯

বাদলার পুঞ্জীভূত বেদনায় মলিন চৈত্রের একি এ সন্ধ্যাখানি! বাহিরের পানে চাহিয়া চাহিয়া আমার অনির্দ্দিষ্ট অপরিস্ফুট ভবিষ্যৎখানি ঐ আঁধারেই রূপান্তরিত হইয়া চারিদিক দিয়া আমায় বেষ্টন করিয়া ধরিল। আমি স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলাম, মনের ভিতর ভাবনার ত বিরাম নাই, চারিদিক দিয়া এই যে বরফেরই মত জমাট রাশীকৃত ভাবনারাশি বুকটাকে আমার ক্ষণে ক্ষণে তুহিন-শীতল করিয়া তুলিতেছিল—হায় ভগবান, এ জন্মে কি আর এর মীমাংসা হইবে না?

এ আমার ভাবনারাশির উপর দিয়া কখন কে জানে সন্ধ্যার সে ম্লান বর্ণখানি ঢাকিয়া ধীরে ধীরে রাত্রির কালো আবরণ খানি নামিয়া পড়িল। বাগানের মধ্যে আমাদের মালির টিনের ছাদটীর উপর অকাল বর্ষার তখন বড় মিঠে রিম্ ঝিম্ মৃদু স্বর বাজিয়া উঠিয়াছে, খোলা জানালার ভিতর দিয়া জলের যে একটুখানি পরশ আসিয়া বার বার আমার সর্ব্বাঙ্গে চেতনার সঞ্চার করিয়া দিতেছিল, তাহাতেই আমার সে জমাট বাঁধা ভাবনারাশি গলিয়া গলিয়া অশ্রুধারারূপে আমার বক্ষ শীতল করিয়া বহিয়া চলিল।

সে দিন মা স্পষ্ট করিয়া দাদাকে জানাইয়া দিয়াছেন—'তোরা যা খুসী কর না যতীন, আমায় কেন মিছে টানিস, আমি আর এখন কোন কিছুতে থাকতে চাই নে, পারিনেও আর, শরীর মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বয়স ত আর কম হয় নি।'

দাদা বলিল—'হ্যাঁ, তাও কি হয় মা, তুমি যোগ না দিলে, তুমি হুকুম

না দিলে, আমাদের না কি আবার কিছু করা চলে ? কাজের সময়টিতে তোমায় না পেলে কি চলে মা ?'

মা বলিলেন—'কি পাগলের মত বক্‌ছিস, তোরা কি করেছিস্, কার সঙ্গে বা কি ঠিক করলি, আমি তার কিছুই জানিনে, আজ আমার আবার মতামত কি ? তোদের ভাল হলেই আমার ভাল, তাই তোরা কর।'

দাদা বলিল—'এই ত তুমি রাগ করে আছ মা, তবে থাক্‌গে যূঁইর বিয়ে, বেশ ত ছিলাম মা আমরা, কেবল ওর এই বিয়েটা নিয়েই এখন আমাদের মধ্যে যত সব মনান্তর মতান্তরের সৃষ্টি, তার চেয়ে বিয়ে না হলেই ও থাকবে ভাল, তোমার আশীর্ব্বাদের বদলে তোমার রাগ নিয়ে ত ও সুখী হবে না মা।'

মা বলিলেন—'আমি ত রাগ করিনি যতীন, তবে ভালমন্দ তুই যতটা বাইরে থেকে খুঁজে খুঁজে বা'র করতে পারবি, ঘরে বসে কি আমি তা পারি ? প্রমোদের কথা কি আমি কোন দিন কিছু বুঝ্‌তে পেরেছিলুম, না জান্‌তুম্ ? নরেনের কথাই বা আমি কি জানি !—তা'ই বলে বাড়ী ছেড়ে ত আর আমি চলে যাচ্ছি না, সব শুনতেও পাচ্ছি, বিয়ে হলেও, আর আপত্তির আমার কি বা আছে।—আমি মা, তোরা সুখী হোস্ সেই কি আমার ইচ্ছে নয় ?'

'তাই যদি ইচ্ছে, তা হলে তুমি এমন নির্ব্বিকার হয়ে থেকো না মা, একটু ওঠ, চলাফেরা কর, আয়োজন উদ্যোগ কর,—আমাদের হুকুম দাও, তা নইলে ত কাজ-কর্ম্ম কিছুতে হবে না মা। যূঁই তোমার একটি মাত্র মেয়ে, তার বিয়েতেই তোমার এ কি ভাব মা ? তা হলে তুমি কি এখনও প্রমোদের সঙ্গেই দিতে চাও ? তা বেশ, তা'ই কর, আমি তারই উদ্যোগ করি।'

মা রাগ করিয়া বলিলেন—'কি বাজে বক্‌ছিস্ যতীন, এর মধ্যে

আবার প্রমোদের কথা আনা কেন? এ কি একটা বিদ্রূপের জিনিস, যে তাই নিয়ে খুব রহস্য করা আর হাসা চলে?......নরেন ব্রাহ্ম হবে?'

'ব্রাহ্ম? তা যদি না'ই হয় মা, তাতেই ক্ষতি কি? আজকাল ও রকম বিয়ে ঢের হচ্ছে, সেদিন শরৎবাবুর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, বিয়ে পদ্ধতি অনুসারে সবই ঠিক হ'ল, কিন্তু ছেলে ত দীক্ষিত হয় নি।'

মা তীব্র রোষ দমন করিতে কিছুমাত্র প্রয়াস না পাইয়া বিরস তিক্ত-কণ্ঠে কহিলেন, "তুই যা যতীন, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করিস্ নে, শরৎবাবুর মেয়ের হয়েচে বলেই, আমার মেয়ের হোতে পারে না, তাতে সারা জীবনভরে আর সুপাত্র পাওয়া যাক্ বা না-ই যাক্,—হিন্দু ছেলের সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেবো না।"

মা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন। দাদা ভয় পাইবার কিংবা নিরাশ হইবার ছেলে নয়, সে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া আমাকে আসিয়া বলিল, "মার রাগ!—ও এক্ষুণি চলে যাবে—ভয় পাবার কি? তবে মার অনিচ্ছায় অতটা আর এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়, নরেনকে দীক্ষিত হতেই হবে।'

সমস্যা ক্রমে কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে লাগিল। হিন্দুর সঙ্গে বিবাহ! অসম্ভব!! ধর্ম্মের প্রতি খুব যে একটা আকর্ষণের জন্য 'অসম্ভব' তাহা নহে, কিন্তু, এই যে একটা সংস্কারের ভিতর দিয়া আজন্ম কাল বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলাম, সে সংস্কার ছাড়িয়া চলা—এ কি ভাবাও যায়! তিনি দীক্ষিত হইবেন কি না সে কথা কখনও ভাবি নাই। আশ্চর্য্য এমনি, কি বিভোর হইয়াছিলাম, যে, এত বড় একটা প্রশ্ন মনেও উঠে নাই; কিন্তু, আমার সংস্কার ত আমি ছাড়িতে পারিব না, তাঁহার সংস্কারই বা তিনি কেমন করিয়া ছাড়িবেন? তবে পুরুষের পক্ষে এটা সহজেই সম্ভব। এই জীবনটার ভিতরে, এই চোখ দুটির সম্মুখে

ক'জন যুবককেই দেখিলাম, কেবলমাত্র বিবাহের জন্য যাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়াছেন, ধর্ম্মের আকর্ষণ তাঁহাদের ক'জনকে টানিয়া আনিয়াছে ?

ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথাই খুব বেশী জানি না, বুঝিও না, কিন্তু, কেবলমাত্র বিবাহের জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ! ভাবিতে বুকে যেন একটা আঘাত পাইতাম,—আর আজ—আজ কি আমারই ভাগ্যে ঠিক এই অবস্থাই হইবে ?

পর দিন সকালে বাবা দাদাকে ডাকিয়া বলিলেন,—'যতীন, নরেনের এই ব্রাহ্ম বিয়েতে, তার বাবা মা কি মত দেবেন বলে মনে হয় ?'

দাদা—খুব সম্ভব না, নরেন তাঁদের জানাতেও চায় না।

'তাঁদের না জানিয়ে কি করে হবে ? লুকিয়ে কখন এত বড় কাজটা করা চলে ?'

'উপায় না থাকলে তাই করতে হবে বাবা, তাঁরা ত মত দেবেনই না, মিছে কেন গোলমাল করা ?'

'নরেন যে এতখানি সাহস করেচে, নিজের মন সে ভাল করে ভেবে দেখেচে ত ? এ কিছু ছেলে খেলা নয় যতীন, এও ত হোতে পারে, যে, সে শুধু তোর কাছে লজ্জা পাবার ভয়ে, কিংবা—আমাদের একটু ভাল লেগেছে বলেই সম্পর্কের জোরে সেটাকে সে শক্ত করে নিতে চায়—কিন্তু এসব কাজে ভবিষ্যৎটাই সকলের আগে দেখ্‌তে হয় ! নরেনকে আরো ভাবতে সময় দাও।'

সে দিন রাত্রিতে দাদাকে আমি ডাকিয়া বলিলাম 'দাদা, এ কি সর্ব্বনেশে কাজ করতে যাচ্ছ ! যাঁরা বুকের রক্ত দিয়ে ছেলে মানুষ করে তুলেছেন, ছেলের জীবনের এত বড় একটা পরিবর্ত্তনে তাঁরা তার কিছু জান্‌বেন না ? এও সম্ভব ? দাদা, তোমাদের অতবড় পাপ করতে আমি দেবো না, আমার জন্য যদি এত—তবে কাজ নেই আমার এ

বিয়েয়, বিয়ে না হলে দাদা, আমি মরে যাবো না ভাই, তবু এত বড় অন্যায় ঘটতে দেবো না।'

দাদা বলিল—'কি আশ্চর্য্য, শোনানো কি তাঁদের হবে না? হবে, কিন্তু, পরে, আগে হলে হয়ত একটা গোলমাল ছাড়া আর কিছু হবে না, কিন্তু গোলমাল হলে ক্ষতি ত আমাদেরই দিদি, ওঁদের আর কি? ওরা যদি ছেলে আট্‌কে রেখে দেন?'

'দেন, দেবেন, তবু দাদা তাঁদের দীর্ঘশ্বাস আর রাগ কুড়িয়ে নিয়ে সারা জীবনটা আমার অভিশপ্ত করে দিও না ভাই!'

* * * *

তার-পর দীর্ঘ দুইটা দিন কি করিয়া আমার কাটিয়াছে,—আমিই তা জানি। এক একটা দিন যেন এক একটা প্রকাণ্ড যুগের আকার ধরিয়া আমার সারাটি মনকে তাহার সহস্র ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে কেবলই যেন নিষ্পিষ্ট করিতে চাহিয়াছে। সে যে কি ভয়ানক,—উঃ—! ভোরে জাগিয়া আকাশের নতুন সূর্য্যের পানে চাহিয়াছি, মানুষের চলা ফেরা কাজ কর্ম্ম দেখিয়াছি, নতুন সুর, অনেক কিছুর নূতনত্বের আভাস চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে নিজের প্রাণের সাড়া পাই নাই। দিনের প্রখর সুস্পষ্ট আলো চোখে সহ্য হইত না, কেবল ভাবিয়াছি, কতক্ষণে সন্ধ্যা আসিবে। আবার সেই সন্ধ্যা আসিয়াছে, চোখের উপর রাত্রির আঁধার নামিয়া আসিয়াছে, বিনিদ্র চোখে তাহাও চাহিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কেমন একটা আতঙ্ক আসিয়া শুধু প্রাণটাকে চাপিয়া ধরিয়াছে,—নিজের প্রাণে আঁধার, তাই জগতের আঁধার সহ্য হয় নাই। এ কি আমার জ্বালা,—হায় ভগবান!

ঘটনাচক্রে পড়িয়া এমন জায়গায়ই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি যে, কোনো দিকে চাহিয়াই আর আশার আলো দেখিতে পাই না,—এ আঁধার কত দিনে কাটিবে, কে জানে!—তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ক'দিনেরই বা!—খুব বেশী কথাও ত তাঁর সঙ্গে আমার হয় নাই,—আজ তবুও সকলকে ছাড়িয়া শুধু তাঁহাকেই আমার একমাত্র অবলম্বন করিয়া সংসারের পথে ঢুকিতে হইবে। কিন্তু দাদা যখন আসিয়া ম্লান মুখে বলিল, 'দিদি, ভাই, ওঁর কিছুতেই মত দিলেন না, বরঞ্চ কি বলে ভয় দেখালেন জানিস্? নরেনকে ওঁরা ত্যাজ্য পুত্র করবেন। অনেক অনুরোধ, অনেক অনুনয় বিনয়েও যখন তাঁরা কিছুতেই মত দিলেনই না, নরেন তখন কি বল্লে জানিস্? বল্লে—মত নেবার জন্য এত কর্লাম, তবু মত দিলেন না, এইটুকু অপরাধের জন্য ত্যাজ্যপুত্র করবেন, এত বড় শাস্তি? বেশ, আমায় না হোলেও যদি আপনাদের চলে, আমি তবে এবারে ব্রাহ্ম ধর্ম্মেই দীক্ষিত হয়ে যাব।—মাকে সুখবরটা দিয়ে এসেছি ভাই, বাবাকেও বলেচি—এবারে আমাদের দিকে সমস্ত গোলমাল কেটে যাবে।'

দাদা স্ফূর্ত্তি করিতে করিতেই চলিয়া গেল,—কিন্তু আমার মনটা ত একটুও পরিষ্কার হইল না, কেবল মনে হইতে লাগিল তুচ্ছ এই আমার প্রতি কতখানি আকর্ষণ তাঁর জানি না,—কিন্তু পিতামাতার প্রতি কেবল যে একটা অভিমানের বশেই তিনি দীক্ষিত হইতে চাহিতেছেন, তাহা বুঝিতে আমার ত আর বাকী নাই। দাদা বলিয়াছিলেন—'ওঁদের সঙ্গে কথা বল্তে গিয়ে খুব খানিকক্ষণ তর্কই খালি হোল, কিছুতেই তাঁরা কিছু বুঝ্তে চান না, সবাই মিলে মাথা গরম করে হাজার রকম তর্কই খালি কর্লেন।

আমি কিছুই বলি নাই, কিন্তু কথাটা শুনিয়া আমার বুকট

জ্বলিতেছিল। নিজেদের বুকের রক্তে যাকে মানুষ করা হইয়াছে, সেই ছেলে যদি বিরুদ্ধাচরণ করে, মানুষের ত তাহা হইলে পাগল হইয়া যাইবার কথা। এ ত শুধু তর্ক!

আমার মন ঘৃণা বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। এত স্বার্থপরতা, এত হীনতা আমার দাদার ত কোন দিন ছিল না, আজ তবে এ ক্ষুদ্রতা কোথা হইতে আসিল! কিন্তু এ সব কাহার জন্য? হা ধিক্, এত কাণ্ড ঘটিবার আগে আমি মরিলাম না কেন?

কিন্তু এ পাপের ভাগী কি আমাকেই হইতে হইবে না? ভবিষ্যতে কপালে কি আছে কে জানে। দাদা আবার বলিল, "তাকে ভালবাসতে হবে সব্বার চেয়ে বেশী, পৃথিবীতে একমাত্র সে-ই তোর সবার চেয়ে আপনার হবে। হয় ত মিলন হতে অনেক দেরী হবে, প্রতিকূল ঘটনায় অনেক কষ্ট অনেক অপমান তোকে পেতে হবে, কিন্তু তবু তাকে ভোলা তোর কিছুতেই চলবে না যুঁই। সকল দিক ভেবে, একলা তোর পক্ষে যুদ্ধ করে যে রত্ন তোর জন্যে জয় করে এনেছি, তাকে কোন দিন যেন ভুল বুঝে অপমান করিস্ না বোন্।"

কিন্তু মনে মনে আমি অপমানের একটা জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলাম। এত সহজে, কেবলমাত্র একটা ভাবের উপরে ভাসিয়া যে মানুষ আপনার আজীবনের সংস্কার, পিতামাতার স্নেহ এমনি করিয়া ত্যাগ করিতে পারে, আজীবন তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া থাকিব কি করিয়া? যার চিত্তের এতটুকু দৃঢ়তা নাই, আমাকে সে আশ্রয় দিবে কোথায়?

কিন্তু, এমনি ভাবে ধর্ম্মে, সংস্কারে মিলিলেই কি আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন পরিষ্কার হইয়া যাইবে? শৈশবাবধি যে ভাবে, যে শিক্ষায় আমি মানুষ হইয়াছি, আমার রক্তে, মাংসে, অন্তরে তাহারই যে প্রভাব

প্রতিক্ষণে আমায় চালিত করিবে, তাঁহার আজন্মের শিক্ষার সঙ্গে তাহার মিলন কখনো হইবে কি? দিনে দিনে ছোটখাটো ঘটনার ভিতর দিয়া উহাই যদি আমাদের নিত্যকার জীবনে সত্য হইয়া উঠে, তবে যে বিরোধ আমাদের অনিচ্ছায় এবং অজ্ঞাতেও ধীরে ধীরে ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে, তাহাকে ঠেকাইবে—তখন—কে?—জানিনা—ভাবিতে আর পারি না—মাথাটা এত দুর্ব্বল কেন?

বহুদিন পরে 'বাস' হইতে নামিয়া যখন স্কুলের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলাম, তখন চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র কণ্ঠের যে বিস্ময় স্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল, তাহাতে খুব বেশী চমকিত হইলাম না—এতদিন পরে এমন ঘটনাটা যে ঘটিবে, আমার তাহা অজানিত ছিল না।

মেয়েরা আপনিই সকলে অগ্রসর হইয়া আমায় ঘিরিয়া ধরিল। মৃণাল বলিল 'কিগো রাণী, মনে যে তবু পড়লো?'

অণিমা বলিল, "সত্যি ভাই, ভেবেছিলুম, ও মনটিতে থাকবার অধিকার কি আর আমাদের আছে?"

মৃণাল বলিল—'সত্যি করে বল্ না ভাই যুথিকা, অনেক দিন মনটার খুব খাটুনীর পর, আজ বুঝি একটু বিশ্রাম নিতে এসেছিস্?'

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "সত্যি ভাই, মাঝে মাঝে একটু না বদলালে কি আর ভাল লাগে?"

প্রতিমা বলিল, "বল্‌না ভাই যুথিকা, তোর হিন্দু বরটি কেমন হোল?'

সকলে একসঙ্গে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'কি করে ভাই, এক জন অচেনা অজানা মানুষকে চট্ করে, এমনি করে একেবারে অত ভালবেসে ফেল্‌লি, যে, একেবারে মালা বদল পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে গেল?' সোফিদি বলিল—'তোদের যে ভাই সব বিদঘুটে কথা! ভালবাসতে আবার

জাত বিচার করে ভালবাসা চলে না কি? সাহেব মানুষ প্রমোদবাবুর সঙ্গে না হয়ে, নরেনবাবুর সঙ্গে—ভালই হয়েছে।'

অণিমা বলিল, 'কেন ভাই, সে আর খারাপ হোত কি? যূথিকা এবারে কেমন মেমটী সাজ ত, বেশ আমরা দেখতুম।'

সোফিদি বলিল—'সর্ব্বনাশ, কাজ নেই ভাই মেম হয়ে, মেম হওয়ার যা সুখ সে আমার মামাত' বোনদের দেখেই বুঝেচি।'

'—কি রকম ভাই, কি রকম শুনি?'—সবাই একসঙ্গে উৎসুক হইয়া সোফিদির দিকে তাকাইল।

সোফিদি মুখের এক অপূর্ব্ব ভঙ্গি করিয়া বলিল, 'সে ভাই কি আর বলবো,—তাদের কত কি, মেমী ধরণে তারা কথা কয়, মেমী ধরণে তারা হাসে, হাঁচে, খায়, ঘুমায়! শুধু তাই নয় ভাই, শোক প্রকাশও তাদের এই মেমী ধরণেই হয়ে থাকে,—বাবাঃ—আমি ভাই সে মেমদের পায় নমস্কার করে এসেচি। আমি পাড়াগেঁয়ে চাষাকে বিয়ে কোরব, তবু এই সিভিলিয়ান ব্যারিষ্টারদের নয়!—অণু ভাই, তাই বলে তুমি যেন রাগ করে বোসো না, তোমার সুকুমার বাবুকে বলছি না,—সবাই কি আর এক রকম হয়, আমার সেজোমামাও ত ব্যারিষ্টার, কিন্তু, তাঁর মত মানুষ আমি বেশী দেখিনি।'

মেয়েরা কেউ কেউ প্রতিবাদ করিল, কেউ কেউ হাসিল, আমি কিছুই বলিলাম না।

হায় রে,—এই আমাদের মিলন! এ যে কেমন মিলন, তা আমিই জানি। মেম সাজি অথবা ঝি-ই সাজি—সে ত পরের কথা—যোগ্য সহধর্ম্মিণী হইতে পারিব কি?—ভগবান, আমি শুধু তাই চাই, আর কিছু না।

১০

সন্ধ্যার রাগে আকাশখানি আজ লালে লাল—ছাতে উঠিয়া তাহারই পানে তাকাইয়া ছিলাম, সূর্য্যখানি এখনই অস্তে নামিয়া পড়িবে, এক ঝাঁক হাল্‌কা সাদা মেঘ তাহার উপর দিয়া ধীরে ধীরে ভাসিয়া গেল,—এক মনে তাহাই আজ দেখিতে লাগিলাম। এমন সুন্দর, এমন হাল্‌কা, পাতলা, মানুষের জীবনখানি হয় না কেন! মানুষের ভাবনারাশি কেন বর্ষার মেঘের মত ঘন জমাট এবং ভয়ানক কালো হইয়া উঠে?

সোফিদির কথাটা আজ বারে বারেই কেবল মনে পড়িতে লাগিল, 'ভালবাসা কি ভাই জাত বিচার করে হয়?' তাই যদি না হয়, আমরা কি তবে ধর্ম্মের শিক্ষার পার্থক্যটুকু কাটাইয়া পরস্পরের মনের নিকটে পৌঁছিতে পারিব না?

কোন দিন যাহা ভাবিতে সাহসও করি নাই, আজ তাহারই সূক্ষ্ম রেশমী জালে মনখানি আমার জড়াইয়া পড়িল। বাহিরের প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দৃষ্টিখানি আমার গোপন অন্তরে ঘুরাইয়া দিতেই অমানিশার গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া আমার চোখের সম্মুখে দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু রত্নকণিকার ন্যায় ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। আজ আমার বিপদের দিনে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব—সর্ব্বোপরি মা—আমার মা, আমায় ত্যাগ করিয়াছেন, সংসারের সমস্ত দুঃখ আজ পাহাড়ের ন্যায় ভীষণ হইয়া, আমার চতুর্দ্দিক আজ ঘেরিয়া ফেলিয়াছে,—আজ যদি তুমি, ওগো—আমার পর হইতে পর,—আমার দিকে তোমার স্নেহমাখা হাতখানি প্রসারিত করিয়া দাও, আমি কি অবহেলা করিয়া তাহাকে আজ ফিরাইয়া দিতে পারি?

পেছন হইতে দাদা আসিয়া ডাকিল, 'যুঁই',—আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম, দাদা ছাতের ছোট্ট ঘরখানির দরজাটা খুলিতে খুলিতে বলিল 'আয়, ঘরে আয় কথা আছে।' আবার কথা? এ কথার কি আজিও নিষ্পত্তি হইল না? কিন্তু আর যে আমি পারি না!

ঘরে ঢুকিতেই দাদা বলিল,—'চেয়ারটা টেনে একটু বস্—কথা আছে—সুখবর,'—তার পর দুষ্টুমির হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল—'বাবা বল্‌ছিলেন কি জানিস্ যুঁই, যে, আমাদের মীমাংসা যা হবার, তা ত হয়েই রইল, এখন শেষ মীমাংসা ওদের মধ্যে হওয়া দরকার, ওরা নিজেরা এখন, এই নিয়ে পরস্পরের কথা শুনুক, এবং বলুক—তাই, আজই আমি তার ব্যবস্থা করে এলাম, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই নরেন আসবে, অবিশ্যি আমাকেই গিয়ে ঘাড়ে ধরে তাকে টেনে আনতে হবে, কিন্তু, এলে পরে দিদি, এই আমার আজকের অনুরোধ বোন, ভাল করে তার সঙ্গে কথা বলিস্, আজ আর লজ্জা করিস্ নি বোন, যে ভাবে তোদের পরিচয় হয়ে আসছে তাতে কোন দিন এমনি করে তোদের দেখা হয় নি, দিদি। আজই তাই তোদের প্রথম পরিচয়ের দিন, আজকের দিনটা যেন লজ্জা করে নষ্ট করে দিস্ না ভাই।' ভয়ে, আতঙ্কে বুকটা আমার শিহরিয়া উঠিল—'সর্ব্বনাশ, না, না, দাদা আজ আমি কিছুতেই তাঁর সামনে বসতে পারব না, আরো ক'দিন যেতে দাও'—"কেন এমন করছিস্ যুঁই, ভয়টা কিসের,—সে কি বাঘ না ভালুক?" আমি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলাম, উঃ একি ভয়ানক কথা। এও কি সম্ভব!—না গো না, আমি কিছুতেই তাঁর সম্মুখে বসিতে পারিব না। দাদা অনুনয়ের স্বরে বলিল—'কেন দিদি এমন পাগলামো করিস্! তোদের এখন নিজেদের মধ্যে কথা হওয়া যে দরকার, সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধার কথা তোদের নিজেদের মধ্যে যেমন হবে আমাদের সঙ্গে তা

হবে না, তার পর বাবা আরও কি বলেছেন জানিস্? দু'চারদিন তোদের নিজেদের মধ্যে দেখা শুনা হবে, আলাপ হবে, তার পর সমস্ত সুখ দুঃখ স্পষ্ট করে দেখার পরও যদি এ বিয়েতেই দুজনের তোদের ইচ্ছে থাকে,—তার পর দীর্ঘ কয়েক মাসের ব্যবধানের পরও যদি নরেনের মন ঠিক এমনি থাকে তবেই বাবা এ বিয়েতে আর আপত্তি করবেন না।'

"বাবার কি অবিশ্বাস হচ্চে?"

'না দিদি, অবিশ্বাস ঠিক নয়, তবে নরেনের সামনে যে পরীক্ষাটা আসছে, সেটা ত বড় সহজ পরীক্ষা নয়, এমনি করে বাপ মা ভাই বোন,—আজন্মের ঘরখানি ছেড়ে আসা দিদি,—সে কি সহজ? তার পর ত্যাজ্যপুত্র হ'লে সম্পত্তির একটী পয়সাও ত আর ও পাবে না, চির দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়ে, সকলকে ছেড়ে তবে তাকে আমাদের কাছে আস্তে হবে,—আমি নরেনের মন জানি দিদি, এ সে পারবে, কিন্তু, বাবা তবু একেবারে নিঃসন্দেহ হতে চান।'

'কিন্তু এত বড় শক্ত কাজ, তুমি কি পারতে দাদা? আমিই কি পারতুম?—এমনি করে আমাদের ছেড়ে তুমি যেতে পার?' দাদা মনে মনে একটু বিব্রত হইয়াও হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'প্রশ্নের রকম ত্যাখ! তা কি আর পারি না, যদি তেমনি ভালবাসার মানুষটী পাই! দে না একটা যোগাড় করে!—পারিস্? তোদের স্কুলে তেমন মেয়ে টেয়ে নেই কেউ? তা হলে একবার দেখি চেষ্টা করে!'

দাদার বলিবার সে ভঙ্গী দেখিয়া,—অত বড় বেদনায়ও আমার হাসি পাইল, বলিলাম—'সে আছে দাদা, একটা কেন? একটা ছেড়ে যে ক'টা চাও দেবেখন যোগাড় করে—কিন্তু দাদা, এ কেমন করে হয় ভাই, আজন্মের এ ভালবাসা, আজন্মের এ বন্ধন ছেড়ে দু'দিনের

ভালবাসায় যে বাঁধা পড়ে যায়, তার সে ভালবাসা সত্যি কি ঠিক ভাই?'

'ছিঃ দিদি, এ যে কি করে তুই বলিস্?— বেশ ত, সে ভালবাসা ঠিক কি না, সে যাচাই তুই-ই করে নে না বোন,—ও-সব ভালবাসার কথা—' দাদা আর একটু হাসিয়া কথাটা শেষ করিল—'ও সব কথা আমরা কি বুঝি! তা হলে এবারে আমি উঠি যুঁই সে গাধাটাকে না নিয়ে আস্‌লে ত আর সে এমুখো হবে না! তুই এখানটাতেই বসে থাক্'—

"দাদা, তাই বুঝি মা আজ মাসীমার বাড়ী বেড়াতে গেছেন?"

'তাই দিদি, মার একটু সঙ্কোচ হ'ল দীক্ষার কথাটা শুনে মার রাগ যদিও আর নেই, তবু সে দিনের এত অপমানের পর, আজ কি আর তার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে পারেন? তার জলখাবারের ব্যবস্থা করে রেখে গেছেন, সে এলে তাকে না খাইয়ে বিদেয় দিতে বারণ করে গেছেন।

'দাদা',—

'কি ভাই?'—

'একটা কথা বোল্‌ব,—রাখ্‌বে?'

'কেন রাখ্‌ব না, দিদি, যদি তুই অন্যায় না বলিস,—'

'অন্যায় বোলব না, তুমিই আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো, তার পর অন্যায় কি না বিচার কোর—'

"আচ্ছা বল্।'

'তিনি এলে ভাই, আজ আর জলখাবার তাঁকে তুমি কিচ্ছুতে দিতে পাবে না,'—

'সে কি রে! কেন!'

'কেন? দাদা, মা যে দিন তাঁকে সহ্য করে, আদর করে নিজের হাতে জলখাবার দেবেন, সে দিন থেকে এ বাড়ীতে তাঁর খাওয়া সুরু হবে,—তার আগে নয়।—'

দাদা মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়া ভাবিল, তার পর বলিল 'আচ্ছা, তাই হবে —'

ক্লান্ত দেহে মনে উঠিয়া একবার আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইলাম, আকাশের সে লালটুকু আর নাই, পঞ্চমীর চাঁদ খানি একটা সাদা মেঘের ওড়নার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ ফুটিয়া উঠিতেছে, আনমনে তাহারই পানে তাকাইয়া রহিলাম।—মনটা দুর্ব্বল—বড় দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত অনেকের বিবাহের কথা শুনিয়াছি, অনেকের কোর্টসিপ দেখিয়াছি,—অনেকের অনেক কথা শুনিয়াছি—কিন্তু, এমন অপূর্ব্ব কোর্টসিপ কি আর কখনও হইয়াছে? হায় ভগবান, প্রিয় হইতে যে প্রিয়তর, প্রিয়তম,—তাহার আসিবার কথা শুনিয়া, কার বুক কবে এমন করিয়া কাঁপিয়াছে? হায়, এ কি আমার সৃষ্টিছাড়া অদৃষ্ট! কিন্তু, এমন করিয়া,—একান্ত কেবল 'আমারই' মনে করিয়া, তাঁহার সম্মুখে ত কোন দিন আর কখনও বসি নাই, আজ কেমন করিয়া একাকী আমি তাঁহার কাছে বসিব?—কি'বা তিনি বলিবেন, কি উত্তরই বা তার আমি দিব?—তার চেয়ে এমন করিয়া দেখা না হওয়াই যে ছিল ভাল।—শুনিয়াছি, যাঁর কাছে বসিলে, কথা না-কি ফুরায় না, যাঁকে দেখিয়া দেখার সাধ আর মেটে না, তাঁকে দেখিবার ভয়েই আজ বুক আমার কেন এমন করিয়া কাঁপিতেছে? মনে মনে চোখ মুদিয়া, একবার তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করিতেই, তাঁহার যে চেহারাখানা বুকে আমার ফুটিয় উঠিল, তাহা তাঁহার সে দিনের সেই মূর্ত্তি—যে মূর্ত্তি অপমানের বি কালো হইয়া দ্বার হইতেই সরিয়া পড়িয়াছিল! চোখের জ

আমি আর রোধ করিতে কিছুতেই পারিলাম না, আজ আর আমি বাধাও দিলাম না,—এ কান্নায় আজ এত আরাম।

নীচে জুতার শব্দ শুনিলাম,—শক্ত করিয়া চোখ মুদিয়া রেলিংএর উপর ভর দিয়া পেছন ফিরিয়া দাঁড়াইলাম,——

— দাদা আসিয়া ডাকিল 'যূঁই'—

ছাতেই তিনটা চেয়ার আনিয়া দাদা নিজেই একটায় বসিয়া পড়িল, এবং মিনিট কয়েক আবোল তাবোল যা-তা বকিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল, তার পর হাসিয়া বলিল, 'ভাই নরেন, ঘণ্টা দেড়েকের জন্য বাহিরে একবার আমার বিশেষ দরকার, বাড়ীতে এখন পাহারা দেবার মত কেউ নেই, সুতরাং এই ঘণ্টা দেড়েকের জন্য, আমার ভগিনী কুমারী যূথিকা এবং আসবাব শুদ্ধ আমাদের এই বাড়ীখানি তোমার জিম্মায় রেখে নিশ্চিন্ত মনে আমি একবার বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছি।'—দাদা হাসিয়া চলিয়া গেল,—সিঁড়িতে তাহার পদশব্দ গুলি প্রত্যেকটী আমার বুকে যেন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আসিয়া, হাতুড়ীর ঘাএর মত বসিতে লাগিল। মনে হইল—এ কি কাণ্ড হইল! এ কি ভাল হইল? দাদা এ কি করিল আজ! আমার উৰ্দ্ধে নিম্নে, সম্মুখে, পশ্চাতে আঁধার ধরণীখানি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুলিতে লাগিল,—আমি নত নয়নে তেমনি করিয়া রেলিংএ ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

'বসুন না,—আপনি যে দাঁড়িয়েই রইলেন—'

গলার স্বর একটু বুঝি কাঁপিয়া উঠিয়াছিল,—চমকিয়া চাহিলাম,—মাগো মা,—এ কি চেহারা!—এমন শীর্ণ দেহ, এমন গম্ভীর মুখ,—অনুতাপে বেদনায় বুকখানি আমার ভরিয়া উঠিল।

নীরব নির্জ্জন ছাত,—আকাশে পঞ্চমীর সুন্দর চাঁদ, আর জ্যোৎস্নাগলা শুভ্র ছাতখানিতে আমরা শুধু দুজন, সংসারে যার বাড়া আপনার আর আমার কেহ হইবে না, আজ তাঁহার এত কাছে বসিয়া এ অস্বোয়াস্তি

কেন আমার ? ঘণ্টাখানেক ঠিক এমনি ভাবে কাটিয়া গেল,—তার পর এক তলায় দাদার সজোর পদক্ষেপের সঙ্গে তাহার উচ্চ কথার সুরই তাহার আগমন বার্ত্তা আমাদের জানাইয়া দিল,—নিঃশ্বাস ফেলিয়া আমি বাঁচিলাম। কিন্তু, তিনি সহসা তাঁহার চেয়ারখানি সরাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এবং বার দুই সমস্ত ছাতখানিতে গম্ভীর ভাবে বেড়াইয়া, কখন আসিয়া হঠাৎ আমার পাশে দাঁড়াইলেন, তার পর ধীর—অতি ধীর কণ্ঠে কহিলেন—'জানি না, যে হিসেবে নিজেকে আজ আমি এত সৌভাগ্যবান মনে কর্চ্ছি, ঠিক সেই হিসেবেই আপনার দুর্ভাগ্যের সূচনার জন্য, আমার আবেষ্টনের জাল আমি আপনার চার দিক দিয়ে ততখানিই জড়িয়ে দিচ্ছি কি না!—ভেবে দেখতে গেলে চোখের সম্মুখে কেবল আঁধার ছাড়া কিছুই ত আর দেখতে পাই নে, ভয় হয়, এ আঁধারে কোথায় নিয়ে আপনাকে আমি ফেল্‌বো!—যেখানে সহানুভূতির লেশমাত্র নেই,—যেখানে কেবল শাপ আর অভিশাপ, পারবেন কি সেখানে গিয়ে আমার দুর্ভাগ্যের বোঝা বইতে? এমনি করে কঠিন সংসারের রুদ্রতার মাঝে, পারবেন আপনি আমাকে সইতে?'—

কি বলিয়াছিলাম, বাস্তবিক কিছু বলিয়াছিলাম কি না জানি না, কিন্তু যখন সজ্ঞানে চক্ষু মেলিয়া তাকাইলাম, তখন কাণে আসিয়া পৌছিল ছাতের সিঁড়িতে দাদার পায়ের শব্দ,—এবং সিঁড়ির উপরে তাঁহার মৃদু স্বরের একটী মাত্র কথা—'এতক্ষণে আসা হোল?—খুব লোক যা হোক!—বাড়ীতে অতিথি ডেকে এনে,—খুব ভদ্রলোক ভাই তুমি!—'

'কেন, অতিথি সৎকারের ভার আমি ত যোগ্য লোকের উপরেই দিয়ে গিয়েছিলাম।'

"বেশ করেছিলে, চল, আমায় এখন বাড়ী পৌছে দিয়ে আসবে,—অনেকক্ষণ বসেছি।"
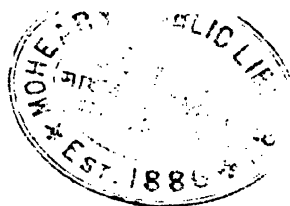
বাহিরে বর্ষার রিনিকি ঝিনিকি বড় মিঠে সুরখানি—এ সুরে কি যেন কেবল মনের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। তরল মনখানি আমার উতল, পাগল! কিন্তু, এ আমার হইল কি?—মদের ফেনা যেমন পাত্র উপচিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়, তেমনি এ কোন্ মদের রস আমার জীবনখানি মনখানি ভরিয়া ভরিয়া ছাপাইয়া পড়িতেছে, এ কোন্ ভাবনা রাশি আমার আর সকল ভাবনাকে তলায় ফেলিয়া, দিনে দিনে, পলে পলে আমায় মাতাল করিয়া তুলিল? ভাবনার এ মদির রসে, এ নেশা আমায় এ কি করিয়া দিল গো!—

চৈত্রের সেই রাতখানির পর, আরো মাস চার কেমন করিয়া ধীরে ধীরে কাটিয়া গেল। এই চারমাস বাবার আদেশে আর আমাদের দেখা হয় নাই। দেখা হয় নাই বটে, কিন্তু দেখারও অধিক, এমন আরো কিছু আমি পাইয়াছি, যে মনে হয়, দেখা হইলে কি এতটা আমি তাঁর কাছে পাইতাম?—সপ্তাহে একখানি, কখনো বা দু'খানি প্রাণের কথায় এমন করিয়া-ভরা, এমন মিষ্টি যে কয়েক ছত্র চিঠি তাঁর আমি পাইতাম,—তাহা আমার যে কি—ওগো, সে চিঠিগুলি আমার যে কি,—তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব! প্রত্যেকটী অক্ষর যে এক অশ্রুত অপূর্ব্ব, দূরাগত পথিকের বাঁশীর তানের ন্যায় আমার মর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিত, মুখ ফুটিয়া সে কথা কি আজ প্রকাশ করা যায়? আজ মনে হয়, ওগো আমার সুদুর্লভ দেবতা, সত্যি যদি তোমাকে কোন কালে নাও আমি পাই, তবু আর আমার ক্ষোভের কারণ কিছু নাই,—যা আমি পাইয়াছি, আমার সমস্ত জীবনের বিনিময়েও তাহাকে কি আর অন্য কোন মতে পাওয়া সম্ভব হইত?

দাদা আসিয়া বলিল, 'শুনেছিস যুঁই, রবিবারে নরেনের দীক্ষার দিন ঠিক হয়েছে, তার পর, সে দিনই তোদের বিয়ের নোটিস পড়বে।'

'মা জানেন?"

'জানেন, তোর কথাই যুঁই ঠিক হোল ভাই, মা ক'দিন থেকে তাকে দেখবার জন্যে মনে মনে কি ছট্‌ফটই করছেন, আমি তা বেশ বুঝতে পারছি, কিন্তু এই নিয়ে মার সঙ্গে নিজে থেকে আমি কোন কথাই বলতে যাই নি, মা-ই আমায় এখন ডেকে বল্লেন—সে দিন দীক্ষার পর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আজ থেকেই যোগাড় করে রাখ যতীন, নরেন ত সে দিন এখানেই খাবে, তা ছাড়া মন্দিরে যাঁরা আসবেন, তাঁদের সব্বাইকে সে দিনের নেমন্তন্ন করে পাঠাও।"

'ওঁদের ওখানে আর একবার চেষ্টা করেছিলে—দাদা?'

'করেছিলুম, বাবা নিজে গিয়েছিলেন, কিন্তু বাবাকে ওঁরা অপমান করে ফিরিয়ে দিলেন।'

আমি চুপ করিয়া শুধু শুনিয়াই গেলাম, বলিবার কিছু নাই,—অপরাধের সৃষ্টি যে গোড়া হইতে আমিই করিয়া তুলিয়াছিলাম, সে কথা আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না।

বেলা তখন প্রায় পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে, ধোপা বাড়ীর কাপড় গুলির নাম তোলা এখনও আমার শেষ হয় নাই, বাহির হইতে এক ভিজা ভিজা ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে আসিয়া স্থচের মত ফুটিতেছিল দাদা বলিল— 'ওখানে ঠাণ্ডায় বসে কেন! এ ধারে সরে এসে বোস; তার পর যদি জর টর কিছু করে বসিস্ তাহ'লেই হয়েছে আর কি! দিন তারিখ সব ঠিক হচ্ছে, এখন আর অসুখ করে বসো না বাপু।'

'কি হবে দাদা অসুখ করলে?'

'কি হবে? পাগল, বিয়ে যে বন্ধ হয়ে যাবে!—'

'আচ্ছা, বন্ধ হলেই বা এমন আর মন্দ কি !'

দাদা আমার মুখে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'মন্দ আর এমন কি ! তবে কি না, এত খাটবার আর তা'হলে আমাদের কি দরকার ছিল ? এত সব রাগারাগি, এমন কতগুলো ঝগড়াঝাটি—কিন্তু দুই, একটা কথা সত্যি করে তুই আমায় বল্‌না দিদি, আমার কেন এমন ভয় হচ্চে, আমার কেন মনে হচ্চে যে, তোর মনের সন্দেহ আজো দূর হয় নি ?'

'কেন তোমার ও রকম মনে হয় দাদা ? আমার ত মনে কিছু নেই ।'

'নেই ? বেশ—'

দাদা একটু চিন্তাকুল মনে জানালার কাছে সরিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল । নীচে, ফুট পাথে কতকগুলো ছেলে খেলা করিতে-ছিল, সহসা একবার উহাদেরই কে একজন বিজয়ীর আনন্দেই বোধ হয় যেমনি বেসুরে তেমনি বেতালে গাহিয়া উঠিল,—

'বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীর বাসী,
দেখিব বিরহ-বিধুর অধরে মিলন-মধুর-হাসি ।'

দাদা ও আমি এক সঙ্গেই দুই জনে হাসিয়া উঠিলাম । দাদা বলিল,—'হতভাগাটা কি আর গান পেলে না ?'

আমি বলিলাম—'ও কে ! গোপাল না ! ওরা যে কাল থিয়েটারে গেছলো ।'

'এই বাচ্চা ছেলেগুলোও ?'

'হ্যাঁ, ওরা সব্বাই ত গিয়েছিল ।'

দাদা বলিল—'এ সব বাপ মা গুলোর বুদ্ধি আর কোন কালে হবে না ।' আমি হাসিয়া বলিলাম—'কেন দাদা ?'

'কেন ? নিজেরা যাবি ত যা-না বাপু, আবার এই কচি কচি ছেলেমেয়ে গুলোকে কেন টেনে নেওয়া ? এরা কিছু বা বোঝে কিছু বা বোঝে না, এতে ভারী খারাপ ফল হয়। একবার কি হয়েছে জানিস, সে এক মজার গল্প। নরেনের সঙ্গে ত থিয়েটারে গেছি, সেই আমার প্রথম থিয়েটারে যাওয়া। প্লে হবে শুনলাম অভিমন্যু বধ, কতগুলো সিন ত বেশ হয়ে গেল, তার পর সপ্তরথি বেষ্টিত বালক অভিমন্যু এসে দাঁড়ালেন। কি হয়, কি হয়, ভেবে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি,—তার পর হঠাৎ সর্ব্বনাশ ! সে এক ভীষণ হৈ চৈ চীৎকার, সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার ! চেয়ার ছেড়ে ত লাফিয়ে উঠলাম,—'কি ?' 'কি ?' শুনলাম উপরেও আর এক অভিমন্যু বধ আরম্ভ হয়ে গেছে ! এ দিকে ষ্টেজের অভিনয় কিন্তু সব একদম বন্ধ !'

দাদার মুখের ভঙ্গী দেখিয়া আমি হাসিয়া আকুল হইয়া উঠিলাম। দাদা কিন্তু পরম গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিল—'তার পর শোন, ভাল করে কারণ জিজ্ঞাসা করে জানা গেল। এক জন মহিলা তাঁর একটী তিন মাসের শিশু, একটী দেড় বছরের এবং এই রকম আরো সাত আটটী ছেলে মেয়ে নিয়ে বেলা চারটের সময় থেকে ত গিয়ে বসে আছেন ! সঙ্গে আছে বাচ্চাদের দুধের বোতল, কাঁথা, জলের প্যান—ইত্যাদি।—এ দিকে ক্রমে ভিড়ও বাড়ছে, জায়গারও অনাটন আরম্ভ হয়েছে, ঠেলা ধাক্কাও একটু একটু হচ্চে। সেই মা'টীও ক্রমে ক্রমেই একটু একটু করে গরম হয়ে উঠছেন, তার পর হঠাৎ কখন ধাক্কার চোটে খোকার দুধের বোতল পড়ে গিয়ে—একেবারেই তাঁর বেনারসী সাড়ী খানির উপর ! দুধও গেল, শাড়ীও নষ্ট হোল, বোতলটীও গেল। কত আর সহ্য হয় ? মা ত রেগে চটে অস্থির ! আবার তার মধ্যে কে এক জন বলে উঠলেন, 'তুমি কি ভাই সংসারখানি শুদ্ধ

তুলে এনে রাখবার মত টিকিট করে এসেছো ?'—সর্ব্বনাশ ! আর যায় কোথা—ভীষণ চীৎকার, তার মধ্যে আবার তার দেড় বছরের ছেলেটা বুঝি হঠাৎ কার ধাক্কায় বেঞ্চির উপর থেকে—একেবারে বাচ্চাটার গায়ের উপর !—তার পরই লাগ্‌ল আর কি খুব !!'

'এরই নাম বুঝি দিয়েছ তুমি অভিমন্যু বধ ? বাবাঃ ! তুমি দাদা এতও বানাতে পার ?'—'বানাবো কেন রে, সত্যি যে !—আচ্ছা, তুই দেখিস্ গিয়ে এর পরে, মেয়েদের ওখানে কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে তাদের খাবার ধূম কি রকম পড়ে যায় ! তাঁদের রসগোল্লা সন্দেশ আনাবার গোলমালে, আর ঝিদের চ্যাঁচানোতে নীচেকার ভদ্রলোকদের যে কি রকম অসুবিধে······'

বলিয়া, দাদা হাসিয়া নীচে নামিয়া গেল। মনের ভিতর যে একটা কালো মেঘের একটু একটু করিয়া সঞ্চার হইয়া উঠিতেছিল, দাদার এই তরল হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়া কখন কি জানি সেটুকু উড়িয়া গেল।

সে দিন দীক্ষা হইয়া গেলে সন্ধ্যার পর যখন দাদার চেষ্টায় বাড়ীতে এত লোক থাকা সত্ত্বেও নিভৃতে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হইল, তখন তাঁর যে চেহারাখানি চোখে আমার পড়িয়াছিল, বোধ হয় কোন কালেই তাহা আর আমি ভুলিতে পারিব না। তাঁকে আমার ঘরে রাখিয়া দাদা চলিয়া যাইতেই কি ব্যাকুল ভাবে তিনি হাত দুটী আমার চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন—'যুথিকা, এই যে ভাবে আমাদের মিলন হোল, এমনি করে কি আর কখন কারো হয় ?'

আমি ভয় পাইলাম, শিহরিয়া উঠিলাম। এ কি কথা !—তার পর সহসা একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন, এবং একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, 'বিশ্বাস কর যুথিকা, আজ আমার এ কি হয়েছে ! এমনি করে যে আজ আমার অতীত জীবনটা নিজের

হাতে পুড়িয়ে দিয়ে আসলাম, বাকী জীবনটা আমার তার সাক্ষ্য হয়ে থাকবে ত? পারবে তুমি আমার জীবনটা ঠাণ্ডা করে দিতে?'

আমার কান্না আসিল, রুদ্ধশ্বাসে বলিলাম—'কেন আপনি এমনি করে বলছেন! আপনার কি আজ অনুতাপ হচ্চে? তা যদি হয়, আজ আমি এই মুহূর্ত্তে আপনাকে মুক্তি দিলুম, যান আপনি চুপি চুপি বেড়িয়ে পড়ুন, সবাই আজ উৎসবে মত্ত, কেউ আপনাকে লক্ষ্য করবে না। তার পর, আর কখনো এ বাড়ীতে আসবেন না, আমি নিজে সব দিক পরিষ্কার করে নেবো, সত্যি কারণ কেউ আর কিছু জান্‌বে না।'

তিনি করুণ চোখে চাহিয়া বলিলেন, 'বেরিয়ে পড়া সহজ নয় যুথিকা. মুক্তি যদি চাইতুম-ই, মুক্তি ত আমার হাতেই ছিল; ইচ্ছা করেই যে আমি এসে বন্ধনের মাঝে ঝাঁপ দিলুম।—যাক—সে কথা নয়, তুমি ভয় পেয়ো না যুঁই, কিন্তু সর্ব্বদা তুমি মনে রেখো, আমাদের এই মিলন বসন্তের মলয় হাওয়ার ভেতরে আসেনি, আমাদের এই মিলন এসেছে বর্ষা রাতের ঝড় ঝঞ্ঝার ভেতর দিয়ে।—যুথিকা, আমার মনটা যেন শিকল-কাটা-হরিণ! তোমার হাতে আজ আমি এটাকে ছেড়ে দিলুম,—এমন শক্ত করে আর কি কেউ তাকে বেঁধে রাখতে পারবে?—'

* * * *

সব—সব—হইয়া গেল, যার জন্য এত ভাবনা, এত দুঃখ এত ভয় ছিল, কাল সে সকলেরই নিষ্পত্তি হইয়া গেল।—

মাঝে এই দিন পনের কি করিয়া কাটিয়াছে, সে কথা আজকের এই সুখের দিনে আর ভাবিব না—আমার কেবল এই মনে করিয়া আনন্দে, দুঃখে চোখটা কেবলি জলে ভিজিয়া উঠিতেছে, যে, কালকের সুখের দিনটা আমার ব্যর্থ হইয়া যায় নাই। দাদা যখন কাল সকালে একটী

অচেনা অপরিচিত ভদ্রলোককে আমার কাছে পরিচয় করাইতে লইয়া আসিল, তখন তেমনই সুন্দর মুখশ্রী, তেমনই সুঠাম সুগঠিত দেহখানি আমার মনে একটা সন্দেহ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। দাদা বলিল, 'যূঁই—ইনি নরেনের ছোট ভাই, মেসে থাকেন। আজ আর তাঁকে আমাদের দলে টেনে না এনে কিছুতেই পারলুম না,—তোর সঙ্গে আলাপ কর্ত্তেও এসেছেন।—ভদ্রলোকটী মৃদু হাসিয়া, ছোট্ট একটী নমস্কার করিয়া আমার হাতে ছোট্ট একটী বাক্স তুলিয়া দিলেন।—তার পর, আবার দাদার সঙ্গেই নামিয়া গেলেন।—ঘরে তখন কেউ ছিল না, অসীম আগ্রহে আমি বাক্সখানি খুলিয়া ফেলিলাম। এ কি! এ যে একছড়া হার —এ কি সোণার হার!—আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা বিদ্যুৎ বহিয়া গেল!—তার পর—চক্ষু মুদিয়া একান্ত ভাবে, আজিকার আমার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অতিথিটীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানখানি মাথায় তুলিয়া ধরিলাম। ভাবিয়াছিলাম, একটা দিক বুঝি আমার অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইবে,—কিন্তু এই কি আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনার শ্বশুর গৃহের নির্ম্মল আশীর্ব্বাদ? এ কি আজ আমার ভগবানেরই দান!!—আমি চক্ষু মুদিয়া ভক্তিভরে আমার এই আশীর্ব্বাদ অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলাম।—

* * * *

সন্ধ্যার পর, আলোমালা-শোভিত সুন্দর সুসজ্জিত সভায়, বাবা তাঁর এই একমাত্র কন্যাটিকে আজ চিরদিনের জন্য সম্প্রদান করিয়া ফেলিলেন। মাসীমার মেয়ে টুলীদি ও রাধারাণী গান ধরিল—

"দুইটী হৃদয়ে একটী আসন,
পাতিয়া বসহে
হৃদয়নাথ।"

১২

যুথিকা, যুঁই!

কেন?

কেন?—ছিঃ যুঁই, অমনি করে—অত একেবারে মাথা নীচু করে কেন? এক মাস হয়ে গেল, তবু তোমার এত লজ্জা এতটুকু কম্‌লো না?—কেন তুমি এমন কর যুথিকা, আমার যে কষ্ট হয়।

কই! লজ্জা ত করি নে!

করনা? বেশ, তবে তোল ত মুখ, তাকাও ত আমার দিকে। কেন তুমি এমনি করে আমায় কষ্ট দাও যুথিকা? এক দিন গেছে, যে দিন প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তোমার পানে তাকাতে পারি নি, তাকাই নি, যে দিন তোমার একটি কথা শোনবার জন্য মন আমার ছটফট করে মর্‌ত,—কিন্তু ভয় হোত, তোমাদের বাড়ী ঢুক্‌তে একটা ভয় আমার কি রকম যে হোত যুঁই,—ওঃ, তার শাস্তিও কিন্তু আমার ঢের হয়েছিল।—সে দিনের কথা তোমারও ত কিছু অজানা নেই যুঁথিকা, মনে পড়ে ত?

মরমে আমি মরিয়া গেলাম। ছিঃ ছিঃ, আবার সে কথা কেন? তিনি মৃদু হাসিয়া আবার বলিলেন, কিন্তু, শুধু ক্ষতির দিকটাই দেখ্‌বো না, লাভের দিকটা তলিয়ে দেখলে, ক্ষতির চেয়ে লাভটা যে আমার কম হয়েছিল, সে কথা আমি কখনো বলবো না। সে দিনের সে ভয়ানক সন্ধ্যায় ওপরের দিকে তাকিয়ে যে তোমার ভীত করুণ চেহারাখানি চোখে আমার পড়্‌ল, তাতেই আমার চোখ ফেটে রক্ত আসতে চাইল। উঃ, সে কি দিন আমার গেছে যুথিকা, কিন্তু, সে দিন তুমি ছিলে আমার সুদুর্লভ কামনার জিনিষ, আমার আশা নিরাশার অতীত! আর

আজ ?—আজ যদি তোমায় এমনি করে বুকের মাঝে পেলাম,—আজ তবে তুমি মিছে লজ্জার জড়তায় আমার সকল সাধ নষ্ট করে দিয়ো না যুথিকা।

গঙ্গার বুকে, জাহাজ ঘাটের এই জেটিখানি চির চঞ্চল, জাহাজের স্টীমারের, নৌকার স্পর্শে চির সঙ্গীত মুখর চল চল, ছল ছল, অগাধ জলরাশির উপর, তীরের আলোগুলি পড়িয়া ঝলমল করিতেছে। ছোট ছোট নৌকাগুলি কোনটা তীরের সঙ্গে বাঁধা, কোনটা বা ধীরে মন্থরে সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছে। দ্রুতগতি 'লঞ্চ'গুলি, তাদের সাদা সাদা পক্ষগুলি মেলিয়া রাজহাঁসের ন্যায়, এপাশে ওপাশে ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

মনটা যখন কানায় কানায় ভরা থাকে, তখন নতুন ভাবনার সৃষ্টি এবং স্থিতি কোথা হইতে আর সেখানে হইবে? আমি শুধু পরিপূর্ণ নির্ভরতায় তাঁহার হাতে হাতখানি রাখিয়া, সম্মুখের এ অনন্ত সৌন্দর্য্য-পুরীর পানে তাকাইয়া রহিলাম। মনটি বুঝি আর সব ভুলিয়া গিয়াছিল,—তাই কেবল মনে এই কথাটাই সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিল, এ স্বপ্নের এ মায়া পুরীতে আজ শুধু তিনি আর আমি। তিনি ডাকিলেন, কথা কহিলেন, আমার স্বপ্নের ঘোর টুটিয়া গেল, আমি চোখ তুলিয়া চাহিলাম।

কিন্তু এ কি ব্যাকুল দৃষ্টি তাঁর! মা-গো-মা, আমার লজ্জা করে, তাঁর চাউনীর সামনে চোখ যে আমার আপনি নত হইয়া আসে, তাঁর চোখে আমি চোখ রাখিতে পারি না!

তোল মুখ যুথিকা, কথা কও,—

কি কথা বোলব, জিজ্ঞেস কর, আমি উত্তর দিই।—

তোমার মনে কি কোন কথা নেই যুথিকা? আমার যে কথা ফুরোতেই চায় না, আর তুমি না কি কথা খুঁজে পাও না! আমার কি

হয়েছে জান যুঁই? মনে হয়, বুক আজ আমার কানায় কানায় ভরে উথলে পড়ছে, আর তোমার মন কি পাথরে গড়া! তোমার মনে কি কোন একটু ভাব ফোটে না যূথিকা?

তাঁর দেহের উপর সম্পূর্ণ ভারটুকু ছাড়িয়া দিয়া হাসিয়া বলিলাম, 'বাইরে আমার ফোটে না সত্যি, কিন্তু ভেতরে যে আমার মূল গেড়ে বসে আছে, সে ত আর উঠে আসবে না, কিন্তু তোমার যে উথলে পড়ছে, তাতেই ত ভয় হয়, উথলে পড়তে পড়তে আবার ফুরিয়ে যাবে না ত!'

তিনি হাসিয়া আদর করিয়া বলিলেন,—'তবে নাকি যুঁই আমার কথা জানে না! না খোঁচালে কথা বেরোয় না, না! খুঁচিয়ে খুঁচিয়েই খালি কথা শুনতে হবে!'

পেছনে পদশব্দ শুনিয়া, চমকিয়া তাকাইলাম, দুইটী কলেজের ছেলে এদিকে আসিতে আসিতে, আমাদের দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং লজ্জা পাইয়া ফিরিয়া গেল। আশে পাশে তীরে বাঁধা নৌকা-গুলিতে মাঝি মাল্লাদের রান্নার কাজ তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, ছোট ছোট কেরোসিনের কুপিগুলি সামনে রাখিয়া, তাদের সেই চালধোয়া, শুক্‌নো মাছ আর আলুপটল কোটা—আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলাম। জলের উপর, নির্ব্বিবাদে, নির্ব্বিরোধে, কি সুন্দর এই ছোট সংসারগুলি! জাঁকজমক নাই, আড়ম্বরের হৈ চৈ নাই, আছে কেবল মোটা মোটা চালের ভাত, আর শুক্‌নো মাছের চর্চ্চরী! সংসারে যা কিছু সহজ, তাই কি এত সুন্দর? এদের এই জীবনগুলির উপর আমার যে লোভ হয়!

বাঁ পাশে একটা বিলাত-যাত্রী জাহাজ নঙ্গর ফেলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দোতলায় তার দু'এক জন সাহেব, দু' এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক, সবাই

বোধ হয় জাহাজের কর্ম্মচারী। এক তলায় যত সব চাট্‌গেয়ে মুসলমান খালাসীর দল। জীবন যাত্রার কাজ সেখানেও তাহাদের একটু একটু আরম্ভ হইয়াছে, আমি অতৃপ্ত নয়নে তাহাদের দেখিতে লাগিলাম। একটা খালাসী বড় সুন্দর সুরে গান গাহিতেছিল, কথাগুলি সব বুঝিতে না পারিলেও, সুরটা ভাল লাগিতেছিল, ঘুরিয়া ফিরিয়া এ গান ও গান গাহিতে গাহিতে হঠাৎ সে গাহিয়া উঠিল—

'—ঘাট্টে ডিঙ্গি লাগায়্যা বধূ
পান খাইয়্যা যাও,
পান খাইয়্যা যাও রে বধূ—

আমি হাসিয়া উঠিলাম, বলিলাম 'চল আমরা উঠে যাই'। তিনি বলিলেন—'আহা, বেচারার অত আকুল আবাহন, তার বধূকে,—একটু শুনেই যাও না—'

না,—না, চল,—রাতও ত বেশ হয়ে এল!—

গভীর রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিলাম, মুক্ত গবাক্ষ পথে নিশুত রাতের তারায়-ছাওয়া আকাশখানি চোখের উপর হাসিয়া উঠিল।

জানালার পাশে টেবিলের উপর সদ্য-কেনা ফুলের তোড়াটীর গন্ধটুকু বড় মিঠে লাগিতেছিল। শুভ্র সুন্দর নরম বিছানাখানিতে তাঁর ঘুমন্ত মুখখানির পানে তাকাইলাম। কালো কোঁকড়ান চুলের ফ্রেমের ভিতর জ্যোৎস্নাধৌত মুখখানি তাঁর এত সুন্দর! দিনের বেলা তাঁর জাগ্রত অবস্থায় ত এমন করিয়া তাঁর পানে তাকাইতে পারি না, তিনি হাসিয়া ফেলেন—লজ্জায় আমি মরিয়া যাই। এমন করিয়া তাই, এ দেখার লোভ কি সম্বরণ করা যায়? যে কথা তিনি বার বার শুনিতে চান, যে কথা তিনি বার বার জিজ্ঞাসা করিলেও আমি উত্তর দিতে পারি না,

সেই কথাটি এখন আমার মুখে আসিয়া যে বার বার ঠেকিতে লাগিল,—প্রিয় আমার, প্রিয়তম আমার,—সত্যি তোমায় কত ভালবাসি! উপরে আমার নিশুত রাতের তারা-ভরা আকাশের প্রশান্তি—আর নীচে আমার ক্ষুদ্র মনখানি ভরা অসীম প্রেমরাশি লইয়া, একাকী আমি জাগিয়া রহিলাম।

ভালবাসি—কিন্তু এত ভাল কি মানুষে বাসিতে পারে! উঠিতে, বসিতে, স্বপনে, জাগরণে এ কি দেবমূর্ত্তি আমার চোখের সম্মুখে অনুক্ষণ জাগিয়া থাকে! মনে হয় যেন আর কাহাকেও কোন দিন এত ভালবাসি নাই, এত ভালবাসা কোন দিন পাইও নাই। আমার আজন্মের সেই শিক্ষা দীক্ষা কোথায় আজ উড়িয়া গিয়াছে—সব ভুলিয়া গিয়াছি। মনে কেবলই শঙ্কা হয়, কি করিলে তিনি প্রাণে আঘাত পাইবেন, কোন্ কাজটায় তিনি অপমান বোধ করিবেন! বলিতে লজ্জা করে, সকালে সন্ধ্যায় উপাসনার সময়ও চোখ বুজিয়া ভগবানকে ভাবিতে গিয়া দেখি, এ কি বুক ভরিয়া এ কাহার মূর্ত্তি হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে! সকলে উপাসনায় যোগদান করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যে যার কাজে উঠিয়া যায়, আমিও লজ্জা পাইয়া উঠিয়া আসি, কিন্তু কই, ভগবানের পূজা ত হইল না, তাঁহাকে ত একটীবারও কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারিলাম না,—পারিলাম না সত্য, কিন্তু ইহাতে ত দিনটা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। কে যেন অন্তর মধ্যে কেবলই বলিতে থাকে, "যদি ইঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিস ভগবানের পূজা তবে এমনিই হইবে!"

ভাবি, এই এতখানি সুখ যে ভগবান আমাকে দিয়াছেন, তাহা চিরকাল আমার থাকিবে কি? এ সুখের ত সম্পূর্ণ অধিকার আমার নাই, কাহাদের সুখ কাড়িয়া আমি নিজের বুকের কানায় কানায় নিয়া

ভরিয়াছি, সে কথা ত আমি ভুলি নাই। তাঁহাদের অভিশাপ কোন্ দিন ক জানে বজ্রের ন্যায় আসিয়া মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবে! ভাবিতে ভয় হয়, বুক কাঁপিতে থাকে।

*　　*　　*　　*　　*

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর কাটিয়া গেল।

আমাদের বিবাহের তিথিটিতে দাদার ইচ্ছায় বাড়ীতে মস্ত এক 'পার্টি' হইয়া গেল। দেখিলাম, এই এক বৎসরে সমাজের লোকের মনের সেই ভাব আর নাই, আজ সকলেই উৎসাহিত এবং আনন্দিত হইয়া আমাদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছেন। গুরুজনের আশীর্ব্বাদ এবং প্রিয়জনের স্নেহোপহারগুলি আজ আমার প্রাণে কি আনন্দ জাগাইয়া তুলিতেছে, বলিতে পারি না।

সন্ধ্যার পর তিনি ঘরে আসিয়া একছড়া মালা আমার গলায় পরাইয়া দিয়া আদর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "যুথিকা, বল্‌তে পার, কি একটা জিনিষ আমাদের দুজনের মাঝখানে অদৃশ্যভাবে রয়েছে যার জন্যে আমরা ঠিক এক হ'তে পারছি না?"

আমি মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিলাম। হায় রে হায়, আজকার দিনে তোমার মনে এ কি ক্ষোভ জাগিয়াছে, প্রিয়তম! ভগবান জানেন আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের যাহা কিছু আছে, সকলই দিয়া আমার মনের মন্দিরে ঐ দেবোপম মূর্ত্তিখানি কি আগ্রহে অহর্নিশ পূজা করি, তবু যদি কোথাও অভাব থাকে, তবে সে তোমার মনে, স্বামী,—সে অপরাধ আমার নয়।

তিনি এবার হাসিয়া আমাকে কাছে টানিয়া নিলেন, আদর করিয়া

বলিলেন, 'হোতেও পারে আমার এ ধারণা ভুল, তবু সত্যি যদি কোথাও কোন বিরোধ আমাদের জন্মিয়া থাকে, এসো, আজ আমরা তার জন্য প্রার্থনা করি। ভুল যদি কিছু হোয়েই থাকে, সে ভুল আমাদের কেটে যাক,—দেহে মনে প্রাণে এবং কাজে আমরা যেন এক হতে পারি।'

—কিন্তু চোখের সে জলধারা আমি আর কিছুতেই আজ থামাইতে পারিলাম না। সত্যি প্রিয়তম, আমি বড় বেশি বেশি চাই—না? কিন্তু তোমারই ভাণ্ড কি এরই মধ্যে ফুরাইয়া আসিতেছে প্রভু?

* * * * *

এই দুটি বছরেই কি এত পুরাতন হইয়া পড়িলাম! প্রাণের ভিতর নবীনতার সে স্পন্দন কোথাও আর পাই না কেন? আজও তিনি হাসেন, আদর করেন, কথা বলেন, কিন্তু সে নেশা কোথায় গেল? কারণে অকারণে আগের মত এত কথা জোটে না কেন? মিছিমিছি চাহিয়া থাকা, ধরা পড়িয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠা—কোথায় গেল? অনুযোগ করিবার মত ত কিছু খুঁজিয়া পাই না, বুকটা তাই অস্পষ্টতার আড়ালে থাকিয়া কেবলই যে জ্বলে!

* * * *

ওগো নিষ্ঠুর, তোমার কি এ ছেলেখেলার সাধ মিটিয়া গিয়াছে? কিন্তু, আমার যে এখনো তৃপ্তি হয় নাই,—আরোও কিছুদিন অবসর দাও স্বামী!

জীবন না কি তোমার বড়ই একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে! তা পড়িতে পার, কিন্তু আমার এ অসীম আকাঙ্ক্ষারাশি যে আজিও মেটে নাই প্রভু, আমার স্বপন যে আজিও নূতনত্বের দীপ্ত আলোকে ঝলমল করিতেছে—আমার এ ক্ষুধিত বাসনারাশি যে লক্ষ লক্ষ জালে শত দিক দিয়া আমায় ঘেরিয়া ধরিয়াছে, আমি কেমন করিয়া তাহা হইতে মুক্তি পাই?

—এ অন্যমনস্কতা, এ গাম্ভীর্য্যটুকু, এ যেন দিনে দিনে কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। সামান্য কারণেই হঠাৎ চটিয়া উঠা, দুদিন তিন দিন রাগ করিয়া কথা না বলা, এও যেন নতুন! কতবার মিছিমিছি কাজের ছল করিয়া, শুধু তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঘরে আসিয়া ঢুকি, এবং কাজ শেষ হইয়া গেলে বাধ্য হইয়াই চলিয়া যাই, কিন্তু তিনি তা ফিরিয়াও দেখেন না! যদি বা কখনো কাঁদি, অনুযোগ দিই, তিনি আদর করিয়া বলেন, 'ছিঃ যুথিকা, এত অবিশ্বাস? আচ্ছা বল তো হাসি খেলা কি আর সারা জীবন ভরেই ভাল লাগে? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একটু গম্ভীর হোতে হয় তো, তাই বলে কি তুমি আমার মনের উপর অবিচার করবে?'—চুপ করিয়া থাকি, কি বলিব,—বলিবার কিই বা আছে! স্বামী, তুমি পুরুষ মানুষ, তোমরা সবই করিতে পার, সহিতেও পার, কিন্তু আমার যে অভিশপ্ত নারীকুলে জন্ম হইয়াছে, আমি কি এত সহজে তৃপ্ত হইতে পারি?

—এ কি গুরুজনের দীর্ঘশ্বাসের ফল? না কি তোমারই 'উথলে পড়ার' শেষটুকু প্রিয়তম?

*   *   *   *

চারিটি বছর ধরিয়া এ কি প্রাণান্তকর ব্যর্থ চেষ্টা! ছিঃ ভালবাসা না কি আবার জোর করিয়া আদায় করা যায়! সুখী করিতে এবং সুখী হইতে এত চেষ্টা ত করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই যে আর পারিয়া উঠি না, সবতাতেই যে কেবলই বিরক্তি, কেবলই অতৃপ্তি! এতদিন এ কেবল আমাদের দুজনের ভিতরেই ছিল, তৃতীয় কেউ কখনো কিছুই বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু, আজ তিনি দাদার সম্মুখে যে ভাবে আমার সঙ্গে রাগ করিলেন, এ যে আজ আমার সহ্যের অতীত হইয়া পড়িয়াছে।—একলা ঘরে, দেবতা আমার, আমায় যদি তুমি মারিতে-ও, তবু বুঝি আমার এমন কষ্ট হইত না,—কিন্তু, দাদা কি ভাবিয়া গেল!

*   *   *   *

চাকরটাকে আজ সকালে কেন যে এমন করিয়া মারিলেন, জানি না। কার ব্যবহারে না কি কি রকম অপমান বোধ হইয়াছে,—তাই সামান্য একটু কারণেই চাকরটাকে মারিয়া সে অপমানের শোধ তোলা হইল! কিন্তু, এ মারা কি চাকরকে মারা হইল, না কি, প্রকৃতপক্ষে আমাকেই মারা হইল, তা একবার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে।

সত্যি যদি কথায় কথায়ই এত অপমান বোধ হয়, কলকাতা সহরে কি আর বাড়ী নাই?—তোমার যা আয়, তাহাতে কি আমায় প্রতি-পালন করিবার ক্ষমতাটুকু তোমার নাই, প্রিয়তম? আপনি রাঁধিয়া,

বাসন মাজিয়া, বাটনা বাটিয়া তোমায় খাওয়াইব প্রভু, তবু আমি চাই নির্ব্বিরোধ শান্তিটুকু !

* * * * *

অত আর কে প্রতিদিনই সহ্য করিতে পারে ! বাড়ী শুদ্ধ সবাই এই মেজাজের চোটে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে !

বকুনী শুনিয়া শুনিয়া, খোঁচা খাইয়া খাইয়া, আমার স্বভাবটাও কি রকম হইয়া পড়িয়াছে ; কথাটা শুনিয়া পাল্টা জবাব না দিয়া যে আমিও থাকিতে পারি না,—আজ তাই কি একটা কথায় একটু কড়া করিয়াই বুঝি জবাব দিয়াছিলাম, রাগ করিয়া তখনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। চোখের সম্মুখেই চলিয়া গেলেন,—দেখিলাম,—বারণ করিতেও ইচ্ছা হইল, কিন্তু পারিলাম না।

দাদা কয় দিন হইতে বাড়ী নাই, মাও প্রতিদিন জ্বালাতন হইয়া হইয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, আজকাল আর তাঁহার কোন খোঁজ খবরই তিনি নেন না। সেই সকালে বাহির হইয়া গিয়াছেন, আর এখন রাত্রি বারটা বাজে ! কোথায় গেলেন, কি করিতেছেন, কে জানে ? আমি সেই তখন হইতে এই জানালায় বসিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছি, কত লোক আসিল, গেল, কতবার গেটের কড়া নাড়িয়া উঠিল, কিন্তু তিনি ত কই এখনো আসিলেন না ! কেন আমি অভাগী মরিতে তাঁহাকে রাগাইতে গিয়াছিলাম ?—লোকে তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথা বলে, এই বাড়ীতেও তাঁহার আদর স্নেহ একবারে কমিয়া গিয়াছে, তাই আমার দুঃখ ও রাগ হইয়াছিল। দেবতাকে দেবতার আসনে রাখিয়াই যে পূজা করিতে ইচ্ছা হয়, তাই তাঁহার মধ্যে কলঙ্ক দেখিলে সহ্য হয়

না। কিন্তু আমি আরও একটু কোমল করিয়া কথাটা বলিলাম না কেন !...

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। অন্ধকারে সারাটি পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া আছে। এ তীব্র বিভীষিকাময়ী অন্ধকার ভেদ করিয়া চক্ষুর জ্যোতিঃ বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে না, দূরে রাস্তায় গভীর নীরবতা ছাড়া আর কিছুই যে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আমার বুক কাঁপিতেছে, আমার ভয় করিতেছে যে !

* * * *

সকালবেলা চা খাইবার পর বাবা আমাকে তাঁহার আলমারীর বইগুলি রৌদ্রে দিয়া ঝাড়িয়া রাখিতে বলিলেন। বুকের ভিতরটা আমার তখন বড় কেমন করিতেছিল, কাল রাত্রে কি একটা কথা নিয়া তাঁহার সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছি, আজও ভোর বেলা তাঁহার আহ্বান উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম, এখন তাই সন্ধির জন্য বুকের ভিতর একটা তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। তিনি আর একবার না ডাকিলে যাইতে লজ্জা করে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে রাগ করিয়াই কি বেশীক্ষণ থাকিতে পারি ? তাঁহার একটি স্নেহ পরশের জন্য আমার সারাটি মন যে কাঁদিয়া মরিতেছে ! তাই বাবার কথায় 'আসছি' বলিয়াই উপরে চলিয়া আসিলাম, এবং পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, তিনি দরজার দিকে পেছন ফিরিয়া চেয়ারে বসিয়া একখানি চিঠি পড়িতেছেন। আস্তে আস্তে আসিয়া চোখ টিপিয়া ধরিবার ইচ্ছায় কাছে আসিতেই চিঠির দিকে চোখ পড়িল, আমি অবাক হইয়া গেলাম—এ কি, এ যে তাঁর বাবার চিঠি ! এই চার বছর বিবাহ হইয়াছে, কই,

তাঁর চিঠি একদিনও ত দেখি নাই! আমি অত্যধিক বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "আশ্চর্য্য, এ চিঠি কবে, কখন এলো?"

তিনি কথাটি না বলিয়া, চিঠিখানি হাতে করিয়াই ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। আমি হতবুদ্ধি হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। এ কি কাণ্ড! আমাকেও গোপন করিবার মত তাঁহার কি কিছু থাকিতে পারে! আমাদের মধ্যে এ কি সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে! তিনি স্বামী, আমি তাঁহার পদানতা দাসী, স্ত্রী,—আমাদের মধ্যেও সত্যিকার বিরোধ জন্মিতে পারে কি? বাবার কাছে যাওয়া আমার আর হইল না, আমি টেবিলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

* * * * * *

কাল সকালে উনি হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "যুথিকা, মার বড্ড অসুখ, চিঠি এসেছে। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তিনি আমায় কাছে ডেকেছেন, আজ রাত্রের গাড়ীতেই আমি রওনা হব।"

আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, আমার সমস্ত গুপ্ত বেদনা এইবারে একটা কঠিন ভীষণ মূর্ত্তির আকার ধারণ করিয়া আমাকে উপহাস করিতে লাগিল। কল্পনায় অনেক কথা ভাবিয়া নিয়া মনে মনে আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

যাবে,—কিন্তু প্রিয়তম, এত শীগ্‌গীর? আবার কত দিনে দেখিতে পাইব, কে জানে! হে আমার চিরপ্রিয়, বিদায়ের দিনটায় আজ একটীবার শুধু হাসিয়া, আদর করিয়া 'যুঁই' বলিয়া ডাকিয়া যাও।

তোমার অনাদরে আমার মন যে কি করিতেছে সে ত আর কাহাকেও বলিতে পারিব না। প্রিয়তম, বহুদিন পরে একটীবার তুমিই আজ তাহা দেখিয়া যাও।

একবার বলিয়াছিলাম, "মার অসুখ, আমায়ও নিয়ে চল। তাঁর সেবা করবার অধিকারও কি আমার নাই?"

তিনি ঘাড় নাড়িয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! কি যে বল, তার কিছু ঠিক নাই। সে কি এখনই হয়? যাক্ না আরো কিছু দিন, সেখানে সবাকার মন বুঝে তার পর তোমায় নিয়ে যাব'খন—আজই এত ব্যস্ত কেন?"

* * * * *

বুকটা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এ যে কি বেদনা, কাহাকে বুঝাইব! মনে হইতেছে এ শূন্যতা বোধ হয় আর কিছুতেই পূরণ হইবে না। তাহার চেয়ে নিজের হাতে আমাকে বিষ দিয়া গেলে না কেন প্রিয়তম? তাহা হইলে ত এ বেদনার অনুভূতিটুকুও আর থাকিত না। মরিয়া বাঁচিতাম—এভাবে বাঁচার চেয়ে সেই যে আমার ঢের ভাল ছিল গো, ঢের ভাল ছিল।

১৩

দিহু, দিদিমণি আমার, তোকে বলবার আজ আর আমার কিচ্ছু নেই। হতভাগা নরেনটা যে শেষকালে এমন কাণ্ড করে বস্‌বে,—আর যা'ই করুক, দিদি, আর একটা বিয়ে করে বসবে, তা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল ?—

আমি মুখ তুলিয়া হাসিতে চেষ্টা করিলাম,—কিন্তু সাহস হইল না, হাসিতে গিয়া যদি কান্নাই আসিয়া পড়ে! যে আমার প্রবল বেদনা রাশি কেবলমাত্র ভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই, আপনাকে সংযত শান্ত করিয়া রাখিয়াছিল, দাদার ঐ সহানুভূতিতে কোমল দৃষ্টি খানির উপর একটীবার যদি আমার এ দৃষ্টি যাইয়া মিলিত হয়, আমার এ উদ্যত অশ্রুধারা তখন কি আর আমি রোধ করিয়া রাখিতে পারিব?

দাদা বলিল 'দিদি, আমি বাবার সামনে থেকে পালিয়ে এসেছি ভাই, তাঁর সে মুখের পানে তাকানো আর যায় না; আর মা,—মা যে কি করছেন,—উঃ—'

আমি একটী কথাও বলিলাম না, বাবার নীরব শান্ত ধৈর্য্য আজ ঝড়ো হাওয়ায় উতল হইয়া উঠিয়াছে। আমার মা আজ পাগল, আর আমি?—আমি উতল হইলাম না, পাগল হইলাম না, কেবল সহানুভূতির একটা বিরাট লজ্জায়, বরফের মত জমিয়া শক্ত হইয়া রহিলাম।

সবাই ভাবিয়াছিল, খবরটা জানিলে আমি বোধ হয় পাগল হইয়া যাইব। আমার নিজেরও সে ভয় হইয়াছিল—কান্না আসিতেছিল না,

দুঃখও হইতেছিল না, কোন অনুভূতিই আর আমার ছিল না। এ কি উন্মাদের লক্ষণ নয়?

—কিন্তু, না, উন্মাদ আমি হইলাম না। ভগবান রক্ষা করিয়াছ প্রভু! উন্মাদ হইয়া গেলে এ শাস্তি কে ভোগ করিত? অভিশাপ যা তোলা ছিল সে ত আমি একলাই কামনা করিয়াছিলাম, এখন ভয় পাইয়া পিছাইয়া গেলে চলিবে কেন?

তাই হোক্, তাই হোক্, হে আমার পরম প্রিয়, তোমার অপরাধের যা শাস্তি, সে আমারই মাথায় বজ্রের মত আসিয়া পড়ুক। তুমিও ত এত দিন কিছু অল্প বেদনা পাও নাই প্রাণাধিক! আজ যদি বহন করিবার জন্য সে ভার আমার মাথায় দিয়া তুমি দুদিন একটু আরাম খুঁজিতে যাও, তাহাতে কি আমি বাধা দিতে পারি? কিন্তু তবু একটা কথা মনে ছুঁচের মত বিঁধিয়া উঠিতেছে যে—ওগো আমার নিষ্ঠুর দেবতা, তোমার বিবাহের খবরটা আমাকে এমনিভাবে না জানাইলেও পারিতে! একবার কি ভাবিয়াও দেখিলে না, আজিকার দিনে এ খবর আমার বুকে কেমন করিয়া আসিয়া বিঁধিবে! আজ যে বাংলা মাসের কত তারিখ, আজ যে আমাদের পঞ্চম-বিবাহ-তিথি, কেমন করিয়া তুমি সে কথাটা ভুলিলে? আমি কি এতই কঠিন পাষাণ যে, এমন খবরটা পাইয়াও অবিচলিত থাকিতে পারিব? অথবা, বিশেষভাবে আমায় যন্ত্রণা দেওয়াই কি তোমার উদ্দেশ্য?

লিখিয়াছ, বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য তোমাকে পালিতেই হইবে। নিজের সুখ লইয়া বহুদিন কাটিয়াছে, আর নয়, এইবারে পিতামাতার সেবা করিয়া জীবনটা সার্থক হইয়া উঠুক।

আজ তুমি যাহা চাহিতেছ, আমি ত বহুদিন পূর্ব্বেই তাহা চাহিয়াছিলাম। প্রিয়তম, আমি ত কোন দিন চাহি নাই যে, আমাকে

পাইয়া তুমি পিতামাতাকে ভুলিয়া যাও। কিন্তু এমনিভাবে আমাকে ত্যাগ না করিলে কি চলিত না? তাঁহাদের চরণে যদি হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিতাম, তবু কি সন্তানগণকে তাঁহারা ক্ষমা করিতে পারিতেন না?

কিন্তু, না ছিঃ—অনুযোগ আমি কাহাকেও দিব না। এ অপরাধ ত তোমার নয় স্বামী, এ শুধু দুঃখী পিতামাতার বেদনার্ত্ত হৃদয়ের অভিশাপ,—আমি তাহাই আমার এ ভারাক্রান্ত মাথাটীতে বহন করিয়া চলিব। আজ আর কাঁদিব না, কিছু বলিবও না,— শুধু প্রার্থনা—তুমি —তোমরা দুজনে সুখী হও। যে সুখ আমায় তুমি দিতে পার নাই,— সেই সুখটুকু তাকে দিও।

* * * *

কিন্তু—এ কি! কাগজ ভিজিয়া যাইতেছে কেন? না, না, আমি ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আজ আর কাঁদিব না। শুধু তুমি রাগ করিয়াছ, তাহাতে কি? এখনও আমার পিতা আছেন, মাতা আছেন, অসীম স্নেহপরায়ণ ভাই আছে, আমার আবার দুঃখ কি? অভাব কিসের?

কিন্তু,—নাঃ—পারি না, কি বলিব? বুকটা যে ক্রমেই খালি হইয়া যাইতেছে,—কিসের এ শূন্যতা? কি দিয়া এ শূন্যতা আমি ভরিয়া তুলিব? উঃ, এ কি কষ্ট! ফেলিয়া গেলে প্রিয়তম! কিন্তু স্মৃতির জন্য এতটুকুন করুণা-কণাও যে রাখিয়া যাও নাই, এ বেদনা আর আমার কিছুতেই ঘুচিবে না।

ফাল্গুন মাস, অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। তেতলায় আমার নীরব ঘর-টিতে দুপুরে আর টেঁকা যায় না, পশ্চিমের দরজা জানালা দিয়া রৌদ্র আসিয়া সারাটা ঘর ভরিয়া যায়। কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, একলাটী খাটে শুইয়া শুইয়া শরীর মন ক্রমে ক্লান্ত হইয়া উঠে, একটিবার উঠিয়া যে কবাটগুলি বন্ধ করিয়া দিব তেমন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিও তখন থাকে না। প্রতিদিন সকালে ভাবি, আজ আর শুইয়া বসিয়া সময় কাটাইলে চলিবে না, সেলাই করিয়া, কিম্বা যাহোক কিছু করিয়া সময়টার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু, গরম পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীর ও মনে কেমন ধীরে ধীরে যে অবসাদ নামিয়া আসিতে থাকে, তখন কিছুতেই আর শয্যায় আশ্রয় না লইয়া পারি না। চক্ষু মুদিয়া আধঘুমে আধজাগরণে কেমন একটা তন্দ্রার ভিতর দিয়া সময়টা কাটিয়া যায়।

স্নানের পর আজ চুল শুকাইতে জানালার পাশে দাঁড়াইয়াছিলাম, পাশের বাড়ীতে আমিনা তাহার হিন্দুস্থানী ওস্তাদের কাছে এস্‌রাজ বাজাইয়া গান শিখিতেছিল—

"কি জানি কবহু সখি স্বপনে কি জাগরণে
কৈছন দরশন ভেলি,
অপরূপ সে রূপ হিয়াপর রোপিনু
নয়নে নয়ন ক্ষণ মেলি।'

এ গানটা আমি অনেক দিন শুনিয়াছি, বিশেষতঃ আমিনার এই ওস্তাদের মুখেই কতবার শুনিয়াছি, কিন্তু আজ যেন গান শুনিয়া হঠাৎ

আমার মনটা কেমন হইয়া গেল, আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমিনার দ্বারের খোলা জানালা দিয়া স্পষ্ট দেখা গেল, ওস্তাদের প্রশংসমান মুখের দিকে চাহিয়া আমিনা প্রবল উৎসাহে এস্রাজের ছড়ি চালাইয়া আরো চড়াগলায় গাহিতে লাগিল—

"না জানি সজনি কো সো চিত চোরা
হাসি সরল মঝু হৃদয় বিভোরা।"

বাহিরে রোদ্দুর তখনও তেমন প্রখর হইয়া উঠে নাই, আমার সমস্ত শরীর তবু ঘামে ভিজিয়া গেল। বুকটা আমার কেমন করিতে লাগিল, আমি তাড়াতাড়ি আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। বুকের দ্রুত স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতে লাগিল যেন, বিশ্ব সংসারটাও কাঁপিতে কাঁপিতে হঠাৎ চূরমার হইয়া, কোথায় উড়িয়া গেল, চারিদিকের—রাস্তার—কিম্বা নীচের গোলমাল, কথাবার্ত্তা কিছুই আর শুনিতে পাইলাম না, কিন্তু আমিনার সে চড়াগলার গানটী আমার কানের পর্দ্দায় আসিয়া বারম্বারই কেবল আঘাত করিতে লাগিল—

"বিজুরি চমক সম আওত যাওত
মরম দহিয়ে কিয়ে কেলি।"

*   *   *   *

ফাল্গুনী রৌদ্রে ঝলমল আজিকার এই সুন্দর প্রভাতটির মতই বহু-দিনের পুরাতন একটি সুখস্বপ্ন মনের কোণে আমার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার পর একান্ত নিভৃতে বাবার পাশটিতে বসিয়া বলিলাম, 'বাবা আমার পুরাণো ওস্তাদকে আবার খবর দাও।'

বাবা করুণ নয়নে একটীবার শুধু আমার পানে তাকাইলেন,—কি ভাবিলেন কে জানে! হয় ত ভাবিলেন তাঁর ভাগ্যহীনা মেয়েটা এবারে, গীতবাদ্যের মধ্যেই বুঝি তার আশ্রয় খুঁজিয়া লইতে চায়। বাস্তবিক, কথাটা ত কিছু মিথ্যাও নয়, এই কর্ম্মহীন অলস অবশ জীবন আমার আর যে কাটে না! সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেখিতে পাই পৃথিবীর মানুষের যেন আর বিশ্রাম নাই, সারা দিনের কাজ কর্ম্মের স্রোতে আপনার সুখ-দুঃখকে ভাসাইয়া দিয়া, কেমন নিশ্চিন্ত মনে, আরামে তাহারা কাজ করিয়া চলিয়াছে। শুধু কি আমাকেই বিধাতা তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় দিয়াছেন? এই অভিশপ্ত অবসর, আমি তবে কেমন করিয়া কাটাই?

কিন্তু—নাঃ—বিধাতার বিধান কিংবা মানুষের দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুরতার চাপে আমার এ জীবনটা কিছুতেই আমি আর নিষ্পেষিত হইতে দিব না, আমি সকল বিধান লঙ্ঘন করিয়া আবার মানুষ হইয়া উঠিব,—উঠিব—উঠিব!—

সামনের এই সবুজ মাঠখানি আমাদের চূণ সুরকিতে ভরিয়া গিয়াছে। সারাটা দিন এই সব ইট পাথরের ঠোকাঠুকি আর, চূণ-সুরকি কাদার বিচিত্র লীলা দেখা, এ আমার একটা কাজ। সব চেয়ে ভালো লাগে, ঐ রঙ্গীন সাড়ী পরা ছোট্ট মেয়েটার ঝুড়ি ভরা মাটি নিয়া, মই বাহিয়া উপরে উঠা! সুন্দর চঞ্চল, ফরসা হাত দুটি ভরা রেশমী চুড়ি, রুক্ষ চুলের মাঝখানে চিকন সিঁথিটিতে চওড়া সিন্দূর! আর শততালি দেওয়া রঙ্গীন সাড়িটী কাদাতে চূণেতে ভরপুর। ক'দিন ধরিয়াই দেখিলাম, কাজে মেয়েটার গাফিলি দেওয়ার আর অন্ত নাই, কিন্তু তার পরই বুড়ো মায়ের কাছে ধরা পড়া বকুনী খাওয়া ও ঝগড়া করা এবং দুষ্টুমি করিয়া খিল খিল করিয়া হাসা, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এ একই ভাবে চলিয়াছে,—কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েটাকে আমার এত ভালো যে কেন লাগে, জানি না।

দিনটা ছিল বাদলা, সকাল হইতেই ক'বার যে মেঘ করিয়া দু এক ফোঁটা জল ঝরিয়া গেল, তার আর হিসাব কিছু নাই। কি একটা সেলাই নিয়া জানালার পাশে বসিয়াছিলাম, সেলাইটা বিশেষ কিছু অগ্রসর হইতেছিল না, মনটাও সে দিকে ছিল না, তবে কি না নিতান্ত নিষ্কর্ম্মার মত বসিয়া থাকাটা—চোখে বড় অশোভন ঠেকে! রাস্তায় এই জলেই বেশ একটু কাদার সৃষ্টি হইয়াছে, লোক চলাচলের বিরাম কিন্তু তবু নাই,—তবে আজিকার এ গমন ভঙ্গীটী একটু অন্যরূপ,—চোখে মুখে একটু বিরক্তির ভাব, জল কাদা ছিটানোতে জামা কাপড়ের অবস্থাটাও বিশেষ আরামপ্রদ নহে!

ভাবি, প্রতিদিন এই এতগুলো লোক যায় কোথায়!—দিকে দিকে, কি এত কাজ দিনের পর দিন মানুষকে পাগল করিয়া ডাকিয়া নেয়? আচ্ছা, কাজের কি একটা নেশা আছে? কেমন সে নেশা? এমন কোন কাজ মানুষের থাকে কি, যার নেশায় মানুষ নিজেকে শুদ্ধ ভুলিয়া যাইতে পারে? সংসারে মানুষের ভুলের ত অন্ত নাই, কত ভুলের জন্য কত সর্ব্বনাশ মানুষের হয়, কিন্তু এমন কি ভুলের কিছু নাই, যার জন্য মানুষ অন্ততঃ এক দিনের জন্য নিজের জীবনটাকে শুদ্ধ ভুলিয়া যাইতে পারে!

কিন্তু, কাজের নেশা কিছু থাক বা নাই থাক, এই পথ দেখার নেশা যে একটা আছেই, সে খবর আমি ভালো করিয়াই জানি। সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি কত লোক এই পথ বাহিয়া যায়, জানালা হইতে কোন্ যে দুটী ক্লান্ত চক্ষু, মাতালের মত এ কি নেশায় তাহাদের পানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চাহিয়া থাকে, সে খবর কি কেউ রাখে? কিন্তু এ জনস্রোতে প্রাণ আছে কার? জানি না, তবে এই প্রকাণ্ড পাগড়ী মাথায়, লাঠি হাতে এই কাবলীওয়ালাদেরই আমার চোখে সব চেয়ে প্রাণময় বলিয়া মনে হয়। আর এই যে ক্ষুদ্র দেহ বাঙ্গালীগুলি?—এরা যেন এই ভাড়াটে ছ্যাকড়া গাড়ীগুলির ঘোড়া! তার চেয়ে এই উড়েগুলোও ঢের ভাল, মাথায় এদের বিদ্যা কিছু থাক বা নাই থাক, স্ফূর্ত্তি ত আছে! স্ফূর্ত্তি ছাড়া মানুষ আজকাল আর সহিতে পারি না, নিজের বুকে দুঃখের বোঝা এত বেশী যে, অন্যের গম্ভীর মুখ, বোঝা আমার খালি ভারী করিয়াই তোলে।

বাদলার বেলাটী, ঘড়িতে দুটো কিম্বা আড়াইটা, আকাশের কাল মেঘগুলি ঐ ঈশান কোণটীতে জমা হইয়া আবার ধীরে বারি বর্ষণ সুরু করিয়া দিয়াছে। নীচের ইট পাথরের ঠোকাঠুকি বন্ধ করিয়া

লোকগুলি বারান্দাটির এক পাশে দল বাঁধিয়া বসিয়া পড়িল,—আমি হাত ইসারা করিয়া মেয়েটাকে উপরে আসিতে ডাকিলাম। দুষ্টুমিতে অপরাজেয়, হাসি খুসিতে উজ্জ্বল—চঞ্চল মেয়েটা আঁচলে কতগুলি কুল ঢাকিয়া সামনে আমার চৌকাটে আসিয়া বসিল। মেয়েটার সিঁথির রেখায় ঐ সিন্দূর রেখাটি সব চেয়ে মনে আমার কৌতূহল জাগাইল বেশী। এই রেখাটি দিয়া কোন্ পাষণ্ড এই বাচ্চা মেয়েটাকে বাঁধিয়া গিয়াছে, কে জানে! পুরুষের প্রাণ, এ বাঁধন তুচ্ছ করিয়া যাইতে কতটুকু দ্বিধাই বা তাদের জাগে! সাধ করিয়া, এ বাঁধনে ধরা পড়া—মেয়েগুলি বোকা—তাই পড়ে!—

প্রশ্ন করিয়া করিয়া যাহা জানিলাম, মেয়েটা হিন্দি মেশান বাংলায় যাহা কিছু বলিল, তাহাতে এই বুঝিলাম, ছয় মাস বয়সের সময় যাহার সঙ্গে তার বিবাহ হইয়াছিল, সে ছিল একটী চৌদ্দ মাসের ছেলে! কিন্তু বিবাহের পরই পুত্রটিকে নিয়া পিতামাতা সেই সুদূরদেশ মজঃ-ফরপুরে চলিয়া গিয়াছেন, মায়ের কাছে এইকথাই শুধু সে শুনিয়াছে, আর বিশেষ কিছু সে জানে না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাকে ত তুই মোটে দেখিসও নি—তাহলে ভালবাসিস্ কি করে?" সেও হাসিয়া বলিল 'নেহি দিদিমণি, হামি তাকে ভালবাসতে যাবে কেন? হামি কি তাকে দেখেছে?'

তবে সিঁদুর পরিস কেন?

বাবারে! ও পরতে হয়।

সারাটা দিন মনে কেবল এই কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতে লাগিল, কোথায় তার সেই চৌদ্দমাসের এক দিনের স্বামীটি? খোঁজ নাই, খবর নাই, জানা নাই, চেনা নাই,—তবু সে স্বামী, তবু তাহারই মঙ্গলের জন্য সীমন্তে এ সিঁদুর রেখা! ছিঃ, মনে যে ঘৃণা জাগে, এ সিন্দূরের

মর্য্যাদা চৌদ্দ বছরের এই মেয়েটা কত যে রাখিতেছে, তা দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছি,—কিন্তু, এ কি—এ তুচ্ছ প্রথা, বিবাহ কি একটা দিলেই হইল !—ভাবনাটা নিজেরই বুকে আসিয়া আঘাতের মত বাজিয়া উঠিল। বিবাহ একটা দিলেই হইল না বটে, কিন্তু বিবাহ তো আমারো হইয়াছিল...

ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্—এ বারিপাতের আর বিরাম নাই,—রাতের এ ঘনকৃষ্ণসাড়ীখানির ফাঁকে ফাঁকে জরির আঁচলাটির মত বিজলী রেখা পলকে পলকে শুধু চকমকিয়া উঠিতেছে।

বাড়ীখানি নীরব। দাদার ঘরের আলোটিও এই খানিক আগে নিভিয়া গেল। এই নিশুত রাতের আঁধারখানি ভুগিতে জাগিয়া শুধু একলা আমি—মুক্ত জানালা পথে জলের ছাট আসিয়া সর্ব্বাঙ্গ আমার সিক্ত করিয়া তুলিল, গায়ের এ জ্বালা—তবু ত' কই কমে না ! সম্মুখে. নীচের ইট পাথর চূণ সুরকিগুলি, বিদ্যুতের আলোতে চোখের উপর স্পষ্ট করিয়া শুধু আমার দুর্ভাগ্যেরই চিহ্নস্বরূপ ফুটিয়া উঠিতেছে !—শুনিতেছি, এ বাড়ী নাকি আমার, ভবিষ্যতে দাদার গৃহে যদি কোন দিন অনাদরের সূচনা হয়. তাই ওটা আমারই আশ্রয় হইয়া রহিল !—জানি আমি, আমার এ পিতৃগৌরব, আমার এ পিতৃস্নেহের তুলনা নাই। তবু, তবু—কেন সমস্ত বুকখানি ভরিয়া অভাবের একটা তীব্র বেদনা ?—যাহাদের রক্তে মাংসে এ দেহের রক্তমাংস, শুধু তাঁহাদেরই স্নেহে প্রাণের এ তিয়াস মেটে না কেন ? নারী-হৃদয়ের উপর বিধাতার এ কেমন অভিশাপ ?

কিন্তু বাহিরের ঐ আঁধার কি আমার ঘরের আঁধারের চেয়ে বেশী......আমার এ শূন্য শয্যা !...হায় রে, আমার এ চিরক্রন্দসী হৃদয়, বুকে যদি এ তুরপুণের আঘাত না-ই সহিতে পারিবে, নারী হইয়াছিলে কেন ?

* * * *

কিন্তু, সত্যি সে কি আমার চেয়ে সুন্দর? আমার চেয়ে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান তার বেশি? কে জানে, সংসারে কি-ই বা অসম্ভব! কিন্তু, তবু-তবু—আমার চেয়ে কি সে তোমায় বেশি ভালবাসিবে, দেবতা আমার? অসম্ভব,—তা যদি হয়, তবে এ পৃথিবী মিথ্যা—মানুষ মিথ্যা মানুষের ভালবাসা মিথ্যা—আমি জানি আমি নিশ্চয় জানি, যে কামনা করিয়া আমায় তুমি ত্যাগ করিলে, প্রিয়তম, সে কামনা তোমার পূর্ণ কখনো হইবে না, সুখী তুমি এ জীবনে আর হইবে না,—হইবে না—

আহা, বালবিধবা...

ভগবান আমার সঙ্গীটি দিলেন ভালই। তাই যখন বাবা আসিয়া আজ সকালে বলিলেন 'যুঁই, অবিনাশের মেয়েটাকে মাঝে মাঝে, এক আধ ঘণ্টা করেও অন্ততঃ না পড়িয়ে আসলে ত চল্‌বে না মা, অবিনাশ বড় জোর করেই ধরেচে'—তখন, মনের ভিতর জোরটা যে কার, তা শুধু আমিই বুঝিলাম।—

সন্ধ্যার পর যখন বাবার সঙ্গে কমলাদের ওখানে গেলাম, বাড়ীখানির যে দৃশ্য তখন চোখে আমার পড়িল,—এ জীবনে বোধ হয় তা আর ভুলিতে পারিব না।

সারাটি দিন একাদশীর তীব্র দাহন গিয়াছে,—বারাণ্ডার এক পাশে কাকাবাবু বসিয়া আহ্নিক করিতেছেন, আর দিনের এই নির্জ্জলা উপবাসের পর ঘরের ভিতর একখানা মাদুর বিছাইয়া, কমলা নির্জ্জীবের মত পড়িয়া আছে। পাশে শায়িত ছোট ভাইটি,—মায়ের কোলের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া মুদিত নয়নে তখনও ফোঁপাইতেছে—আধখানি দেহ তার মাদুরের উপর এবং বাকী অর্দ্ধ মাদুর হইতে সরিয়া মেঝেতে যাইয়া পড়িয়াছে। বারাণ্ডার এক কোণে একটিমাত্র লণ্ঠন জ্বলিতেছে, তাহার স্বল্প আলোতে ঘরে বাহিরের তীব্র অন্ধকারটিই মাত্র বিদূরিত হইয়াছে, সম্পূর্ণ আলোকিত হয় নাই, এবং এই ম্লান আলো-ছায়ার সম্মিলনে গৃহখানির যে একটা তীব্র বিভীষিকা আমার চোখ এবং মনের উপর ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

আমাদের আসার খবর পাইয়াই কাকীমা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মাদুরেরই এক পাশে আমি বসিয়া পড়িলাম, কমলা নিতান্ত ক্লান্ত দেহে নীরবে উঠিয়া বসিল। কাকীমা এক অতি করুণ নয়নে কন্যার পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে আমায় বলিলেন—'আজ একাদশী গ্যাছে, সারা দিন ওর উপোস—'

আমি বলিলাম, 'এই এতটুকু মেয়ে, এর উপরও এ বিধান কেন কাকীমা ?'

কাকীমা ম্লান হাসিয়া বলিলেন,—'এতটুকুন মেয়ে বলে আমরা দয়া কোরব, মা, কিন্তু কই, ভগবান ত এতটুকুন বলে দয়া করেন নি যুঁই !'

'ভগবান কি এমনি করেই এত কষ্ট দিয়ে সুখী হন কাকীমা ?'

'ও সব শাস্ত্রের কথা, ছোট হোক, বড় হোক, যতক্ষণ এ ধর্ম্মের আশ্রয়ে মা থাকবে, ততক্ষণ এর সব নিয়মও পাল্‌তে হবে। আমার মাকে ঠাকুমাকে যা দেখেছি, আশে পাশে, কুঁড়ে ঘরে কিংবা দালানের মাঝেও সর্ব্বদাই যা দেখছি, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াব, আমার এমন কি সাহস যুঁই ?'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম, বিশ্বাসপরায়ণা সরল এই মাতাকে আমি আর কি বলিব ! কাকীমা আবার বলিলেন, 'ছোট মেয়ের জন্যই যদি এ বিধান উল্টোতে হবে, তবে, যিনি সকল বিধানের বিধানকর্ত্তা, তাঁর এ নিয়মে ছোট ছোট মেয়ের জন্য তিনিই বা কেন বদলালেন না, যুঁই ?'

ঘণ্টাখানেক বসিয়া, ফিরিয়া চলিলাম, গাড়ীতে বাবা ও আমি দুজনেই চুপ করিয়া ছিলাম। মনটা আমার এ বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল,—তাই হঠাৎ কখন একবার কঠিন সুরে

বলিয়া ফেলিলাম—'ওই অতটুকুন মেয়েও একাদশীর উপবাস করচে বাবা !—'

বাবা একটু হাসিয়া বলিলেন—'এ ত কিছু নূতন নয় মা, হিন্দুসমাজে এ ত সর্ব্বদাই হচ্চে—'

'তুমি একে ভাল বল বাবা ?'

'ধর্ম্ম, সংস্কার আর মত কি সকলের এক হয় মা ! আমার সংস্কার, মত অন্য রকম, তাই আমার কাছে এ ভাল নাও লাগতে পারে ; কিন্তু তোমার কাকাবাবু কাকীমা যে মত নিয়ে চলেন, তাতে এ ব্যবস্থা তাঁদের কাছে কঠিন হলেও যে পাল্‌তেই হবে যুঁই, তাই বলে ভিন্ন ধর্ম্মে কি ভিন্ন মতে থেকে এ নিয়ে তর্ক করা ত চলে না মা !

'বাবা, এ কিন্তু বড় অবিচার—'

'ব্রহ্মচর্য্য পালতে হলে সংযমে থাকা'ত অন্যায় নয় যুঁই। মনকে শাসনে রাখতে হলে, যথেচ্ছাচার করলে কি চলে ? তখন আরো কত কঠিন সংযমের দরকার হয়, মনটা পবিত্র রাখতে হলে, শরীরকে ত কষ্ট সওয়াতেই হবে মা ! তবে জোর করে, আর শুধু নিয়ম বলেই—কোন কিছুই করান উচিত নয়।'

* * * *

বেশ আছি, দিনগুলি এক রকম মন্দ কাটে না। খাই-দাই, ঘুমাই, কর্ম্মও কিছু কিছু করি, আবার কমলার ওখানেও মাঝে মাঝে যাই।

আমাদের একতলায় সেই ইট পাথর ভাঙ্গা থামিয়া গিয়াছে, এবং সেই অর্দ্ধ গঠিত বাড়ীখানি, সুন্দর একখানি তেতলা বাড়ীতে পরিবর্ত্তিত

হইয়াছে।—আমিনারা ভাগের বাড়ী ছাড়িয়া আমাদের এই নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছে। তেতলায় যে ব্রীজটা এই পরস্পর সম্মুখীন দুইটি বাড়ীকে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতেই আমিনার সঙ্গে আমার দিনরাত্রিই আসা যাওয়া চলে। আমিনা মেয়েটি একটু যেন কেমন ধরণের। পাঞ্জাবী পিতা এবং বাঙ্গালী মাতার সংমিশ্রণে, প্রকৃতিটা তার একটু যেন কেমন ধরণের হইয়াছে, যা না কি প্রথম প্রথম আমার মোটেই ভাল লাগিত না, কিন্তু ক্রমে তাহার ঐ রুক্ষ গর্ব্বিত প্রকৃতিটির অন্তরালে এমনই একখানি স্নেহময় শান্তপ্রাণের পরিচয় পাইয়াছি, যাহাতে মন আমার স্নিগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ধনী পিতামাতার আদরের দুলালী রূপসী কন্যা—সংসারে আমিনার কোন কিছুর অভাব ছিল না, তাহার এই বিশাল সম্পত্তি এবং এই অতুল রূপভাণ্ডারের যিনি অধিকারী হইতে আসিতেছেন, বিদেশের শিক্ষা পরিসমাপ্তির পর দেশে ফিরিবার দিন তাঁর কাছেই আসিয়াছে। আমিনা মাঝে মাঝে আমাকে তাঁহার কথা বলে, এবং তাঁহার আসিবার দিন গণনা করে, দেখিয়া আমার হাসি পায়। এত ভালবাসা এবং এমন করিয়া সমগ্র মনের এই বিশ্বাস—এ কাহার জন্য? পুরুষকে কি বিশ্বাস করিতে আছে? তিনি যে বিলাত হইতে মেম বিবাহ করিয়া আসিবেন না, কিংবা ইহার আনুষঙ্গিক আরও অনেক কিছু কাণ্ড করিয়া বসিবেন না,—তাহার প্রমাণ কি?

ব্রীজের দরজা দুটি দুধার হইতে খুলিয়া দিলে, পরস্পরের কক্ষে যাতায়াতের আমাদের আর কোনও অসুবিধাই থাকে না।

কত রাত পর্য্যন্ত যে সে আমার পাশে আসিয়া শুইয়া থাকে, এবং পাগলের মত অনর্গল কত কথাই যে বকিয়া যায় তাহার আর ঠিক ঠিকানা নাই।

কাল রাত্রে কমলাদের ওখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মনটা কি যেন করিতেছিল, নীচে আহারাদি এবং অন্যান্য সমস্ত কাজ ফেলিয়া রাখিয়া আমি একাকী যাইয়া দরজা খুলিয়া ব্রিজে বসিয়া রহিলাম,—দেখিলাম সংসার ঠিক তেমন চলিতেছে, বরফওয়ালা, কুল্‌পি বরফ হাঁকিয়া যাইতেছে, গাড়ী ঘোড়া মানুষ সবই ঠিক তেমনি চলিতেছে, কিন্তু তবু যেন কোথায় কি হইয়া গিয়াছে! চট্ করিয়া মনে পড়িয়া গেল কমলার কথা, আহা হা—ভগবান্, ঐটুকুন মেয়ে কি অপরাধ তোমার কাছে করিয়াছিল? শুনিয়াছি, তোমার দয়ার না কি সীমা নাই, কিন্তু তোমার দেওয়া শাস্তিও যে অসীম।

সহসা একটা চীৎকার শুনিয়া চমক ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিলাম ওধারে একটা বাড়ী হইতে কয়েক জন লোক 'হরিবোল' হাঁকিয়া বাহির হইয়া গেল। উঃ, কি মর্ম্মভেদী ক্রন্দন, কাহার বুকের ধনকে চুরি করিয়া পালাইতেছে গো! এ আর্ত্তনাদে তোমার স্বর্গের সিংহাসন কি কাঁপিয়া উঠে না, ভগবান্? কি নিষ্ঠুর, কি পাষাণ তুমি।—মিলিত কণ্ঠের ব্যাকুল ক্রন্দনে আমার বুকের ভিতর কি করিতে লাগিল, আমিও কাঁদিতে লাগিলাম।

পাশের ঘরে কবাট খোলার শব্দ হইল, প্রচণ্ড একটা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিনা আসিয়া উপস্থিত হইল।

"ভাই, যুথিদি'—"

"এসো আমিনা,—"

"ভাই, সব ঠিক হয়ে গেছে।"

"কিসের ভাই?"

"আহা, জানেন না যেন, ন্যাকা—"

আমিনা হাসিয়া আমার কোলে মাথা লুকাইয়া বসিয়া পড়িল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি ফিরে এসেছেন না কি? কই, বলনি ত আমাকে!"

"বাঃ, প্রায় আজ ন দিন হয়ে গেল যে। তোমাকে বলেছি ত!"

আমিনা আমাকে বলিয়াছিল, কিন্তু আমারই মনে ছিল না। অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া বলিলাম, "বিয়ের সবই ঠিক হয়ে গেছে বুঝি?"

আমিনা কিছু না বলিয়া আমার হাতে জোরে চিম্‌টি কাটিয়া দিল। আমি আবার হাসিয়া বলিলাম, "কবে দিন ঠিক হ'ল ভাই?"

"সে সব এখনো কিছু ঠিক হয়নি, তাঁর বাবার চিঠি এলে হবে।"

"খুব খুসী হয়েছিস্ ভাই?"

"কেন হব না দিদি?"

"বেশ ভাই, তাই ত চাই, কিন্তু শুনেছি, তিনি খুব ভাল, তাঁর যোগ্য হ'তে পারবি ত?"

"তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, যূঁথিদি।"

"করব ভাই, নিশ্চয় করব, দুজনে যেন কখনো ছাড়াছাড়ি না হয়।"

আমার অস্বাভাবিক গলার স্বরে আমিনা বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, আমি লজ্জা পাইয়া বলিলাম, "আমিনা কতখানি সুখী হয়েছিস্ বল্‌ত ভাই?"

আমিনার সেই মুহূর্ত্তের চমক মুহূর্ত্তেই কাটিয়া গেল, তার পর সে তাহার মনের উচ্ছ্বাসকে শতধারায় আমার কাছে ব্যক্ত করিয়া দিল।

শুক্লপক্ষের দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্না আমিনার মুখে চোখে আসিয়া পড়িয়াছে, এক খণ্ড হাল্‌কা পাতলা মেঘ স্বাধীনভাবে এধারে ওধারে বেড়াইয়া, মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নার ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। আমি মুগ্ধ হইয়া আমিনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার কাণের লাল পাথরের দুল দুটি এই আলো আঁধারে পড়িয়া ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল;

আমি অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম—আমিনা এত সুন্দর, এত সুন্দর আমিনা ! আমিনা বলিতে লাগিল—'পৃথিবী যে এত সুন্দর, এর আগে আর কখনো ত দেখিনি, ভাই। ভোর বেলা বিছানা ছেড়ে জানলায় দাঁড়িয়ে সূর্য্যোদয় দেখি, আর ভাবি—এত সুন্দর। তার পর সারাটা দিন এদিকে ওদিকে ঘুরি, ফিরি, বেড়াই, সব দেখি, আর একটা আনন্দ বুকের মধ্যে কেবল যেন ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠ্তে থাকে। ঝি চাকরেরা কাজ করে, তাদের দেখে মনে কেমন একটা ব্যথা জাগে, মনে হয়, এদের সব কত অভাব। আর জান ভাই, কাপড় চোপড়, পয়সা যা কিছু হাতের কাছে পাই, ডেকে ডেকে তাদের দান করি, তারা খুসী হয়ে আশীর্ব্বাদ করতে থাকে, আর আমার বুকটা তৃপ্তির আনন্দে ভরে উঠে। রাস্তা দিয়ে অন্ধ-আতুর, গরীব-ভিখারী যে যায় ডেকে এনে খেতে দিই—আর মনে হয় এদের সব কত ভালবাসি। মনে হয় কি, জান যুঁথিদি, যেন এ পৃথিবীতে আমার মত আর কেউ কোন-দিন হয় নি, এত ভাল যেন পৃথিবীকে আর কেউ কখনো বাস্তে পারে নি, পারে না, পারবে না। আর মনে হয় এ ভালবাসা যেন আমি তাঁকে ভালবেসে পেয়েছি; তাই যুঁথিদি, স্বামীর মতন এমন ভাল আর কাউকে বাসা যায় না—না ?"

গায়ে হাতের স্পর্শ অনুভব করিয়া আমিনা হঠাৎ লজ্জা পাইয়া থামিল, এবং মনের উচ্ছ্বাসে তাহার গোপন অন্তরের এই গুপ্ত কাহিনী সহসা প্রকাশিত হইয়া পড়াতে যেন সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আমি তাহা লক্ষ্য না করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। বাহিরের ঐ আলোছায়ায় মাখা সুপ্ত মৌন প্রকৃতি এবং আমিনার উচ্ছ্বসিত ভালবাসার কাহিনীতে আমার প্রাণে একটা গভীর বেদনা জমিয়া জমিয়া উঠিতে লাগিল। আমিনা চলিয়া গেলেও আমি বহুক্ষণ

সেইখানে বসিয়া রহিলাম। পাশের বাড়ীতে শ্রান্ত গলার করুণ ক্রন্দন তখনও এক একবার নীরব প্রকৃতিকে কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। গভীর নিশীথে একটা দারুণ অবসাদের ছায়া ঘুমের বেশে প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—প্রকৃতির এই বিরহ ভাব কেন?

৭ই মার্চ্চ।—কমলার নিকট হইতে আসিতে সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছিল, বাড়ী পৌঁছিতেই মা আমাকে দেরীর কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া চা খাইতে ডাকিলেন। যদিও সে কাজ আমি ওবাড়ী হইতে সারিয়া আসিয়াছিলাম, তথাপি মার স্নেহকণ্ঠের আহ্বানে মনটা কেমন বিকল হইয়া উঠিল, আমি নীরবে বসিয়া চা খাইতে লাগিলাম। টেবিলে মা একলাটি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, আর বাহিরে বারাণ্ডায় দাদা গম্ভীর মুখে পায়চারী করিতেছিল, কিন্তু আমি কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে পারিলাম না, চা খাইয়া নীরবে উপরে উঠিয়া আসিলাম।

মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, ধীরে ধীরে জ্যোৎস্না চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, নিশীথ প্রকৃতি যেন কিসের আবেশে তন্ময় হইয়া রহিয়াছে। আমি বারাণ্ডায় আসিয়া প্রাণ ভরিয়া সে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলাম। পাশের খোলা ছাতে মাদুর বিছাইয়া কে এক জন চড়া গলায় গান গাহিতেছিল, আমি অন্যমনস্ক ভাবে তাহাই শুনিতেছিলাম। কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলাম জানি না, সহসা স্কন্ধে স্পর্শানুভব করিয়া চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম—দাদা। সস্নেহে কোমল কণ্ঠে দাদা কহিল, "একলাটি কেন যুঁই, তোমার বন্ধু আজ আর আসেন নি বুঝি?"

আমি বলিলাম, "আমিনারা পিক্‌নিকে গিয়েছিল, ফিরে আসে নি বোধ হয়। আমি এখানে দাঁড়িয়ে গান শুন্‌ছিলাম।"

"গান! কোথায়?"

—তাই ত, কোথায় গান! কখন যে থামিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারি নাই ত!

দাদা কিছুই বলিল না, নীরবে আমার সঙ্গে ঘরে চলিল।

আলোটা কাগজ দিয়া আড়াল করিয়া দাদা আমার খাটে শুইয়া পড়িল এবং হাসিয়া বলিল, "মাথাটায় একটু হাত বুলিয়ে দাও না যুঁই, অনেক দিন তোমার সেবা পাই নি—"

কি করুণ আবেদন, আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে চাহিল। নিজের চিন্তায় আমাকে এমনি অন্ধ করিয়া দিয়াছে যে, আমার প্রাণের চেয়ে যাঁরা আমার চিরপ্রিয় ছিলেন, তাঁদের কথা আজকাল আর এক দণ্ড আমার মনে পড়ে না। প্রাণপণে চোখের জলকে নিরোধ করিয়া আমি দাদার পাশে বসিলাম। দাদা আস্তে আস্তে কথা বলিতে লাগিল, সে কত কথা, কত রাজ্যের, কত দেশের, কত সব! হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "নরেনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল যুঁই, মাসখানেক থেকে তারা এখানে আছে।"

আমি মনের চাঞ্চল্য অসম্ভবরূপে দমন করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দাদার কথা শেষ না হয়, অন্ততঃ ততক্ষণ মনের এই চাঞ্চল্য গোপন রাখিবার শক্তিটুকু যেন আমার থাকে।

দাদা বলিল,—"তাদের ভারী দুরবস্থা এখন। তার বাবা ত কোনকালেই সংযমী মিতব্যয়ী ছিলেন না, তাই এত বড় জমিদার হয়েও কিছুই রেখে যেতে পারেন নি, তার পর যা ছিল এখন সে সবও নরেনের অমনোযোগিতায় যেতে বসেছে। ও যে কোন কালেই সাংসারিক নয়, হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়, তা'ত জানিই, কিন্তু এমন যে হতভাগা তা কে জানত! কর্ম্মচারীর হাতে ভার দিয়ে নিজে না দেখলে কি জমিদারী

থাকে ! ও কেবল বাবুগিরি করে' আর অপরিমিত খরচ করে' এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, আর ওধারে তার এ তালুক ও তালুক বিক্রি হচ্ছে, নিলামে যাচ্ছে—এমনি সব। সদর খাজানা বাকী পড়ে থাকলেই নিলাম হয়ে যায় কিনা,—নিজে ত দেখে না, কর্ম্মচারীরা যা খুসী করছে।”

দাদা চুপ করিয়া বোধ করি আমার উত্তরের অপেক্ষা করিল, কিন্তু আমি নীরবই রহিলাম, আমার চোখের সম্মুখে পৃথিবী যেন ঘুরিতে লাগিল, তবু আমি মন শক্ত করিয়া মনে মনেই বলিলাম, “কার সম্পত্তি গেল, আর কার বা রইল—তাতে আমার কি ?”

দাদা বলিল, “আমি ভেবে একটা উপায় স্থির করেছি। চুপি চুপি খবর পেলাম তার আরও বড় বড় তিনটা তালুক শীগ্‌গীরই নিলামে চড়বে, তোর নামে সেগুলো কিনে নিই, কি বলিস্ ?”

আমি শান্তভাবে বলিলাম,—“কাজ নেই দাদা, ওসব কথা ভেবে আমাদের কি কাজ ! যার যেমন চল্‌ছে চলুক, যার কপালে যা আছে তাই হবে, আমরা ভেবে কি করব ?”

দাদা অনেকক্ষণ কোন কথা কহিল না, চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল, তাহার পর একটু হাসিয়া বলিল, “তুই ভাবছিস্ লোকে তোকে নিন্দে করবে—না ? কিন্তু কেউ কিছু টের পাবে না, জানিস্ ? যার জিনিষ সেও না।”

“জানিনে দাদা, তোমার যা ইচ্ছে হয় কর, আমি কি বল্‌ব, কিন্তু—”

“কিন্তু কি ?”

“কারো শাপ যেন কুড়িয়ো না ভাই, কেউ যেন আমাদের লোভী বল্‌তে না পারে।”

“পাগল, তেমন কাজ আমি করব !—আর যাতে তোর ন্যায়তঃ

অধিকার আছে, তোর চোখের সাম্‌নে সেটা, যদি শক্তি থাকে, সেটা বাঁচিয়ে রাখতে তুই বাধ্য।"

"ওতে কি বাঁচিয়ে রাখা হয়, দাদা ?"

"নিশ্চয়ই, মনে কর ওদের যদি কখনো এমন দুরবস্থা ঘটে, যে দুটি বেলার আহার যোগাড় করতেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়, তখন তুই তোর এত ঐশ্বর্য্য রেখেও কি চুপ করে বসে তাই দেখতে পারবি ? আমি ত তোর মন জানি বোন !"

দূরে মেঘে ঢাকা অস্পষ্ট আকাশের দিকে আমি চাহিয়া রহিলাম। এত দিন পরে আজ এ আবার কি সব বিস্মৃতির গর্ভ হইতে আমার চোখের সম্মুখে ক্রমে ক্রমে জাগিয়া উঠিতেছে ! এ ছবি যে আমার চির জীবনের কামনার ধন ছিল,—আমার সমস্ত হৃদয় মন্থন করিয়া ভালবাসায় যে উৎস উঠিয়াছিল তাহাতে প্রাণ পাইয়া ফলে ফুলে, লতায় পাতায় এ চিত্র যে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, কুলিশ হস্তের পাষাণ চাপে পড়িয়া কবে সে শতছিন্ন হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। আজ আবার তাহার সেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মলিনমূর্ত্তি কোথা হইতে জোড়া লাগিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল !—যদি আসিয়াছ, তবে এসো। আমার ছিন্ন জীবনের স্মৃতি, আমার অতীতের সোনার স্বপ্ন, আমার জীবন মরণের —আমার ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের একমাত্র নিয়ন্তা, অবাধে আসিয়া আমার সমস্ত প্রাণ মন আচ্ছন্ন করিয়া দাও। আজ আর কোন চিন্তা নয়, আজ আর অন্য কোন কাজ নয়, আজ শুধু তুমি আর আমি—আজ আমি দেবী নই, পাষাণী নই, আমার বিদ্যা মিথ্যা, জ্ঞান মিথ্যা—আজ আমি শুধু নারী—নারী—নারী !

কতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম, জানি না। দাদা যখন সহসা উঠিয়া বসিয়া আমার মাথা তাহার কোলে চাপিয়া ধরিল, তখন সেই

স্পর্শে আমার সহজ জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, এবং আমি আজ আর কিছুতেই আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পাঁচটী বছরের সঞ্চিত বেদনারাশি আজ এই প্রথম অশ্রুর আকার ধারণ করিয়া দাদার স্নেহময় বুকে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

ঝি আসিয়া খবর দিয়া গেল খাবার প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে, মা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। দাদা আমার চোখ মুছিয়া দিয়া হাতে ধরিয়া আমাকে নীচে টানিয়া নিয়া চলিল। শুনিলাম, বাবা আজ আমাদের সঙ্গে খাইবেন না, তাঁহার কোন্ এক মক্কেল আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে তিনি আগেই খাইয়া গিয়াছেন।

১৭

গরম—অসহ্য গরম। তাতে আবার বসন্ত ও জ্বরের যে তীব্র আক্রোশ কলিকাতার উপর দিয়া চলিয়াছে, প্রাণে তাতে আর এককণা সোয়াস্তি নাই। দিন রাত একটা অজানিত ভয়ে বুক কেবল কাঁপে। শ্মশানযাত্রীরা কতবার যে 'বল হরি' হাঁকিয়া চোখের উপর দিয়া চলিয়া যায়, চাহিয়া দেখি, আর হাত পা যেন ঠাণ্ডা হইয়া আসে। কেবল মনে হয়,—কতকাল আর এ বিষম চিন্তার ভার বহিতে বাঁচাইয়া রাখিবে প্রভু, এমনি ভয়ে ভয়ে, এমনি শঙ্কায় আর বাঁচিতে পারি না; প্রভু, সকলের আগে আমায় নিয়ো, আমার আগে কেউ যেন আর না মরে!

সকালে দেখিলাম, একটা কুলী রাস্তার একপাশে পড়িয়া আছে। দ্বারোয়ানকে ডাকিয়া শুনিলাম, লোকটার গায়ে 'মায়ের কৃপা' হইয়াছে, আর সহায়-সম্বলহীন অভাগা কুলীটা যন্ত্রণায় অজ্ঞান হইয়া, ফুটপাথেই পড়িয়া আছে। ক্যাম্বেলে থাকিবার জায়গা আছে বটে, কিন্তু তুলিয়া নিবার লোক নাই! পাহারাওয়ালারা পাশ কাটিয়া কাটিয়া চলিয়াছে, রাস্তার লোকেরাও তাই!

মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি কতটুকু! বিশ্বসংসার জুড়িয়া এই-ই চলিয়াছে, কাহার কথা বলিব! আমার নিজের মনই বা সংসারের আর দশ জন হইতে কত তফাৎ! নিজের মা বাবা ভাই, নিজের বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কার জন্য মন আমার কাঁদে? আর দশ জন লোকে ইহাকে দেখিল না, তুলিল না, আমিই বা কি করিলাম। ইচ্ছা থাকিলেই বা কি করিতে পারি? ধিক্কারে মন পূর্ণ হইয়া গেল।

সারাটি সকাল, কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে কতবার আসিয়া জানালায় দাঁড়াইলাম, লোকটা তেমনি অজ্ঞান, তেমনি নিঝুম!—সহসা, কখন ভাগ্যদেবতা তার সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন, বেলা প্রায় ১১টার সময় একটা মোটর—এ্যাম্বুলেন্স্ আসিয়া লোকটাকে তুলিয়া নিল।

*   *   *   *

চঞ্চল অস্থির মনটা কোনমতে বহন করিয়া, কমলার ঘরটিতে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দুইটা বড় বড় আলমারী খুলিয়া কমলা বই খুঁজিতেছিল, কি একটা বই তার এখনি দরকার, কোথাও সেটা পাওয়া যাইতেছে না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত একরাশ পুস্তকের মাঝখানে মাদুরের উপর আমি বসিয়া পড়িলাম, কতগুলি বইএর নামের উপর একটীবার মাত্র চোখ বুলাইয়া, কবিবর নবীন সেনের কুরুক্ষেত্রখানি হাতে তুলিয়া লইলাম, দুই এক পাতা উল্টাইতেই সহসা চোখে পড়িয়া গেল—

রোগে শান্তি দুঃখে দয়া, শোকেতে সান্ত্বনা ছায়া,
দিদি এই ধরাতলে রমণীর বুক—

মনটা অশান্ত ছিল, তাই ঠিক এই কথাগুলিই বুকের ভিতর বড় জোরে গোটা কয়েক আঁচড় কাটিয়া গেল। আমি বলিলাম 'ও সব ট্র্যানশ্লেট আর মানে আজ থাক কমল, এসো আজ এই বইখানিই পড়ি।' কমলা খুসী হইয়া আলমারী বন্ধ করিয়া আসিল। আমি পড়িতে লাগিলাম—

আমরা নারী,
বিশ্ব জননীর ছবি, আমাদের শত্রু মিত্র নাই,
বরিষার ধারা মত অজস্র জননী-প্রেম
ঢালিয়া সর্ব্বত্র চল যাই,—

বাধা দিয়া কমলা কহিল, "সুভদ্রা কি করে এত কর্ত্তেন ভাই, দিদি? এমনি করে শত্রুকেও অত দয়া, কি করে ভাই সম্ভব হয়?"

মনটা আমার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, বলিলাম "তাঁরা দেবী ছিলেন, সবই তাঁদের সম্ভব হোত, আমাদের মত এত হিংসার জ্বালা ত তাঁদের ছিল না ভাই!"

কমলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল 'তাঁরা দেবী ছিলেন, তাই তাঁরা পারতেন! আর আমরা পারি না, আমি দিদি এ কথা ভাই কিছুতে মান্‌বো না, দেবীত্ব তাঁদের কোনখানটায় ছিল ভাই? চেহারায়? আমাদের মত এমনি হাত পা দেহ কি তাঁদের ছিল না? আরো কিছু বেশী ছিল এ কথা নিশ্চয়ই কেউ বল্‌বে না,—তবে? তবে কি—মনে? তাই যদি হয় দিদি ভাই, আমরাও তবে দেবী হোতে পারি।—'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'বেশ ত, হ'না, সবাই আমরা পূজো করব।'

'দিদি ভাই, ঠাট্টার কথা নয়। তুমি ঐ রোমান ক্যাথলিকদের সিষ্টারদের দেখেছ? কে তাঁদের কাজ দেখে দেবী বলে পূজো করবে না ভাই? তবে, আমাদের কাজে আমরাও কেন দেবী হতে পারব না?'

কমলার জ্যাঠতুত ভাই সুশীল দা আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, 'আজ যা কাণ্ড দেখে এলাম,—তিন তিনটে বসন্ত রোগীকে ক্যাম্বেল থেকে ফিরিয়ে দিলে!'

দুজনে আমরা একই সঙ্গে শিহরিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ফিরিয়ে দিলে!'

'কি কর্ব্বে ? জায়গা আর নেই, সবগুলো সিট ভর্ত্তী হয়ে গেছে, কোথায় আর থাকতে দেবে ?'

আমি আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিয়া বলিয়া ফেলিলাম, 'আহা, ওরা গেল কোথায় ?'

'ভগবান জানেন,—ছটোকে কোথা' চলে যেতে দেখলাম, আর একটা ছোট্ট মেয়ে, তার বুড়ো বাপটাকে নিয়ে রাস্তায় বসে কাঁদছে,—বুড়োটার গায়ে এত বেরিয়েছে ওঃ—তাকানো যায় না।'

আমি বলিয়া উঠিলাম, 'রাস্তার লোকগুলো কি মরে গেছে!' সুশীলদা হাসিয়া বলিল 'বালাই ষাট—মরবে কেন? এই ত আমিও এক জন সেই রাস্তারই লোক ছিলুম।' আমি লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম, সুশীলদা বুঝিয়া কোমলকণ্ঠে কহিল,—'কাকে তুমি দোষ দেবে যূঁথিকা, আমাদের বাঙ্গালীদের অবস্থা যেমন, মনও তাদের হয়েছে ঠিক তেমনি! যারা নিজের সংসারখানি পাল্‌তে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কোনমতে বেঁচে থাকে, তারা পথের লোককে দয়া কর্‌বে—এও কি সম্ভব?—কিন্তু সে অসম্ভবও সম্ভব হয়েছিল যাঁকে দিয়ে, লোকে তাঁকেই এক দিন দয়ার সাগর বলে পূজো করেছিল। বিশ্ব শুদ্ধ মানুষ তাঁরই মত হবে, এও কি আশা করা যায়? তাই যদি হোত, তবে আর দয়ার সাগর বলে সেই এক জনকেই সবাই পূজো করতো না।' আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম,—এত কথার পর কি আর বলা চলে!—সুশীলদা হাসিয়া বলিল 'এমনিতেই নিজের বোঝার আমাদের অন্ত নেই, কেন মিছে পরের ভাবনা নিয়ে এত আবার মাথা ব্যথার সৃষ্টি করা যুঁই ?'

সুশীল দা চলিয়া গেলে, হাতের বইখানি বন্ধ করিয়া কমলা কহিল, "দিদি, একটা কাজ করলে হয় না ?"

'কি ভাই ?'

'এসো আমরা এই বসন্ত রোগীদের জন্য একটা আশ্রম করি।"

আমি মহা বিস্ময়ে চকিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম—'আশ্রম ?'

'আশ্রম।'

'আশ্রম করবে ? তুমি !'

'হ্যাঁ দিদি, আশ্রম, কিন্তু শুধু আমি নই, আমি আর তুমি।'

'কি করে সম্ভব হবে কমল ? একটা আশ্রম চালান, এ কি একটা কথার কথা ? টাকা চাই—যোগাড় চাই, কত কি চাই।'

'চাই বটে, কিন্তু কেন তার অভাব হবে ভাই ?'

'জিনিষটার নাম সত্যি মস্ত বড়, তাই বলে, অল্প স্বল্প টাকায় একটুখানি ছোট্ট করেই কি তাকে নেওয়া চলে না ভাই ? যেখানে বড় নাম আর বড় বড় কাজের আয়োজন, সেখানেই সব পণ্ড হয় দিদি,—বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া, জান ত ?"

'জানি, কিন্তু সেই ছোটটিও ত গড়ে তুলতে হবে ! মুখের কথাতেই ত হয়ে যাবে না সব !'

কমলা হাসিয়া বলিল 'সে ত ঠিক দিদি, বরঞ্চ মুখের কথাটা একটু কম বলাই ভাল। দিদি, আমার প্রায় হাজার পাঁচেক টাকার সাড়ি গয়না আছে, সেটাই মূলধন হোক না, তার পর তোমার বাড়ী ভাড়ায় এই সাড়ে তিনশো টাকাটা, আর এতদিন যা জমেছে সেগুলোও যদি তুমি মাসে মাসে আশ্রমেই দাও, তবু কি তাতে অন্ততঃ দশটা লোককেও পালন করা চল্‌বে না ভাই ?'

আমি তেমনি হতবুদ্ধির মতই বলিলাম 'তাতে দশটা লোকের চিকিৎসা, সেবা, ওষুধ পথ্য—ইত্যাদি, এত সব স্বচ্ছন্দে যোগাড় হয়ে উঠবে ?'

'অত কথা ভাববার কি দরকার দিদি ? বেশী ভাবতে গেলে মনে খালি নিরাশাই জাগবে—অত সব কিছু নাই হোক,—ও রকম করে লোকের শুধু পায়ের ধূলো আর লাথি খেয়ে রাস্তায় পড়ে মর্‌তে ত এদের হবে না, অন্ততঃ আরামে মরতে ত পাবে ভাই।'

মনে আমার অবিশ্বাস এবং নিরাশার অন্ত যদিও ছিল না, তবু বলিলাম, 'বেশ, কি কত্তে হবে কর, শুধু বাড়ী ভাড়ার টাকা কেন, সত্যি যদি কাজ হয়, আমি আরো দেবো।'

উৎসাহে মুখখানি প্রদীপ্ত করিয়া কমলা কহিল, 'আমাদের দিয়ে সংসারে যখন কোন প্রয়োজনই আর নেই, আমরা তবে বিশ্বমানবের কাজেই লাগি। ভাই দিদি, আশার জীবন যাদের, তারাই জমিয়ে রাখে, আমরা কার জন্যে জমাব ? ত্যাগ স্বীকার কত্তে কিসে আমাদের আটকাবে ?'

—হরি, হরি,—এই বালিকাকে আনিয়াছিলাম আমি শিক্ষা দিতে ! দু' পাতা ইংরাজি শিখিয়া, শিক্ষার গর্ব্ব আমার এমনই কি বাড়িয়াছে ? হিন্দুর ঘরের বালবিধবা—কে ইহাকে এ শিক্ষা দিল !

বিকালে চারটার সময় হইতেই ঘনঘটা করিয়া মেঘ করিয়া ছিল, এবং তার পর সারা দিনের এই অসহ উত্তাপকে এক অতি স্নিগ্ধ কোমল বর্ষাধারা নামিয়া আসিয়া ঘণ্টাখানেক বর্ষণের পর শীতল করিয়া দিল।

আকাশে তখন রামধনুর বিচিত্র লীলা, কমলার সঙ্গে ছাতে উঠিয়া তাহারই পানে চাহিয়া রহিলাম। মনটা বড় দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল।

নিজের মনে কি আমার এতটুকু নির্ভরতা নিজের 'পরে নাই! অন্যে আমাকে যে দিকে যে ভাবে পরিচালিত করে, আমার মনের এ লাগাম যে সেদিকেই ছুটিয়া যায়! প্রতি পদে-পদে সংসারে আমার এ কি পরাজয়!

পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, শুভ্রবসন-পরিহিতা ওই বালিকা তপস্বিনীর মুখে কি উজ্জ্বল আলোক! আমাকে ফিরিতে দেখিয়া সে হাসিয়া বলিল, "দিদি, তুমি আমায় পাগল মনে করোনা ভাই, আমার মনের কথা সত্যিই ওই! তুমি ত জান, এই বসন্ত রোগেই আমারও সর্ব্বনাশ হয়েছিল!"

আমি কথাটী না বলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে বলিল, "তোমরা যাকে দুঃখ বল আমার তা নেই, দুঃখে আমার দুঃখ কখনো হয় না, কেবল তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে যুঝতে আমার ইচ্ছে হয়। মা বাবা ভাবেন, দুঃখের আমার আর সীমা নাই, কিন্তু দুঃখ আমার নিজের ত খুব বিশেষ কিছুই মনে হয় না দিদি। কেবল মনে হয়, আমায় কি করে পৃথিবীতে জীবন কাটাতে হবে, সে কথা মনে মনে রেখেই যেন ভগবান আমায় গড়ে তুলেছেন। শক্তি আমায় আপনি খুঁজে বের করে নিতে হবে। শক্তি যদি থাকেই, তবে কেন আমি কিছু পারব না দিদি?"

১৮

"নিদ নাহি আঁখি পাতে,
তুমিও একাকী, আমিও একাকী,
আজি এ বাদল রাতে।

... ...

নয়নে বাদল, গগনে বাদল,
জীবনে বাদল ছাইয়া ;
এসো হে আমার বাদলের বঁধু,
চাতকিনী আছে চাহিয়া—"

বাঁশী না।—কোথায় বাজে! ও ধারের ও লাল বাড়ীটায় কি? আহা, কে গো বিরহী, এই দেড় প্রহর রাত্রিতে বাঁশী নিয়া কাঁদিতে বসিয়াছ! আহা, বেচারী, বেচারী আমার!......আচ্ছা, বাদলার পরের জ্যোৎস্নাটা এত ম্লান কেন? এ যেন কার দীর্ণ-হৃদয়ের হাহাকার আর কান্নায় ভরা! এ কান্না সহ্য হয় না......

কিন্তু, তন্দ্রার মাঝে এ কি স্বপ্ন দেখিলাম! কোথায়, কোন্ এক সুদূরে জ্যোৎস্নালোকিত ক্ষুদ্র কক্ষখানির শুভ্র শয্যায় পাশাপাশি দুইটা হাস্যোজ্জ্বল মিষ্টি মুখ।...উঃ—বাহিরে হাওয়া কি আজ একেবারে বন্ধ? এত গরম কেন!

* * * *

সকাল বেলা বাবার কাছে আশ্রমের কথা পাড়িতেই বাবা হাসিয়া কহিলেন, 'বেশ ত মা, এ ত ভাল কথা। যতীন আর সুনীল যদি

তোদের সাহায্য করে, তা হলে ত ভালই হয়। কিন্তু মা, কমলার ঐ ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বলটা নিয়ে আর কাজ নেই।'

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, 'কেন বাবা? তা'হলে কি করে হবে!'

বাবা হাসিয়া বলিলেন, 'এ বারের এই সোণাগাঁয়ের রাজাবাবুদের মামলাটায় হাজার সাতেক যা পেয়েছি, তোরই নামে তা রেখে দেবো ভাবছিলাম, তা না করে সেটা তোর আশ্রমেই দিয়ে দিই না! কি বলিস্?'

আনন্দের আতিশয্যে চোখ দিয়া আমার জল গড়াইয়া পড়িল, আমি আর উত্তর দিতে পারিলাম না।

বাবা বলিলেন, 'তার পর এ সব কাজে বড় লোকদের সাহায্য বিস্তর পাওয়া যাবে, এ সব বড় বড় কাজে টাকা তাঁরা বেশ দিয়েও থাকেন।'

দাদা বলিল—'হ্যাঁ, দেন বটে, তবে সেটা দানের জন্য ঠিক নয়, নামের জন্যেই শুধু—'

আমিও হাসিয়া বলিলাম,—'তা টাকা যদি তাঁরা দেন-ই, নাম প্রচারও আমরা বেশী করেই কোরব।'

এমনি করিয়া হাস্ত কৌতুকের মধ্যে, বাবার কাছে আরও কিছু আদায় করা গেল, কিন্তু মাকে মত করাইতেই মুস্কিল হইল,—মা ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন 'এমনি করে আশ্রম আশ্রম করে কোথায় কোন রোগীদের মাঝে ঘুরে বেড়ান,—তার পর যদি এমনি করে ও টাকাগুলো এখন খরচ করে ফেলে,—ভবিষ্যতে তবে... ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু প্রাণে যখন প্রেরণা আসে, কোন বাধাতেই তখন আর প্রাণটা আট্‌কা পড়িতে চায় না,—বহুকষ্টে মার মতও আমি করিয়া লইলাম।

দুপুর বেলা একটু শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর করিয়াই কমলার ওখানে গেলাম, —মনের সবখানি জড়তা আজ আমার কোথায় চলিয়া গিয়াছে,—নূতন কাজের ঝোঁকে, নূতন উৎসাহে মনটা আজ সমস্ত বিশ্বের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

গাড়ীতে উঠিবার সময় মা বার বার করিয়া বলিয়া দিলেন,—'শীগ্‌গীর করে ফিরে আসিস্, মিঃ গুহের ওখানে তাঁর মেয়ের জন্মদিনের উৎসবে আজ নেমন্তন্ন করে গেছেন।'

*   *   *   *

অনেক বাদানুবাদ এবং বহু তর্ক বিতর্কের পর আশ্রম সম্বন্ধে সকল কথাই আমাদের ঠিক হইয়া গেল, এবং ডাক্তার সুনীলদা নিজেই চিকিৎসা বিভাগের কর্ত্তা হইয়া উপযুক্ত ডাক্তার নিযুক্ত করিবার ভার গ্রহণ করিল।

আজ আর মনের কোথাও কোন অভাব, কোন গ্লানি নাই। সারা প্রাণে একটা আনন্দ-হিল্লোল বহিয়া যাইতেছিল। বাড়ী ফিরিলে মা যে সাড়ীখানা পরিতে দিলেন, এবং যে ভাবে ড্রেস করিয়া উৎসব বাড়ীতে যাইতে বলিলেন, আমি আজ আর তাহার কিছুরই অন্যথা করিলাম না। কেবলই মনে হইতেছিল—আমি ত নষ্ট হই নাই, আমার নারীজন্ম বিফল হইবে না,—সার্থক হইবেই—সফল হইবেই।

উৎসব বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম, মনে হইল যেন কতকাল পরে আমি আবার আমার সেই অতীত পৃথিবীতে আসিয়া জন্মলাভ করিয়াছি। আশ্চর্য্য, কি করিয়া আমি এই সুদীর্ঘকাল আমার এই চিরপ্রিয় পুরাতন সঙ্গীদের ভুলিয়াছিলাম! কিসে আমাকে এমন করিয়া মোহাবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল! এই আমার স্কুলের সঙ্গীরা, বোর্ডিংয়ের বন্ধুরা,—কোথায়, নূতনত্বের কোন বিষাদ কাহিনী কাহারো দেহে মুখে অঙ্কিত নাই ত! তবে কি আমারই শুধু,—না, না, না, ও একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র, তাহা যত ভোলা যায় ততই মঙ্গল। ভুলিয়াছি, ভুলিয়াই যেন থাকি ভগবান, আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমার নিকটে চিরসত্য হইয়া থাকুক।

—কত দিন পরে—সেই পুরাতন বন্ধুদের স্নেহ-আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাদের আনন্দ-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। সকলের চেয়ে যাহাকে দেখিয়া আমার বিস্মিত চিত্ত অত্যধিক বিস্ময়ে মূক হইয়া গেল, চাহিয়া দেখিলাম—সে মৃণাল—সেই—আমার শৈশব কৈশোরের প্রতিদ্বন্দ্বী,—আমার—না, না, এ কি,—আজ আর এ বিরোধের কথা কেন?

মৃণালকে দেখিলাম, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আগেকার সেই "ন্যাকা আহ্লাদী পুতুলের" মূর্ত্তি এখন আর নাই, রূপের গৌরবে, ধনের গৌরবে এবং বিদ্যার গৌরবেও এখন সে উজ্জ্বল, চঞ্চল, সপ্রতিভ!

প্রকাণ্ড হলের বিদ্যুৎ প্রদীপের অনিমেষ আলো এবং সহস্র কৌতূহলী তরুণ দৃষ্টিকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া আপন মনে সে হাসিয়া বেড়াইতেছে। গাঢ় সবুজ রংএর সাড়ির সঙ্গে লাল সিল্কের ব্লাউসে তাহাকে অতি চমৎকার মানাইয়াছে। পিঠের উপর এলো খোপার তলা দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া, সাড়ির আঁচলখানি সোনার ক্রচে গ্রথিত হইয়াছে, এবং অতি ক্ষুদ্র দুইটী সাদাফুল কয়েকটী লতাপাতায় সংযুক্ত হইয়া সেখানে শোভা পাইতেছে। সাদা পাতলা জুতা দুখানি সবুজ সাড়ির ভিতর হইতে হঠাৎ হঠাৎ মাথা বাড়াইয়া চাহিয়া দেখিতেছে। আমি বিস্মিত মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলাম, আজিকার এ সভাগৃহে এমন উজ্জ্বল, এমন সপ্রতিভ এবং প্রফুল্ল দ্বিতীয়টি ত আর কেহ নাই।

মিঃ গুহ মৃণালের মামা। মামাবাড়ীর এ আনন্দোৎসবে তাঁহারই উপর অতিথি অভ্যাগতের আদর-অভ্যর্থনার ভার বিশেষরূপে অর্পিত হইয়াছে।

আজ মৃণালকে দেখিয়া বহুদিন আগেকার কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িল—সেই বোর্ডিং—সেই আমার মিলিদি—আর সেই মৃণাল!—

"ওমা, এ কে?—যুঁই!—আশ্চর্য্য, কি ভয়ঙ্কর বদলে গেছ ভাই! চিন্‌তে পার?—ওকি! অমন করে তাকিয়ে রইলে যে? ওগো, এ মৃণাল—মৃণাল, বুঝলে? তোমার সেই চিরশত্রু!"

মিহি সুরে এক নিঃশ্বাসে হাসিতে হাসিতে মৃণাল এতগুলি কথা বলিয়া গেল, আমি অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া তাহার কথার প্রতিবাদ করিলাম।

মৃণাল বলিল,—"এসো, তোমাকে আমার মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

সে আমার হাত ধরিয়া তাহার মার কাছে লইয়া গেল। আমি নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি আমার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন, এবং মাথায় মুখ স্পর্শ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মৃণালের কাছে তোমাদের কথা কত শুনেছি মা; দিনরাত ওর মুখে কেবল স্কুলের কথা, বোর্ডিংয়ের কথা। আজকাল ও কলেজে পড়ছে, কিন্তু তবু সেই ছেলে-বেলাকার স্কুলই যেন ওর প্রাণ।"

আমি চুপ করিয়া শুনিতেছিলাম; তিনি আবার হাসিয়া বলিলেন, "তোমার মা কোথায়—চল না, তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আসি।"

আমি মাকে ডাকিয়া আনিলাম, এবং যখন দেখিলাম তাঁহাদের আলাপ বেশ অবাধে চলিয়াছে, তখন একটু পাশ কাটিয়া আড়ালে সরিয়া গেলাম,—জানি না কেন, এত আলো এবং এই হাস্যমুখী রূপসীদের সম্মুখে নিজেকে আজ অত্যন্ত হীন বোধ হইতেছিল।

দেখিলাম, এক কোণে প্রভাদি' তাহার ননদের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছে, আমাকে দেখিতে পাইয়া হাত ইসারা করিয়া ডাকিল, আমি যেন আশ্রয় পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম।

মা'দের গল্প ততক্ষণ বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম মা দাদাকে ডাকিয়া মৃণাল এবং তার মার সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিতেছে।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিল। মুহূর্ত্তে হাস্য পরিহাস, গোলমাল সব থামিয়া গেল। সুসজ্জিতা নীলাকে কাছে নিয়া আচার্য্যদেব তাঁহার জায়গায় গিয়া স্থির হইয়া বসিলেন, এবং পিয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মৃণালের সুধাবর্ষী কণ্ঠ গাহিয়া উঠিল—

"বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা—
বাজে অসীম নভমাঝে অনাদিরব
জাগে অগণ্য রবিচন্দ্র তারা।"

২০

দু’তিন দিন বৃষ্টির জন্য, আমার আশ্রমের আর খোঁজ লইতে পারি নাই, বিশেষ করিয়া তাহারই জন্য আজিকার এই কর্ম্মহীন নীরব মধ্যাহ্নে এই দীন, অভিশপ্ত জীবন আমাকে একেবারে পাগল করিয়া তুলিতেছিল। কিছুই যেন ভাল লাগে না, প্রাণটা কেবলই একটা কিছুর পেছনে মাতিয়া থাকিতে চায়, কিন্তু হুজুগের নেশা বা উৎসাহ কতটুকু সময়ের জন্য? মানুষকে একেবারে ভুলাইয়া রাখিতে পারে এমন কি নেশা পৃথিবীতে আছে!

আজ অনেক দিন পর, একটা কথা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল; মনে হইল, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তেই বোধ হয় এই কথাটা আমার মনে জাগিয়া আছে, কিন্তু এ আঘাত-প্রাপ্ত মনটা কিছুতেই আর তাহাকে আমল দিতে চায় না। জীবনের সঙ্গেই কথাটা আমার জড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু তাহাকে প্রশ্রয় দিলে তাহার দীর্ঘনিঃশ্বাসে আমার নারী-জীবন ভস্ম হইয়া যাইবে। ভাবিতেছি, মুখে যা-ই বলি, এতদূর পরার্থপর কি সত্যই হইয়াছি যে, নিজের জিনিষ পরকে বিলাইয়া দিয়া, নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যে, কিম্বা পরমানন্দে দিন কাটাইয়া দিতে পারিব! আমি ত মানুষ!—কিন্তু আমি তাই চাই, জীবনের সে অভিশপ্ত অংশটাকে জীবন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে চাই। ত্যাগে সুখ আছে, কিন্তু আমি যে আমার দাঁড়াইবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া, রিক্তহস্তে আসিয়া উপস্থিত হইব,—ধরণী আমাকে ঠাঁই দিবে কোথায়? তাহার এই বিশাল বক্ষ আমার এ দুখানি ক্ষুদ্র পায়ের ভর সহিয়া থাকিতে পারিতেছে কই?

আকাশ একেবারে মেঘমুক্ত হয় নাই ; এখন আর তেমন জোর নাই বটে, কিন্তু গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির আর বিরাম নাই। ও পাশের নূতন বাড়ীটার উপর কতগুলি মেয়ে ছাদ পিটিতে পিটিতে তালে তালে গান করিতেছে—এ-ই ওদের জীবিকা। বাস্তবিক, ইহাদের অভাব কত অল্প, আশা এবং আকাঙ্ক্ষাও ইহাদের অপরিসীম নয়। কাজের ভিতরই ইহাদের আনন্দ এবং কাজই ইহাদের জীবন-যাত্রার পাথেয়! কোন কিছুতে ইহাদের অতৃপ্তি নাই, বিরক্তি নাই, স্বাস্থ্যপূর্ণ ঢল ঢল নিটোল যৌবন, আনন্দে যেন উছলিয়া পড়িতে চাহিতেছে,—লজ্জার জড়তায়, ভদ্রতার বাহ্যিক আবরণে, অকারণ সঙ্কোচে মনের উপর গোটাকয়েক বোঝা ইহাদের নাই,—তাই আমাদের যাহা নাই, তাহা ইহাদের আছে, যে আনন্দ আমরা কখনো পাই না, সে আনন্দে ইহারা সদা হাস্যময়ী, সদা প্রফুল্ল।

আমারও কোন কিছুর অভাব ত ছিল না, যাহা চাহিয়াছিলাম, যাহার জন্য আমার সারা প্রাণমন সংসারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও আমি পাইয়াছিলাম, কিন্তু কে জানে ভোগ করিতে পাইলাম না কেন? লোকে বলে ভগবান দয়াল, দাতা—তবে নিজের চেষ্টায় নিজের মান সম্ভ্রম বিক্রয় করিয়া যাহা আমি আমার করিয়া লইয়াছিলাম, তাহা তিনি আবার কাড়িয়া লইলেন কেন? সংসারের কোন্ এক ক্ষুদ্রকোণে, ক্ষুদ্রতর আমি আপনাকে নিয়াই ভুলিয়াছিলাম, সে সুখ তাঁহার প্রাণে সহিল না কেন?—এর বিচার কে করিবে! তাঁহার 'মারে'র কি নালিশ নাই? কিন্তু ওগো বিধাতা, তোমার বিধান আমি নিশ্চয় খণ্ডাইব, তোমার বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াইব, আমাকে তুমি তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া দিয়াছ, কিন্তু, এ সংসারে মাথা তুলিয়া আমি দাঁড়াইবই আমি ডুবিব না। আমি মরিব না, আমি ক্ষুদ্র হইয়া থাকিব না,—থাকিব না।

গলির মোড়ে ও কে ? সুনীলদা' ! হ্যাঁ তাই ত,—আশ্চর্য্য, নিজের কথা মনে হইলে আমি এমনি ভাবে আপনাকে মাতাইয়া তুলি যে, সংসারের কোন কিছু আর চোখে পড়ে না। ছিঃ ছিঃ, ডায়রী খুলিয়া আপনাকে নিয়া বিব্রত থাকিবার সময় আর আমার নাই, আমার এখন অনেক কাজ !

* * * *

সুনীলদা' বলিল, "যূথিকা, অকর্ম্মা বলে চারধারে আমার যথেষ্ট নিন্দে আছে বটে, কিন্তু তুমি আমায় যে যে কাজের ভার দিয়েছিলে, সে সবই হয়ে গেছে, এখন নতুন হুকুম কি, বল।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "অন্যলোকে তোমায় চেনে না, কিন্তু আমি যে তোমায় আবিষ্কার করে নিয়ে কাজও সারিয়ে নিলুম, সে আমারই ভাগ্যি বল্‌তে হবে। যাক্—কি কি হয়েছে শুনি ?"

"যে ছোট বাড়ী দুখানা দেখেছিলে, সে দুখানাই ভাড়া নিয়েছি। মাঝখানের ঐ বাগানটা আর এতটা খালি জায়গা পড়ে আছে বলে দুখানা বাড়ীই স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল হবে বলে মনে হ'ল। সুবিধে সব বিষয়েরই আছে, তবে কি না সহর থেকে খানিকটা দূরে পড়ে গেল এই যা।"

তার পর হাসিয়া বলিল, 'ভাই, একটা আশার কথাও আছে,—"

"কি রকম ?"

"দুটো রোগীও পেয়েছি।"

"সত্যি ?"

"হ্যাঁ, একটা বসন্ত রোগী, আর একটার জ্বর, কাশী ইত্যাদি।"

অসহ্য বিস্ময়ে আমার বুকের সমস্ত রক্ত জমাট বাঁধিয়া গেল। যাহার

জন্য আমার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া নিয়োজিত করিয়াছি, এত শীঘ্র এবং এত সহজে তাহার সফলতা ত কখনো আশা করি নাই, তাই আমার সমস্ত হৃদয় ভক্তি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হইয়া এই কর্ম্মনিষ্ঠ, একাগ্রচিত্ত যুবকটীর সম্মুখে নমিত হইতে চাহিল।

সুনীলদা' বলিল, "এই তিন চার দিন আমি বৃষ্টির জন্য এবং কতকটা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্যও বটে, তোমায় খবর দিতে পারিনি। কিন্তু ও ধারের সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক করে নিয়েছি। ডাক্তার—আমরা তিন জন তো অমনিই আছি, আর বর্ত্তমানে শুধু এক জন মাইনেকরা রাখলেই চল্‌বে—তাই-ই হচ্ছে।"

আমি বলিলাম, "তা হবে না সুনীলদা, টাকার জন্যে আমি কিছু খারাপ হতে দেবো না। টাকার যোগাড় যথেষ্ট হয়েছে এবং আরো হচ্চে। তুমি না হয় নিজের কাজ মনে করে অমনিই খাটলে, কিন্তু তোমার ঐ যে দুই বন্ধু, তাঁরা তা কেন করবেন? লজ্জার খাতিরে করলেও হয় ত মন দেবেন না।"

"তুমি ওঁদের জান না যুঁই, তাই এমন করে বল্‌ছ। তোমার ত্রিশটী কি চাল্লশটী টাকার জন্যে ওঁরা কিছু লালায়িত হয়ে বেড়াচ্ছে না, অমন কর্ম্মচারী ওঁদের নিজেদেরই ঢের আছে। তা, তুমি তাতে আপত্তি কর, বেশ ত, তোমার কাজ ভাল করে চলুক না, তখন একটা কিছু ঠিক করলেই হবে, এই ত সবে আরম্ভ।"

আশ্রম সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়া সন্ধ্যার পর সুনীলদা চলিয়া গেল, আমি অনেকক্ষণ এইভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, প্রাণের মধ্যে যেন কেমন করিতেছিল। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, নূতন এবং মহৎকাজে উৎসাহ আমার যতই হউক না কেন, একাকী বসিলেই সে সমস্ত উৎসাহ কেমন করিয়া ধীরে ধীরে কমিয়া আসে। সমস্ত বিশ্ব

হাতরাইয়াও শক্তি যেন কোথাও খুঁজিয়া পাই না। আমার ভয় করিতে লাগিল,—তাই ত, কেন আমার এমন হয়? কাজ খুঁজিয়া বেড়াইতে-ছিলাম, কাজ ত পাইয়াছি, আজ আর তবে মনের সে জোর নাই কেন? মনে হইল—টাকা ঢালিয়া আশ্রম ত করিলাম, কিন্তু এখন মনের সমস্ত আতঙ্ক, ঘৃণা বিসর্জ্জন দিয়া এই রোগীদের সেবা করিতে পারিব কি? যদি পারি, হয় ত তাহার ভিতরে আমার শ্রেষ্ঠ আশ্রয় আমি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব। ভাবিয়া দেখিলাম, কমলা আমার চেয়ে কত ছোট। অথচ এমন প্রাণখোলা হাসি, কাজ করিবার এমন শক্তি সে কোথা হইতে পাইল? তাহার টাকা নিতে বাবা বারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কান্নাকাটি করিয়া তাহার সমস্ত টাকা আমায় দিয়া গিয়াছে। সে বলে,—"দিদি আমার ভবিষ্যতের জন্য তুমি টাকা নিতে চাও না, কিন্তু মনে কর, যদি কালই আমি মরে যাই, এ টাকা ত পড়ে থাক্‌বে, তাতে টাকাও পড়ে রইল, অথচ দান করবার সুখটুকুও আমি পেলাম না। আর যদি নাই বা মরি, ভবিষ্যতে যদি আমায় অভাবেই পড়তে হয়, তুমি কি আমায় একটু জায়গা দিতে পারবে না দিদি? না হয় তোমার রাঁধুনী হয়ে পড়ে থাকব, চাট্টি ভাত তার বদলে অন্ততঃ তুমি দিয়ো।"

ইহার পর আর তাহার টাকা না নেওয়া চলিল না। দেখিলাম কি অপরিসীম আনন্দে তাহার ক্ষুদ্র বুকটুকু ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার যতখানি ছিল, সমস্ত দান করিয়া আপনাকে রিক্ত করিয়া সে ভরিয়া উঠিল,—কিন্তু আমি কি করিলাম? আমার কতটুকু আমি দিয়াছি? ত্যাগে যে সুখ, তাহা আমি পাই না কেন?—কৃত্রিমতার সুখ কতক্ষণ থাকে!

* * * *

একটা কাল্‌চে মেঘের কবল হইতে বাহির হইয়া চাঁদ খানি মাথার উপর হাসিয়া উঠিয়াছে, অদূরে একটা বিবাহ বাড়ীতে গ্রামোফনে তখন বাজিয়া উঠিয়াছে—

"পিকরাজ কুঞ্জে কুঞ্জে কু উ হু, কু উ হু গায়,—
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ কাঁদে হায়।"

কোথা হইতে এক তোড়া কাগজ আনিয়া দাদা বলিল, যত্ন করে রেখে দে যূঁই, হারাস নি যেন।

কি দাদা?

দ্যাখ না খুলে—

দাদা কাগজগুলি টেবিলে রাখিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু চেহারা দেখিয়াই জিনিষগুলি যে কি বুঝিতে আমার এতটুকু বিলম্ব হইল না, ভীতি-কম্পিত বুকে শিহরিয়া বলিয়া উঠিলাম, "ও আর আমার কাছে না দাদা, তোমার কাছে, তোমারই বাক্সে রেখে দাও, আমি আর এগুলো দিয়ে কি করব!" দাদা একবারটিমাত্র আমার মুখের পানে চাহিয়া, কাগজগুলি তুলিয়া নিয়া গেল।

......হায় রে উপহাস......যে অধিকারের জন্য এক দিন কায়মনে শুধু এই-ই কেবল চাহিতেছিলাম, আজ সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিয়া তার সেই শূন্য ভাণ্ডার শুধু আমার প্রাপ্য হইল! হায় নির্ম্মম বিধিলিপি,—জগতের কোনখানটায় তোমার উপহাস চলিতেছে না? কাল-রাত্রির প্রভাতে সদ্য বিধবার চোখের উপর ফুল হাসে, সূর্য্য উঠে, পুত্রহারার চোখের সুমুখে আলো জ্বলে, উৎসবের বাদ্য বাজিয়া উঠে—চোখে সহ্য হয় না, তবু দেখিতে হয়, বুক জ্বলিয়া যায়, তবু সহিতে হয়,—এ কি প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ, না উপহাস?

যাহা ধ্বংসের পথে চলিয়াছিল, দাদা তাহাই আজ সর্ব্বনাশের পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়া আমায় বাঁচাইতে দিল! কিন্তু এমন করিয়া

বাঁচাইয়া কি হইবে ? অসময়ে কি এক দিন এই বলিয়া ডাকিয়া পাঠাইব, প্রভু আমার, যে জিনিষ তুমি এক দিন শুধু হেলা করিয়াই রাস্তায় ফেলিয়া গিয়াছিলে, তাহাই আমি কুড়াইয়া কত বড় করিয়াছি, দেখ, নিজের কাছে গচ্ছিত মাত্র রাখিয়াছিলাম, আজ তাহাই তুমি গ্রহণ কর, তোমার পুত্রকন্যা, তোমার স্ত্রী খাইয়া বাঁচুক।

......পারিব কি ?—হায় রে সীতা সাবিত্রীর যুগ অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে, পশ্চিমের যে হাওয়াটুকু দেশীয় আবহাওয়ায় মিশিয়া, আমাদের রক্তে মাংসে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে মনের অত উদার ভাবটি আজ আর নাই, ওগো আমার পাষাণ দেবতা, আমি ত দেবী নই, আমি যে নারী !

... ...

কাল কন্যাবিদায়ের সময় আমিনা আমার কাছে আশীর্ব্বাদ চাহিতে আসিয়াছিল, চোখে আমার জল আসিল। কি আশীর্ব্বাদ আমি তাদের করিতে পারি ? আশীর্ব্বাদের যে বাক্য উচ্চারণ মুখে আমি করিব, আমারই কাণে কি তাহা বিদ্রূপ হইয়া বজ্র ধ্বনির ন্যায় বাজিবে না ? মনে তবু কেবল এই কামনা, দিদি আমার, বোনটি আমার যে গৃহে আজ চলিলে ভাই, সেই গৃহেরই লক্ষ্মী হইয়া চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়ো।

* * * * *

আশ্রম, আশ্রম, আশ্রম—মনে খালি দিনরাত এই বাজে। আচ্ছা কাজে কি এত সুখ, সেবায় এত তৃপ্তি ? এক দিন আশ্রমে যাইতে না পারিলে, মনটা চঞ্চল হইয়া উঠে। সুনীলদার চেষ্টায়, সুনীলদার বন্ধুদের যত্নে আশ্রমখানি আমার কি সুন্দর হইয়াছে।

এক জায়গায় কিন্তু মায়ের অবাধ্য আমি কিছুতেই হইতে পারি নাই। প্রথম দিনই যখন আশ্রমে যাই, মা হাতে ধরিয়া বার বার করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, 'তোর কোন কিছুতে যুঁই, আমি আপত্তি করচি না, কিন্তু এক জায়গায় আমার কথা তোকে রাখতেই হবে, বসন্ত রোগীর ঘরে তুই কিছুতেই যেতে পাবি নে।'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'অত প্রাণের ভয় করলে, বড় কাজ করা কি চলে মা?'

মা বলিলেন, 'অন্ততঃ যে ক'টা দিন আমরা বেঁচে আছি,—তার পর তোর যা খুসী করিস, আমরা ত আর বারণ করতে আসব না।'

চোখে জল আসিতে চাহিল, তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম।

২২

—নূতনত্বের নেশা কত দিন থাকে? দুই মাসেই আবার ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি,—দিনের বেলা যতটুকু সময় কাজে থাকি, ততক্ষণই থাকি ভাল,—তার পর বাড়ী ফিরিয়া আবার তেমনি অবসাদ, তেমনি একটা অকথিত বেদনা! জীবনটা আর ভাল লাগে না, এখন একবার জীবনের ওপারটা কেমন, তাই দেখিতে সাধ জাগিতেছে।

—আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই তিথিটি আসিয়াছে! বাড়ীটা, ঘর ক'খানি,—বুকের উপর যেন পাথর হইয়া বসিয়া আমার শ্বাসরোধ করিতে চাহিল, তাড়াতাড়ি সে দিন আশ্রমে পলাইলাম।

দেখিলাম কমলা আমার আগেই আশ্রমে আসিয়া ঘরে ঘরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কাহাকেও পাখা করিতেছে, কাহাকেও জল দিতেছে, কাহাকেও অষুদ খাওয়াইতেছে—দেখিয়া আমার ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা মনে পড়িল। মনে হইল, আমি যাহা কিছু করিতেছি সে সবই সখের কাজ, সখের দান—আমি হৃদয় দিতে পারিতেছি না, অর্থ দিয়াছি মাত্র, কমলা তাহার অর্থ দিয়াছে, হৃদয় দিয়াছে, সর্ব্বস্ব দিয়াছে!—সর্ব্বস্ব দিয়া রিক্ত হইয়াছে, শূন্য হইয়াছে, কিন্তু কাঙ্গালিনী হয় নাই, তাহার সকল শূন্যতা ভগবানের আশীর্ব্বাদে এবং স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আমি সর্ব্বস্ব দিতে পারি নাই, তাই পৃথিবীর সকল শূন্যতা আমার বুকে ঠেলিয়া ভরিয়া উঠিয়াছে। আমি শিহরিয়া উঠিলাম,—তাই ত এততেও যদি শান্তি না পাইলাম, বুক না ভরিল, তবে আর কোন দিন ভরিবে না গো, কোন দিন না!

সুনীলদার কাছে শুনিলাম বসন্তের রোগীটা আজ এ বেলাটাই টিকে কি না সন্দেহ। বেচারার স্ত্রী একটী শিশু পুত্র কোলে করিয়া স্বামীর বিছানার পাশে আসিয়া বসিয়া আছে। পুত্রটী নিতান্ত শিশু, কিছুতেই মাতাকে শান্তভাবে বসিতে দিতেছে না, কাঁদিয়া গোলমাল করিয়া বেচারীকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। ডাক্তাররা এদিকে ওদিকে চঞ্চল পদে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আশ্রমে এত দিনের মধ্যে আজই প্রথম এমন একটা ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিতে বসিয়াছে, সুতরাং সকলেই বিষণ্ণ বিমর্ষ হইয়া নিজের নিজের কাজ দেখিয়া বেড়াইতেছেন। দেখিয়া শুনিয়া আমার হাত পা যেন অবশ হইয়া আসিল, আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

বেলা প্রায় দুইটার সময় সুনীলদা আসিয়া বলিল, "ভাই যূঁই, তোমার আর এখানে থেকে কাজ নেই, তোমার গাড়ী ত রয়েছেই, দরোয়ানকে নিয়ে তুমি বাড়ী চলে যাও।"

আমার কথা বলিবার প্রবৃত্তি বা শক্তি আর ছিল না, তবু আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, "অবস্থা কি ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে? কিছুতে রাখতে পারলে না?"

"চেষ্টার কিছুই ত্রুটী হয় নি ভাই, বরং হাসপাতালে ওর এত যত্ন হত না, কিন্তু কি করব, ফল হোল না! তবু ওর ভাগ্যি বলতে হবে, কুলি হয়েও মরবার সময়টা কিন্তু রাজার মতই যত্ন পেয়ে গেল।"

গভীর বেদনায় আমরা দুজনেই কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলাম। তার পর আমি বলিলাম, "কমলা কোথায়?"

"কমলা ওখানেই আছে। ও থাকুক, ওর মনের জোর আছে, থাকতে পারবে। তা ছাড়া লোকটা এমনি ভাবে ওকে চিনেছে যে ও কাছ থেকে উঠে এলেই ছটফট করতে থাকে। এখন অবিশ্যি জ্ঞান নেই, তবু কমলা উঠে আসবে না।"

আমি রুদ্ধস্বরে বলিয়া ফেলিলাম, 'তোমরা আমায় কি ভাব সুনীলদা। ননীর পতুল, না কি ? ঐ টুকুন মেয়ে কমলা সব পারবে, আর আমি পারব না ! তোমরা তার উপর এত নির্ভর করতে পার, আর আমায় গ্রাহ্যও কর না !'

এক জন ডাক্তার ছুটিয়া ওদিকে যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন, "সুনীল বাবু, শীগ্‌গীর যান, আমি আসছি, বোধ হয়—হয়ে গেল।"

আমি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, রোগীর ঘরে একটা মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ উঠিয়া তৎক্ষণাৎ আবার থামিয়া গেল। আমার পা কাঁপিতে লাগিল, তবু আমি মনকে জোরে ধমক দিয়া সুনীলদার পেছনে পেছনে চলিলাম। মনে মনে বলিতে লাগিলাম—আমি পরাজয় কিছুতেই মানিব না, ভগবান আমাকে হীন করিয়া রাখিয়াছেন সত্যি, কিন্তু তাই বলিয়া মানুষের কাছে ছোট হওয়া চলিবে না। আমারই সমান যাহারা তাহারা আমাকে অবহেলা করিয়া চলিবে ? কমলা যাহা অনায়াসে করিতে পারে, আমাকে তাহা চেষ্টা করিয়া আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে ?

রোগীর শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া কমলা নত হইয়া রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে ; দেখিলাম তাহার দুই গাল বাহিয়া জলধারা ছুটিয়াছে, ডাক্তাররা চুপ করিয়া বসিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন ; সকলেরই মুখ বিষণ্ণ, চোখভরা জল। এই চৌদ্দ দিনে হতভাগ্য এই রোগীটার প্রতি তাঁহাদের মমতা জন্মিয়াছিল, বিশেষতঃ আশ্রমের প্রথম রোগী বলিয়া ইহার জন্য তাঁহারা একটু বেশী যত্ন এবং চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু ভগবান বাদ সাধিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা যাহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল সে এই মুমূর্ষুর মূর্চ্ছিতা বালিকা পত্নী। হতভাগিনী জ্ঞান হারাইয়া তাহার সমুদয় যাতনা

ভুলিয়া গিয়াছিল, আর পাশে বসিয়া তাহার ক্ষুদ্র শিশুটী মায়ের চুল টানিয়া তাহাকে জাগাইতে চেষ্টা করিতেছিল।

আমি মুহূর্ত্তকাল সেখানে দাঁড়াইয়া, শিশুটীকে কোলে তুলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিয়া বাঁচিলাম। বুকের ভিতর ছটফট করিয়া মরিতেছিল, কেমন করিয়া এবং কি দিয়া যে তাহাকে সান্ত্বনা দিব বুঝিতে পারিলাম না।

বাগানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, লতাপাতা ফুল দিয়া শিশুটীর কান্না থামাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু ক্ষুদ্র বালক বোধ করি এই অপরিচিতার মধ্যে কোন সান্ত্বনাই খুঁজিয়া পাইল না, তাই তাহার কান্না বাড়িয়াই চলিল। অবশেষে বহুক্ষণ কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত হইয়া আমার কোলে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

বাদলার আকাশ, অপরাহ্ণের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের কোণে একটা প্রকাণ্ড কালমেঘ ক্রমেই গভীর হইয়া জমিয়া উঠিতেছিল। বাহিরের ম্লান প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তরেও অবসাদের একটা কাল ছায়া যেন ঘনাইয়া আসিতেছিল। কোন কিছু একটা বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত হইতে পারিতেছিলাম না, সহস্র ভাবে মনটা কেমন এলোমেলো হইয়া রহিল। ভাবনা চিন্তার অন্ত নাই, কিন্তু ভাবিতে আর ইচ্ছা করে না,—মনটা যদি অবশ অজ্ঞান হইয়া সমস্ত ভুলিয়া থাকিতে পারিত!

খোকা তখনও ঘুমাইতেছিল। তাহার দিকে তাকাইতেই আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল—আহা দীন অনাথ, কি যে সর্ব্বনাশ ইহার হইয়া গিয়াছে, সে জ্ঞান ত ইহার নাই! আজ ইহার দুঃখিনী মাতা কি করিয়া, কাহাকে নির্ভর করিয়া আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং পুত্রের ভরণ-পোষণ করিবে?

সন্ধ্যার পর সুনীলদার উপর ইহাদের ভার দিয়া আমি বাড়ী ফিরিয়া

চলিলাম। কৃষ্ণপক্ষের তিথি, রাত্রি হইতেই সঘন অন্ধকার আকাশ পাতাল পরিব্যাপ্ত করিয়া স্থির হইয়া আছে। এদিকটায় রাস্তার আলোর সংখ্যাও খুব কম, তাই একেবারে কাছে না আসিলে রাস্তার লোক আর ঠিক চেনা যাইতেছে না, তবু আমি কেমন একটু ভয়ে ভয়ে রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিলাম, এত বড় কলিকাতা সহরে চট্ করিয়া চেনা লোক কেহ—চোখে পড়িয়া যাওয়া কিছু অসম্ভব নয়, কে জানে কখন-কাহাকে-দেখিতে পাই! এ দেখায় আনন্দ ও আতঙ্ক কোন্‌টা বেশী সে বিচারে কাজ নাই, যাহা গুপ্ত, নিজের কাছেও তাহা চিরগুপ্তই থাকুক। আমি যে আর সাধারণ নারীর মত এলাইয়া-পড়া-লতাটি নই, পৃথিবীতে আমি তাহাই প্রমাণ করিব।

খানিক দূরে একটা লোক—বেলফুলের মালা হাঁকিয়া যাইতেছিল, বাবার উপাসনার জন্য তাহারই কয়েক ছড়া আমি কিনিয়া লইলাম।

২৩

সারাটা দিন একলা ঘরে শুইয়া শুইয়া বিশ্ববিদ্রোহী কবির 'দোলন-চাঁপা'খানি পড়িলাম। মাগো, এমনি করিয়া মন ভুলিয়ে-দেওয়া বই বাংলা ভাষায় আর কি আছে, জানি না। এক একটী লাইনে, এক একটী কথায় এই যে বিশ্বের যত বোঝা আজ আসিয়া বুকে আমার চাপিয়া বসিল, কত দিনে,—কতক্ষণে, কি ভাবে তাহা নামিবে! আচ্ছা মানুষ এমন হয় কি করিয়া! এমন করিয়া প্রাণ ঢালা ভালোবাসার বুকে পদাঘাত করিয়া যাইতে পারে মানুষ কোন্ অবস্থায়! কাজে কর্ম্মে, হাসিতে গল্পে মনে আমার কেবলই যে জাগিতেছে,—

—যে পূজা পূজিনি আমি
স্রষ্টা ভগবানে,
যারে দিনু সেই পূজা,—
সেই আজ প্রতারণা হানে!—

হা রে মানুষ, হায় রে অবুঝ প্রাণী, মরীচিকা দেখিয়া তুমি ভুলিয়া যাও, তাই তোমার এমন অবস্থা! মনে পড়ে বোর্ডিংএ এক দিন বেলাদি পুরুষ মানুষের ভালবাসার সঙ্গে মুসলমানের মুরগী পোষার তুলনা দিয়াছিল,—আচ্ছা, সত্যি কি তাই?—

* * * *

মৃণালের মার মনে যে একটা গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল, আমি তাহা প্রথমেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। শুধু তাই নয়, সে দিন এই কথা নিয়াই দাদার সঙ্গে অল্প একটু রহস্যও করিতে গিয়াছিলাম, দাদা বেশ প্রফুল্ল ভাবেই তাহা গ্রহণ করিল।

ইতিমধ্যে মৃণালদের ওখানে প্রায় চার পাঁচ দিন কতগুলি নিমন্ত্রণে

আমাদের যাইতে হইয়াছে, মা বাবা ত তাঁহাদের ভদ্রতা এবং আত্মীয়তায় একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, বিশেষ করিয়া মৃণাল এই ক'দিনেই মার মনে এক বিশাল আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে ! সে কেমন রঙ্গীন সাড়ীখানি পরিয়া, আল্‌তা-মাখা পা দুটিতে সারা বাড়ীখানির তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়ায়,—মার চোখে দিবারাত্রি সেই দৃশ্যই কেবল ফুটিয়া উঠে ! ড্রয়িংরুমে মৃণাল না হইলে গান জমে না, মৃণাল না হইলে হাসি ফোটে না ;—কিন্তু শুধু কি তাই ! পরিবেশনের সময় তাহার সুগোল শুভ্র কর্ম্মনিপুণ হাত দুখানি দেখিলে দেবী অন্নপূর্ণার কাহিনীই মনে জাগিয়া উঠে। মৃণালের নিজ-হাতে-আঁকা চার পাঁচখানা সুন্দর ছবি বৈঠকখানার দেওয়ালে সুসজ্জিত থাকিয়া তাহার অপূর্ব্ব কলানৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। একধারে একটা আলমারী পূর্ণ করিয়া রাশি রাশি বেতের বাস্কেট, রেশমের ফুল ও অন্যান্য জিনিষ রচয়িত্রীর সুনিপুণ কলা-কৌশল ও প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। একাধারে এমন রূপ, এত গুণ যার, তার পিতামাতা না জানি কত সুখী !—শুনিয়া শুনিয়া, আপনার ক্ষুদ্রতা এবং দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া, দারুণ লজ্জা এবং তীব্র মর্ম্মদাহে আমার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইত। হতভাগী আমি, কোনকিছু দিয়াই ত পিতামাতাকে সুখী করিতে পারিলাম না, অধিকন্তু তাঁহাদের ভীষণ দুর্ভাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ, দিনরাত তাঁহাদের চোখের সম্মুখে অটল মূর্ত্তিতে বসিয়া আছি ! হা ভগবান, এই সব হতভাগ্যদের যদি আর কোন কিছু না দিলে, মরণও কি ইহাদের জন্য তোমার খাতায় লিখিয়া রাখ নাই ? সংসারে এমন দুর্ভাগিনী ত অল্প নাই ! কিন্তু, আমি এই কথাটাই যে কিছুতে বুঝিয়া উঠিতে পারি না, আমার শৈশব কৈশোরের প্রতিদ্বন্দ্বী মৃণাল আজ আমার এই দুর্ভাগ্যের দিনেও আসিয়া কেন সুমুখে আবার শনি গ্রহটীর মতোই ফুটিয়া উঠিল !

২৪

সন্ধ্যার পর আজ মৃণালরা এবং আরো কেহ কেহ আমাদের এখানে মার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিবেন। মা আজ তাই ভারী ব্যস্ত। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, দেরী আর বেশী নাই, অথচ এখনো কত কাজ বাকী! তিনটী দিন ধরিয়া যে ফুলগুলি বাগানে জন্মিল, সে গুলিতে গোটা কয়েক তোড়া করিতে হইবে, মালি আসিয়া তিনবার ডাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজকের দিনেই কি রাজ্যের যত অবসাদ আর কুড়েমী আসিয়া শরীরটাকে আমার আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল!

কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম, মালিকে দিয়া রাশিকৃত ফুল, আর কিছু পাতাবাহার উপরে আমার ঘরে পাঠাইয়া, আমি একটু ধীরে ধীরে চলিলাম! খাবার ঘরে মা ও দাদা তখনও বসিয়া কি করিতেছিলেন, মৃদুস্বরে তাঁহাদের কথাবার্ত্তাও কিছু চলিতেছিল, তাহারই কি একটা কথা সহসা কাণে ঢুকিয়া গতি আমার রোধ করিয়া দিল, আমি কম্পিত বক্ষে সিঁড়ির নীচে আঁধার কোণটায় দাঁড়াইলাম।

দাদা বলিতেছিল, "আমি একটু বল্লেই বোধ হয় আমার সঙ্গে আসত, কিন্তু আমার সে সাহস হল না। খানিকটা দূর থাকতেই গাড়ী থেকে নেবে ওধারে ঘুরে সে বাড়ী গেল।"

মা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "না, না, ও সব নিয়ে আলোচনা বাড়ীতে করেই কাজ নেই, কেন মিছামিছি অশান্তির সৃষ্টি করা?"

বাবা তক্ষুণি কোথা হইতে আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং সমস্ত শুনিয়া দাদাকে আস্তে আস্তে বলিলেন, "এ সব নিয়ে যূঁইর সঙ্গে তোর কথা কিছু হয় না কি? ও জানে কি যে নরেন এখানেই আছে?"

দাদা বলিল, "জানে, কিন্তু এ সব নিয়ে কথা বল্‌তে আমি ঠিক সাহস

পাই না, ও নিজে ত কক্ষণো কিছু জিজ্ঞাসা করে না, তাই আমিও চুপ করেই থাকি।”

বাবা খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, “ও যদি সহ্য করতে পারে, ও যদি চায, তবে আমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। আমার বিশ্বাস ওর মনে সারাক্ষণ যেন একটা বিদ্রোহ চল্‌ছে। আমাদের অমত বা আপত্তির কথা ও বোধ হয় খুব ভাবে,—কিন্তু ও সব ত কোন কাজের কথা নয়, ও যদি সহ্য করতে পারে, তবে নরেনকে আনানো সম্বন্ধে আমাদের দ্বিরুক্তি করা উচিত নয়।”

মা বলিলেন, “যা হবার নয় তাই নিয়ে কেন নতুন করে কথার সৃষ্টি করা? ও নরেনকে কক্ষণো সহ্য করতে পারবে না, ওর নিজের কি একটা সুখ-দুঃখ নেই, অপমান নেই? সতীনের ঘরে গিয়ে আজন্মের শিক্ষা আর সংস্কার ছেড়ে মাতাল স্বামীকে সে ভক্তি করতে পারবে? আর তারাই বা তাকে নেবে কেন? নরেনের যদি আজকাল ইচ্ছে হয়েই থাকে ত' সে কিছু নয়, এদের কথার আবার মূল্য কি? আজকাল শুনছি মাতাল হয়েছে, মদ খায়! এখন আর কেন? মিছে শুধু লোকের কাছে আমাদের মাথাটা হেঁট করা কি দরকার? যুঁইও তার কাজ-কর্ম্ম নিয়ে বেশ আছে। না, না, ও সব কথাই তোমরা কেউ তুলো না।”

বাবা গম্ভীর হইয়া ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে লাগিলেন। দাদা খাইতে খাইতে বলিল, “না মা, কোন কিছুই জোর করে বলা যায় না। এও হোতে পারে যুঁইর সঙ্গে যদি নরেনের আবার ভাব হয়, হয় ত তার স্বভাব ভাল হয়ে যেতে পারে, হয় ত দুজনেই সুখী হোতে পারে। যুঁই আমাদের এমন নয় যে, সে সতীনের সঙ্গে ঝগড়া করবে—তবে, যুঁই নিজে মুখ ফুটে কোন দিন কিছু বলবে না, আলাপ আমাদেরই তুলতে হবে। কিন্তু নরেন যুইকে কিছু কম কষ্ট দেয় নি, সে কথা মনে

করে, যদি যুঁই কখনো তাকে ক্ষমা করতে নাও পারে, তবে ও সব আলোচনায়ও ওর কষ্ট হতে পারে।”

মা বলিলেন, “যুঁইর মন জানিনে অবিশ্যি, কিন্তু যা করে ও থাকে তাতে কষ্টই পাই, অনেক সময় লোকের কাছে লজ্জাও পেতে হয়। আমার ঐ ত একটি মাত্র মেয়ে, অথচ তাকেও সুখী করতে পারলুম না, নিজেও সুখী হলুম না।”

বাবা বলিলেন, “তাই ত বলি নিজেদের মান-অপমানের কথা ছেড়ে দিয়ে যাতে ও সুখী হয় তাই কর। ও যদি নরেনকে শ্রদ্ধা করতে পারে, তা হলে নরেনের ঘর, তার ধর্ম্মমত, সবই ও সইতে পারবে,—সতীনকেও বেশী দুঃসহ মনে হবে না। আর যদি তা না হয়, এখন গিয়ে পরে যদি দুঃখ আঘাত পেয়ে আবার ফিরে আস্‌তে হয়, তাতেই বা কি, এ ঘর ত চিরকাল ওর অবারিত দ্বার রইলই। আমি যা কিছু ওর জন্যে রেখেছি, চিরকাল সে তা ভোগ করে যেতে পারবে।”

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না, পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে চলিয়া আসিলাম। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল,—বুকে বালিশ চাপিয়া কোন কিছু ভাবিতে কিম্বা আলোচনা করিতে চেষ্টামাত্র না করিয়া চক্ষু মুদিয়া অসহায়ের মত পড়িয়া রহিলাম।

নীচে ঝির গলার কি একটা উচ্চধ্বনি শুনিতে পাইয়া অবশ মন সহসা চমকিয়া জাগিয়া উঠিল, আমি বিছানায় উঠিয়া বসিলাম।

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—মনের অবস্থা যাই হোক, সেটা স্পষ্ট করিয়া কেহ কখনো ধরিতে পারে না, কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদও কি আমার এত হীন হয় যাহাতে হৃদয়ের দৈন্য প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং আপনার হীনতায় পিতামাতাকেও সমাজে লজ্জা পাইতে দিই! আশ্চর্য্য, সে কথা ত আমি কখনো ভাবিয়া দেখি নাই!—হাতে কেবলমাত্র শাঁখার সামনে

একটি করিয়া চুড়ি, গলায় কিছু নাই, কাণও শূন্য, পরিধানে কালপেড়ে সাধারণ একখানা মোটা সাড়ি। ধনী পিতার একমাত্র কন্যা আমি, কিসের অভাব আমার? কিসের এত দৈন্য? ট্রাঙ্ক বাক্স ভরিয়া ভরিয়া সাড়ি কাপড় আমার পচিতেছে! সে দিনও ত সেই অনাথা বিধবাকে ক'খানা কাপড়ই দিলাম, আর নিজের বেলাই কি আমি এত দরিদ্র! হা ধিক্ হতভাগি, নিজে জ্বলিতেছিস্, জ্বলিয়া পুড়িয়া মর, চারিধারের সকলকে এই জালে জড়াইয়া কি লাভ তোর? বুঝিলাম, এমনি ভাবে আর অধিক দিন কাটিবে না, এবারে আমাকে অভিনয় আরম্ভ করিতে হইবে!

—দাদা আজ আবার এ সব কথা তুলিল কেন? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আমার স্বামী কি খেলার পুতুল যে তাঁহাকে লইয়া সতীনের সঙ্গে কাড়াকাড়ি মারামারি করিতে যাইব! তাঁহার যে মূর্ত্তি আমার অন্তরে আছে, সেখানে তিনি একাকী সর্ব্বময় দেবতা, সেখানে তিনি আমারই, আর কাহারও অধিকার সেখানে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই—সেখানে তিনি আমার, একান্ত আমার। বাহিরে সংসারের গোলমালের ভিতর যখন তাঁহাকে আমি ভাবিতে যাই, সেখান হইতে আমার চিত্ত তাঁহার কলুষ মূর্ত্তি দেখিয়া আঘাত পাইয়া ফিরিয়া আসে। সেখানে ত তিনি আমার ন'ন, তিনি অন্যের স্বামী, তিনি পরপুরুষ! আমার প্রেম কি এত ক্ষুদ্র যে, সেখানে যাইয়া তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে তাঁহাকে কাড়িয়া আনিব!—আবার এইটুকু প্রাণে এত উদারতাও ত ধরে না, যে, আমার স্বামীকে আমারই চোখের সম্মুখে অন্যের ভোগের সামগ্রীরূপে দেখিয়া তাহাও সহ্য করিয়া যাইব! হিংসা স্বার্থপরতার বিষে জর্জ্জরিত করিয়া আমি তাঁহাকে নরকে টানিতেও চাহি না। তার চেয়ে এই আমি যা আছি তাই আমারি ভালো!

—তবু দেবতা, কিছুতে ত চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারিলাম না। এক দিন তুমি আমায় কত ভাল বাসিয়াছিলে,—এক দিন,—যে দিন আমার আমি ভাল করিয়া জানিতামও না, সে দিন যে আমার কুমারী মনকে তুমিই প্রথম ভালো বাসিয়াছিলে! তারপর যখন আমার সংসারত জীবনের সম্মুখে আসিয়া হে আমার আরাধ্য দেব, তোমার ঐ দেবোপম মূর্ত্তিখানি ধরিয়া দাঁড়াইলে তখনকার সে মূর্ত্তি কি আমি ভুলিতে পারি? সংসারের দূরে, সংসার হইতে বাহিরে—আমার গোপন মন্দিরে, সেই তুমিই আমার চিরন্তন প্রভু,—সংসারের কলুষিতায় আর তোমায় না—তুমি ত আমার ভোগের নও, আমার কামের ত তুমি নও প্রভু, ক'বছরে সে ভোগ বাসনা আমার নির্ব্বাণ পাইয়াছে!

কিন্তু তবু, হে আমার গোপন প্রিয়, একটী কথা জানিতে মনে তবু জাগে,—একদিন যে, তোমার প্রাণের প্রথম প্রেম-অর্ঘ্যটুকু আমাকেই দিয়াছিলে, আজ কি আবার তাহা নূতন করিয়া—ছিঃ—

—ছিঃ! আমি কি পাগল হইয়াছি?

ডাক্তারের ইন্‌জেক্‌সনে রোগীর দেহে সহসা একটা বিদ্যুৎ শক্তির ... করে,—আমারও এ যেন তাহাই হইল! কোথা হইতে কি হইল, সে কি করিল, বুঝিলাম না, কিন্তু মনে হইল, আমি আবার ঠিক আগেকার সেই ছোট্ট যূঁথীটিরই মত হইতে পারিব,—নিজের মনের এ ভারবোধ, এ ত কোন কালেই কমিবে না, কেন মিছে চারিদিকে এ অসন্তোষের বীজ ছড়াইয়া দেওয়া! ছিঃ, নারীর জন্ম সংসারে কেবল অশান্তি আর অমঙ্গলের জন্যই কি হয়?

উঠিয়া বসিলাম, এবং ক্ষিপ্রহস্তে ফুলের তোড়াগুলি বাঁধিয়া, ট্রাঙ্ক খুলিয়া কত দিন পরে আজ সাড়ি ব্লাউস পছন্দ করিতে বসিলাম। এক একখানা সাড়ি এক একটা বিশেষ দিনের কথা মনে তুলিয়া দিল, মনকে

ধমক দিয়া শাসন করিলাম। তার পর বহুক্ষণ ধরিয়া আরসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অতি সযত্নে এলো খোঁপাটি বাঁধিলাম। আরসীতে নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া চোখে আমার জল আসিল। কে এক জন কবে এক দিন ঠিক এই সাজটিতে আমায় কি বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছিল,—সে কথাটা মনে পড়িয়া গেল, তখন সাজিতাম সখে, সুখে, আজ সাজিলাম— কি সে?

চোখের জলে হেজলিন স্নো গলিয়া গেল, ট্রাঙ্ক হইতে নতুন খোলা সুগন্ধি রুমালখানিতে মুখ মুছিতে মুছিতে মুখ লাল হইয়া উঠিল। আর এক দিনও সাজিতে গিয়া মুখ এমনি লাল হইয়াছিল, কিন্তু সে চোখের জলে নয়, একটা কথা শুনিয়া!—হায় রে স্মৃতি,—আমি পরাজিত হইয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িলাম!

... ...

মৃণালের মা বলিলেন,—"মিনু ত' কতগুলো গান করলো, যূথিকা এবারে মা, তোমার একটা গান শুনিয়ে দাও। মনে মনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিয়া দাঁড়াইলাম,—মার মনে সত্যসত্যই আজ আর কোন ক্ষোভ রাখিব না, মৃণালের চেয়ে আজ আমি কোন্ অংশে কম? সাজে সজ্জায়, বেশ ভূষায় মৃণাল কি-সে আজ আমার চেয়ে বেশী? মায়ের আমার মুখখানি ভরিয়া আজ গভীর তৃপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে,—আর একটা গান ত শুধু? যদিও অনভ্যাস—তবু তাই হোক। কাহারও মুখের পানে না তাকাইয়া আমি ধীরে ধীরে যাইয়া অর্গান খুলিয়া সুর তুলিলাম—

"—ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু,
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু,—
এই যে হিয়ায় থরথর,
কাঁপে আজি এমনতর
এই বেদনা, এ দীনতা ক্ষমা কর প্রভু!

... ...

কখন যে গলা ধরিয়া চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, টের পাই নাই, সহসা হাতের স্পর্শে চমকিয়া উঠিলাম, দাদা আসিয়া আমার চেয়ারে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গান শেষ হইতেই সে আমাকে চুপি চুপি বলিল,—"থাক, আর গাইতে হবে না, উঠে আয়।—লজ্জায় ধিক্কারে সর্ব্বদেহ আমার কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, চোখের জল এতই যদি অবাধ্য, অসভ্য, এ বিষাদের গান তবে ধরিয়াছিলাম কেন? উৎসবের দিনে আনন্দের গান কিছু কি আর ছিল না? বাহিরে আসিয়া দাদা বলিল,—"যা দিদি, উপর থেকে মুখটা ধুয়ে আয়, তুই ফিরে এলে, সবাইকে খেতে বসাব।"

মিনিট দশেক বাদে উপর হইতে যখন ধার-করা হাসি নিয়া ফিরিয়া আসিলাম, দেখিলাম, দাদা সুনীলদাকে মৃণালের দাদার সঙ্গে আলাপ করিতে দিয়া নিজে কোণের দিকে একটা জানালার পাশে দাঁড়াইয়া মৃণালের সঙ্গে নিভৃত গল্পে মত্ত।

আজিকার অভিনয় বোধ করি মন্দ হয় নাই, এমনি করিয়াই চালাইতে হইবে,—যত দিন দেহ মন চলে—তার পর?—তার পর কে জানে—কি হইবে! যে অনন্ত রাত্রির কালো আঁধার ধীরে, অতি ধীরে সুমুখে নামিয়া আসিতেছে, তাহাতে হে আমার পাষাণ প্রভু,—আমার—আমার,—এ তাপেভরা দেহের রেখাটিও তুমি লোকের অগোচরেই সংসার হইতে মুছিয়া নিয়ো।

কিন্তু, কিন্তু এত শিক্ষাতেও কি মন হইতে দ্বেষের চিহ্নটুকু গেল না? প্রস্তুত ত ছিলাম, তবু এ কি ব্যথা!

এ সাজ সজ্জা, এ হাসি খুসি গান বাজনার অন্তরালে কি দীন হৃদয়খানি যে বহিয়া চলিয়াছি, তা আমিই জানি। প্রাণ চাহে নগ্ন হৃদয়, তাই এ অভিনয়ের আবরণে চাপা পড়িয়াও এক একবার যে সে মাথা তুলিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিতে চায়, ইহাকে আমি কেমন করিয়া আর কত দিন ঠেকাইয়া রাখিতে পারিব ?

জীবনে অনেক কিছু করিবার ছিল, কিন্তু ঐ একটি ঘটনাতেই সমস্তখানি জীবন কি যে গোলমালে জড়াইয়া গিয়াছে, জানি না, আজ তাই যা কিছু করিতে যাই, যা কিছু ভাবিতে যাই, সকলেরই মধ্যে সারাসৃষ্টির সহানুভূতি পড়িয়া আমাকে পাগল করিয়া তোলে।—নাঃ, একেবারে অসহ্য,—বকুনি সহ্য হয়, মার খাইয়া তাও সহা যায়, কিন্তু এ সহানুভূতি কিছুতেই সহিতে পারি না। ইহার কাছে পরিত্রাণ পাবার বৃথা আশায় কেন নূতন করিয়া আবার এ ফাঁদে পা দিলাম ?

কথার সৃষ্টি করিব আর কত? নিত্য নিত্য নূতন কথা কোথা হইতে আর আমদানি করিব ? আজকাল এত তুচ্ছ, এত ক্ষুদ্র হইয়াছি যে, মুখের কতগুলি বাজে কথায় আমার মূল্য মানুষে ঠিক করিয়া নেয়।

আজই যদি এ অবসাদ, তবে সম্মুখে যে দীর্ঘ দিন পড়িয়া আছে কেমন করিয়া তাহা পার হইয়া যাইব ? আলো নাই, উৎসাহ নাই, জীবনে জীবনীশক্তি নাই, পাথেয় নাই,—কি তবে আছে ! যাহা আছে, সে মায়ামরীচিকায় আমার প্রাণের ক্ষুধা মিটে না গো মিটে না,—আমি তবে কি করিব ?

২৫

কথায় বলে 'স্বভাব যায় না মলে, ইল্লৎ যায় না ধুলে'। তাই দেখিয়াছি, যত চেষ্টাই করি না কেন, মনের ক্ষুদ্রতাকে কিছুতেই দূর করিতে পারি না। মৃণালকে নিয়ে দাদার সঙ্গে তত দিনই সহজভাবে রহস্য করা চলিয়াছে, যত দিন না আসল কথাটি স্পষ্ট করিয়া জানিয়াছি। আজ দাদা যা-ই মন খুলিয়া সত্য কথাটি প্রকাশ করিয়া বলিল, অমনি সকল রহস্য, সকল হাসি কর্পূরের মত কোথায় উড়িয়া গেল। আশ্চর্য্য,—মনে হইতেছে ইহার চেয়ে দাদা যদি একটা মেথরাণীকেও বিবাহ করিয়া আনিত তাহাকেও বোধ হয় আমি বরণ করিয়া গৃহে তুলিতে পারিতাম। কিন্তু মৃণাল,—না, না, না,—অসহ্য।

দাদা আমার মত জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া বলিয়াছিল, "দেখ যুঁই, মা বাবার যত ইচ্ছাই থাক্, তোর অমতে কখনো আমি এ কাজে হাত দেবো না। সংসারে আমাদের আর ভাই বোন নেই—মা বাবা আর কদ্দিন! তার পর আমরা দুজনেই চিরকাল দুজনার থাক্‌ব,—আমাদের এই অক্ষুণ্ণ ভালবাসায় কেউ যদি হাত দিতে আসে, সে আমাদের কারুরই সইবে না। তাই, এমন এক জনকে আনা চাই যার ব্যবহারে, শিক্ষায় আমাদের কখনো দূরত্ব কিম্বা হিংসা দ্বেষ আস্‌তে না পারে।"

দাদা মুখে এ কথা বলিল বটে, কিন্তু মৃণাল যে তাহার মনে আজকাল কতখানি আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে, তাহা কি আমি জানি না! আজ যদি আমি নিষেধ করি, কখনো সে মৃণালকে বিবাহ করিবে না, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার জীবনের সুখ শান্তিকেও চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে হইবে। কি কাজ,—ব্যর্থ প্রেমের যে আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া

আমি মরিতেছি, সে আগুনে দাদার মন, দাদার সংসারও কি পোড়াইব! ওগো ভগবান, অতখানি ক্ষুদ্রতা আমার মনে প্রবেশ করিতে দিয়ো না! জীবনের এ যে কত বড় একটা পরীক্ষার সময় আমার আসিয়াছে তাহা এবারে আমি বেশ বুঝিতেছি। মৃণালের সঙ্গে কোনকালে আমার বনিবনাও হইবে না, এবং সে এ গৃহের কর্ত্রী হইয়া আসিলে এত সাধের এই চির নির্ভর আশ্রয়টুকুও আমার হারাইয়া যাইবে। তাই ভয় হইতেছে মনের কখন কি অবস্থায় কে জানে কোন্ কথা বলিয়া বসি! কিন্তু না, না,—সাবধান, সাবধান, আমার বুক ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া যাক্, তবু একটী কথা আমি বলিব না।

দুই পক্ষ হইতেই সবই এক রকম ঠিক হইয়া গিয়াছে। ১৮ই আষাঢ় 'এনগেজ্মেণ্টের' দিন—মা বাবার কত স্ফূর্ত্তি, কত আনন্দ! আর দাদার বুকে যে প্রেমের কি পুলকনর্ত্তন চলিয়াছে তাহাও কি আমি বুঝিতে পারি না? অভাগী আমি কেন এ আনন্দে যোগ দিতে পারি না! মৃণাল আমার যত শত্রুই হোক, সে নারী, নারীজন্মের এ প্রেমাহুতিতে সে আপনাকে বিসর্জ্জন করিতে পারিবে—তা আমি জানি। দাদাকে সে ভালবাসিতে পারিবে, সুখী করিতে পারিবে—তাহা হইলেই হইল। তাহার কর্ত্তব্য সে করুক, সুখী করুক এবং সুখী হউক, আর কিছু আমি চাহি না।

দাদা প্রতিদিন আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "যুঁই তোর হাসিতে প্রাণ দেখতে পাই না কেন! আমার যেন কেমন মনে হয়! কিন্তু তুই সুখী না হলে আমিও কোন কালে সুখী হব না!"

শুনিয়া আমার কান্না আসে, তথাপি হাসিয়া বলি, "দাদা, তুমি কি আমায় হিংসুটে মনে কর ভাই, যে, তোমার আনন্দে আমার কষ্ট হইবে? তোমার সুখেই যে আমার সুখ।"

দাদা বলে, "তাই হোক্ বোন্, আমার সামান্য সুখের জন্য তোর চোখে যেন কখনো জল না আসে। আমরা এত দিন যেমনটী ছিলাম চিরকালই তাই থাকব, যে আস্‌ছে সে যেন এ আনন্দে আনন্দই বাড়ায়, তার সঙ্গে যেন অশান্তি না আসে।"

আমি মনে মনে বলি,—মনে আমার যাই থাক্ দাদা, তোমার সংসারে আগুন আমি নিজে কখনো জ্বালাব না, সে লক্ষণ যদি কখনো দেখি, তার আগেই আমি সব ছেড়ে পালাব।

২৬

আকাশ ভাঙ্গিয়া শ্রাবণের ধারা নামিয়াছে। পাশের বাড়ীর সেই একতলার টিনের ছাতটির উপর সেই আমার চিরপুরণো বর্ষার রিণিকি ঝিণিকি নাচ,—বছর বছর ত এই একই সুর, একই ধ্বনি, তবু এই ক্ষত বিক্ষত পরাণখানি আমার এ সুরে নিত্যই নতুন ঘা কি করিয়া খায়!

গভীর রাত্রি, দরজা জানালা বন্ধ করিয়া একাকী বসিয়া আমি বৃষ্টির এই কি জানি কেমন মোহে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। রাজার সুদর্শনার মত আমারো কাণে, আমারই জানালার তলায় এ কি আমারই প্রভুর অভিসারের রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে গো!

দাদার এনগেজমেণ্ট, বিবাহ, সবই হইয়া গেল। উৎসবের আনন্দে বাড়ীতে যখন সবাই ভরপুর, বাবাকে নিয়া কদিন তখন কি রাতই আমার কাটিয়াছে!

সুস্থ সবল দেহ মানুষ,—অসুখ বিসুখের কোন বালাই দেহের কোথাও নাই,—হঠাৎ রাস্তায় মোটরে মোটরে এ কি কলিশন! সেই যে অজ্ঞান অবস্থায় সকলে ধরাধরি করিয়া বাবাকে উপরে তুলিয়া আনিল, আজ অবধি আর ত তাঁর জ্ঞান হইল না! কিন্তু বিবাহের দিন ত আর ফিরে না!—ফিরিলও না, বিবাহ হইয়া গেল। মার মনের সাধ মিটিল, বধূ বরণও হইল, কিন্তু হাসিতে গিয়া মার চোখে যে জল আসিয়া পড়িল শুধু আমিই তাহা দেখিলাম।

দাদা আসিয়া বলিল, 'যুঁই, কেমন করে এমন হোল ভাই, এ কি অলক্ষণ? ডাক্তার ত আশার কথাও বলে না!'

উত্তর দিলাম না, কি উত্তর দিব ?—অলক্ষণ কি ? কিন্তু—ছিঃ—

দাদা চোখের জলে ভাসিয়া কহিল, 'বাবা ভাই ওকে চেয়েও একটীবার দেখ্‌লেন না !'

আমি রুদ্ধস্বরে কহিলাম, 'তাতে কি, সেরে উঠুন, দেখবেন।'

'—আর সারবেন—'

দাদা চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। কেন এমন হইল! মস্তিষ্ক বাবার এ কেমনভাবে ঘুরিয়া গেল, যা আর ঠিক হইতে পারে না! দেহের মনের শক্তি সব উড়িয়া গিয়াছে, বাবার এই মুদিত-নয়ন মুখখানির পানে আর তাকাইতে পারি না ! তবু ত উঠি, বসি, নড়ি চড়ি, বাবার সেবার যা করিতে হয় সবই করি,—কিন্তু মাকে ত কিছুতে বিছানার পাশটী হইতে তুলিতে পারি না ! কোথায় আজ নববধূ লইয়া তাঁহার আনন্দ করিবার দিন, আর আজ এ কি—

মৃণালকে দেখিয়া আজ কষ্ট হয়, বেচারী যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। মা বলিলেন 'ওকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কেন মিছে এ গোলমালে পড়ে বেচারী কষ্ট পাবে।'

দাদা বলিল—'না,—গোলমালে পড়ে আবার কষ্ট পাওয়া কিসের মা! সেবা করুক না বাবার,—হয় ত এ সুযোগ জীবনে আর পাবে না!'

দাদা আর কিছু বলিতে পারে না, গলা ধরিয়া আসে, চোখ ভাসিয়া যায়, আর ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়ে।—

মোটরের ঐ ভেপুটা কোথায় ? আমাদেরই বাড়ীর কাছে কি ?—

ডাক্তার আসিবার সময় ত হইল—যাই।

২৭

জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হইয়া গেল।

আচ্ছা, আজ কত তারিখ? কে জানে, দিন তারিখ সব ভুলিয়া গিয়াছি, অতীতের সঙ্গে সঙ্গে জীবনটা এম্‌নিভাবে ফাঁকা হইয়া গিয়াছে, যে, এতটুকু কোন কিছুও যেন আর মনে রাখিতে পারি না!

দাদার বিবাহের পর ক'দিন বা আর কাটিল, কিন্তু এরি মধ্যে—মাগো, এ'রি মধ্যে সব শূন্য, সব শেষ! এত বড় বাড়ীখানি হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে, ভাদ্রের কাঁদুনে-হাওয়া এক জানালা দিয়ে ঘরে ঢোকে, আর ঘরময় ছুটাছুটি করিয়া, কি যেন খুঁজিয়া, আবার অন্যপথে বাহির হইয়া যায়।

ঘরে আজ নব-বধূ, কিন্তু কে চাহিয়া দেখিবে!—ঘরে আমার মা নাই, আমার বাবা নাই,—দুজন মানুষ নাই, দুজনে তাহারা কতটুকু জায়গাতেই বা থাকিত। তবে, সারাটি পৃথিবী ঘুরিয়া একি শূন্যতা দেখিতেছি!

বাবা যে দিন গেলেন, অন্ধকার ঘরে সে দিন মাটিতে জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম, ও দিকে মাকে যে আমার, মহারোগে ধরিয়াছে, তাহা ত তখন জানি নাই! মা যে তাঁর শেষ শয্যায় শুইয়াছেন, সে কথা ত তখন শুনি নাই। যখন শুনিলাম, পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া মার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম।—মা, মা, কোথায় তুমি যাবে! আমি ত দেবো না,—মা, মা, মা, ওমা—ও মা-গো—

কিন্তু হায়, মা আর কথা কহিলেন না!—রক্ত-পিপাসু, রাক্ষস ভগবান, তোমাকে বলিবার আর আমার কিছুই নাই!—

দাদা সে দিন পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—'এ শূন্য বাড়ী ত আর সহ্য হয় না যূঁই, চল্লুম আমি পিসিমাকে আনতে !'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম, কথা বলিতে সাহস হয় না, গলা ধরিয়া কান্না আসিয়া পড়ে। বুকে কি কম কান্না জমিয়া আছে ? সারা জীবন ভরিয়া কাঁদিলেও এ কান্নার আর শেষ হইবে না।—সত্যিসত্যি সে দিন রাত্রে দাদা চলিয়া গেল,—চাহিয়া দেখিলাম, পরিধানে সেই একখানি ধুতি, গায়ে সেদিনকার সেই গেঞ্জি, ময়লা হইয়া সেটা কালো রং ধরিয়াছে, কিন্তু কেহ তাহা ছাড়াইয়া দিতে সাহস পায় নাই—বিশ্ববিজয়িনী মৃণালের সমুদয় শক্তি দাদার এই অভেদ্য শোকের বর্ম্মে ঠেকিয়া, পরাজিত হইয়া গিয়াছে।—আমিও দেখিলাম, কিন্তু কিছু বলিতে পারিলাম না। দাদা বাহির হইয়া গেলে দ্বরোয়ানকে তাহার সঙ্গে যাইতে বলিয়া রুদ্ধগৃহে একাকী মাটিতে বুক চাপিয়া, উপুর হইয়া পড়িয়া রহিলাম—বড় জ্বালা, বড় জ্বালা এই বুকটায় !—

* * * * *

পিসিমার কথা ভাবিয়া একটু ভয় হইল, হিন্দুর বালবিধবা, আজীবন কাশীবাস করিয়াই তাঁর অভ্যাস, কচিৎ কখন এখানেও আসিয়াছেন বটে, কিন্তু মা সযত্নে তাঁর সকল শুচিতা সাবধানে রক্ষা করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন, আজ আমরা কি তাহা পারিব ? আজ ত এ গৃহে শুধু আমি নই, মৃণাল—কে জানে মৃণাল কি আমাদের মত পিসিমার সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবে ! পারি না ভাবিতে...পিসিমা আপনি আসিয়া তাঁর সকল অধিকার স্বহস্তে তুলিয়া লইবেন, মৃণালের বলিবার আর কি থাকিতে পারে !

২৮

—স্বপ্নের ঘোরে তিনটি মাস কাটিয়া গিয়াছে।—দু'বেলা দাদা কান্নাকাটি করিয়া, টানিয়া তুলিয়া, দু'টি ভাত নিজের হাতে মুখে তুলিয়া দিয়াছে, আর রাত্রিটা পিসিমার বুকে মুখ লুকাইয়া কোন মতে পড়িয়া রহিয়াছি। এ মুখ কি কাহাকেও আর দেখাইতে পারি ? হায়, আমার এ কি হইল !

সেদিন সুনীলদা আসিয়া বলিল, "ভাই যুঁথী, তোমার আশ্রম, কিন্তু তুমিই যদি এমনি ভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাক, আমরা তা হ'লে কি আর করিতে পারি ?"

দাদা আসিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া বলিল, "দিদি সবই গিয়াছে, তোর মুখের হাসিটুকুও যদি যায় তবে ত আমি আর পারি না ভাই। এত বড় সংসার কার জোরে চালাই ?"

সবই বুঝি,—বড় হইয়াছি, বুদ্ধি হইয়াছে, বুঝিব না কেন ? সংসারে যে মহামূল্য বস্তু আমরা হারাইয়াছি তাহা পৃথিবী উলট পালট করিয়া খুঁজিলেও ত আর পাইব না ! মনে আজ দুঃখ হইয়াছে, কত দিন আর এ দুঃখ থাকিবে ? অসহ্য বেদনা মানুষের ক্রমে সহিয়া আসে, ইহা ত সর্ব্বদাই দেখিতেছি,—আমারই কি সহিবে না ?

বহুদিন পর সে দিন সকালে স্নান করিয়া, নীচে নামিয়া চলিলাম, কিন্তু এ কি, কেবলই অকারণে চোখ যে জলে ভরিয়া উঠে ! সিঁড়ি কিম্বা দোতলা ও একতলার ঘরগুলির কোন দিকেই যে চাহিতে পারি না,—এমন ব্যবস্থা কে করিল গো ? ওগো, আমার মায়ের সাজান ছবিতে, সাজান ফুলের টবে, ঘরগুলির ভিতরের খাট পালঙ্ক টেবিলের
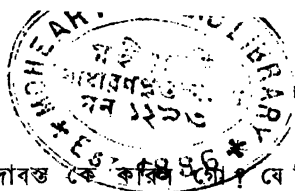
এমন সব নূতন বন্দোবস্ত কে করিল গো? যে জিনিষ নিজে আমি কোন দিন নাড়িতে সাহস পাই নাই, সে সব জিনিষ এমনভাবে নূতন করিয়া কে সাজাইল? এমন সাহস কার?—আমার বুকের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু—হঁ্যা, ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এ বাড়ীর নূতন কর্ত্রী যে এক জন আসিয়াছে! কোন দিকে না চাহিয়া নীচে নামিয়া চলিলাম, দোতলার ঘরে দু'তিন জন নূতন লোককে যেন বসিয়া গল্প করিতে দেখিলাম—কে এরা!—কিন্তু—না, থাক্!—

পিসিমার হবিষ্যঘর বরাবরই আমাদের সকলের ঘর হইতে পৃথক্ করা ছিল। সেখানে দালানে বসিয়া পিসিমা মালা জপিতেছেন, ঘরের ভিতরটা ধোঁয়ায় ভরিয়া উঠিয়াছে, দরজাটা তাই ভেজান রহিয়াছে। আমি চুপ করিয়া সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া রহিলাম, কাছে সরিয়া যাইতে সঙ্কোচ বোধ হইল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আমার উপর চোখ পড়িতেই পিসিমা চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং কাছে আসিয়া সস্নেহে মাথায় আমার চুমু খাইয়া হাত ধরিয়া উপরে টানিলেন। পিসিমার সঙ্গে এত দিনের মধ্যে এই আমার সহজ ভাবে প্রথম কথা বলা। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঘরে যেতে পারব?"

"পার্বি মা, পারবি, তোদের দূরে রেখে কি আমি বাঁচতে পারি মা?"

পিসিমার কথা ধরিয়া আসিল, আমি আর যাইতে পারিলাম না, দুই চোখ দিয়া অনর্গল ধারে জল ঝরিতে লাগিল, বহুক্ষণ দুজনে বসিয়া কাঁদিলাম। ঝি আসিয়া একটা ধামাতে কিছু চাউল, আর একটায় কিছু ডাল, কয়েকটা আলু পটল ইত্যাদি রাখিয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও কি?"

পিসিমা বলিলেন, "আমার জন্যেই দিয়ে গেছে।"

"এমনি করে!"

"আর আবার কি করে দেয় ?"

আমার মনে পড়িল, আগে পিসিমা যখন আমাদের এখানে আসিতেন, সংসারের এ সমস্ত জিনিষের ভার মা সসম্মানে তাঁহারই হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিজে শুধু আদেশের প্রতীক্ষা করিতেন, আর আজ তাঁহারই ঘরের বধূ আমার পিসিমাকে নিজের হাতে মাপিয়া জিনিষ তুলিয়া দেয়! নবাগতার কর্ত্তৃত্বের এই অসমসাহসিকতার পরিচয় পাইয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম! এইটুকু তেলে পিসিমার রান্না হইবে! এই এক ফোঁটা ঘি!

উনুন জ্বলিয়া যাইতেছিল, পিসিমা তাই ডাল ভাত চড়াইয়া দিয়া তরকারী কুটিতে বসিলেন, আর আমি দরজার ধারে বসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম। চারিধারের বন্দোবস্তে আমার শোক পর্য্যন্ত আজ দূর হইয়া গেল, আমি কেবল নিতান্তই অপরিচিতের ন্যায় নীরবে নতুন সংসারের নতুন কাজের পানে চাহিয়া রহিলাম।

দিন দুই তিন এম্‌নি করিয়া, চারদিক শুধু লক্ষ্য করিয়াই কাটাইলাম, দেখিলাম স্বহস্তে মৃণাল ভাঁড়ার বাহির করে, ভাঁড়ার গোছায়, অতিথি অভ্যাগতের ব্যবস্থা করে, রুগ্ন ঝি চাকরের পথ্যের খোঁজ লয়; এত অল্প সময়ে, এত সহজে, এমন সুন্দরভাবে এ বাড়ীর সমস্ত নিয়ম মৃণালের আয়ত্ত কি করিয়া হইয়া গেল ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম, কিন্তু একটা যাহা কিছু দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলাম,—তাহা তাহার ঐ সঙ্কোচলেশ-হীন কর্ত্তৃত্বের স্বভাবটুকু! তাহার হাঁটার ভঙ্গিতে, তাহার হাসিতে, তাহার কথায় অত্যন্ত একটা স্বচ্ছন্দগতির মাঝেও যে একটা কর্ত্তৃত্ব-প্রিয়তার ঝাঁজ,—বোধ হয় তাহারও অজ্ঞাতে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠে, আমি কিছুতেই তাহা সহিতে পারি না।

কথাটা নিন্দার নহে, শ্বশুরগৃহে আসিয়া, শাশুড়ীহীন সংসারে

এমনি করিয়া সুশৃঙ্খলা বিধান করিয়া চলা নারী-জীবনের একটা কত বড় কাজ।

নিজের জীবনে তাহা বুঝিতে পারি নাই বটে, কিন্তু অনুভব করিবার ক্ষমতাটুকু ভগবান দিয়াছেন। ভয় পাইয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, কেমন করিয়া আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব, শুদ্ধ মা বাবা ত মাত্র চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সংসারের সকল কাজ ত তাঁহাদের সঙ্গে যায় নাই! কি করিয়া আবার আমি মায়ের আমার, এই পরিত্যক্ত কাজে হাত দিব, কিন্তু, মৃণাল আপনি আমায় সে ভাবনা হইতে অব্যাহতি দিয়াছে, বাঁচিয়াছি, আমি বাঁচিয়াছি—কিন্তু যেখানে সে আমার উপর, আমার পিসিমার উপর তাহার গৃহিণীপণা চালাইতে যাইবে, সেখানে আমি ত কিছুতেই তাহাকে সহিব না।

সন্ধ্যার পর দোতলা দিয়া নামিবার পথে শুনিলাম, বিন্দি ঝি বিছানা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিতেছে,—'অমনি করে পিসিমাকে তুলে দিয়ে আস্‌লে দিদিমণি বড্ড রাগ করেন বৌদি!'

'আবার কি করে তবে দিতে হবে? কেন, কিছু বলেছেন না কি?'

'না, বলেন নি, তবে মা নাকি অম্‌নি করে দিতেন না,—'

মা যা কর্ত্তেন, তাই-ই যে করতে হবে, তার কি মানে কিছু আছে? কেন, একলা মানুষ পিসিমা, যা দিই, কোন দিন কিছু কম ত তার হয় না; বরঞ্চ পিসিমা বলেন, বৌমা, অত আমার দরকার কিছু নেই, কেন মিছে নষ্ট হোতে দাও!

ঝি বলিল, 'দিদিমণির বাপু মিছেই খালি রাগ! অত যদি পিসির উপর দরদ, তা নিজের বাড়ী নিয়ে গেলেই হয়?'

হ্যাঁ, নিজের বাড়ী আবার কোথা?—তা নয়, তবে কি না পিসিমারও এখানে সুবিধে হচ্ছে না, আমারও কি কম অসুবিধে? এই

যে তাঁর বারমাসে তের পার্ব্বণ লেগেই আছে, আমার মা এ পছন্দ করেন না, বলেন তোর বাড়ীতে গিয়ে দু'দণ্ড একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসবার যো নেই,—তা ও নিয়ে কিছু ত আর বলা যায় না। ওঁরও পিসিমার উপর ভক্তি খুব বেশী কি না!

দাদাবাবু যা ভালো মানুষ—তোমার বাপু সারা জীবনই কপালের ভোগ আছে।

তা হোক, কি আর করবো বল, আপনার মানুষ ফেল্‌বোই বা কোথায়! তা, এই নিয়ে আর কথা বলে কাজ নেই, ভালও শোনায় না। উনি শুনলেও বিরক্ত হ'তে পারেন, তার চেয়ে বাপু, ঠাকুঝি যদি বলেনই, আরো না হয় বেশী করে কিছু নিয়ে যেয়ো! আর দেখ ঝি, ওঁরা যদি কখন কিছু বলেন, আমায় এসে বলো।

দিব্য চক্ষু আমার খুলিয়া গেল,—তাই ত, তাই ত, এ কোথায় আমি দাঁড়াইয়া আছি! এ কার সংসার? আমার মা নাই, বাবা নাই, ঘরে বধূ আসিয়াছে, গৃহকর্ত্রী অন্নদাত্রী সেই মৃণাল! তার দয়ার ভিখারী আমি? নিশ্চয় না,—আমার ভাই কখনো তেমন নয়। আমার উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইয়া থাকিতে পারিবে মৃণাল? অসম্ভব! আমার ভাইকে কি আমি চিনি না? কিন্তু মৃণাল, তুমি এত ক্ষুদ্র, এত ছোট তোমার মন যে, সামান্য ঝি চাকরাণীর সঙ্গেও তুমি ঘরের কথা তুলিয়া আলোচনা করিতে পার?—ছিঃ—

আমি সদর্পে নীচে নামিয়া আসিলাম, এবং তৎক্ষণাৎ বিন্দিকে ডাকিয়া বলিলাম, "তোর যে ক'মাসের মাইনে বাকী আছে সব চুকিয়ে নিয়ে তুই এক্ষুণি চলে যা।"

সে বলিল, "সে কি দিদিমণি!"

"হ্যাঁ, এক্ষুণি।"

পিসিমা বলিলেন, "হ্যাঁ রে, বিন্দি কি করেছে ?"

"কিছু না পিসিমা, পুরণো মানুষ বেশী দিন ভাল লাগে না।"

* * * * *

আরও তিন চারি দিন পরে এক দিন সন্ধ্যার সময় নূতন ঝিকে ডাকিয়া আমি পিসিমার পায়ে তেল মালিশ করিতে বলিলাম। সে বলিল, "আমি বৌদির ঘর ঝাড় দিচ্ছি, তার পরে এসে দেবো'খন।"

আধঘণ্টা চলিয়া গেল, ঝির আর দেখা নাই। আমার কেমন অল্পেতেই আজকাল নানাকথা মনে পড়ে, আজও তাই মৃণালের ঘরে কি হইতেছে দেখিবার জন্য আমি উপরে চলিলাম এবং দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, মৃণাল চেয়ারে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছে এবং ঝি তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেছে। আমার গা জ্বলিয়া গেল,—এই আমি, আমার কথার অন্যথা! আমার পিসিমাকে অপমান! মৃণাল বুঝি এখনো জানে না, তাহার দয়ার ভিখারী আমি নই, নিজের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইবার শক্তি আমার আছে। আর পিসিমাও প্রতিমাসেই বাবার নিকটে যথেষ্ট মাসহারা পাইতেন, দাদাও সে মাসহারা কখনো বন্ধ করিতে পারিবে না!

সে দিন রাত্রে পিসিমাকে বলিলাম, "পিসিমা, আমায় কাশী নিয়ে চল, আমরা সেখানেই স্বাধীনভাবে থাক্‌ব, এ বাড়ীতে মৃণালের কর্ত্তৃত্ব আমার সইবে না।"

পর দিন একটু সকাল সকাল আশ্রমে গেলাম। দেখিলাম টাকার অভাব নাই বলিয়া আশ্রমের সমস্ত কাজই সুনীলদার সুবন্দোবস্তে এবং তত্ত্বাবধানে সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে। ইতিমধ্যে বহু জমিদার এবং দেশীয় রাজার কৃপাদৃষ্টি আমার এই ক্ষুদ্র আশ্রমটির প্রতি পড়িয়াছে।

যদি এমনি ভাবে নানাদিক হইতে নিয়মিতরূপে টাকা আসে, তবে আমি কাছে না থাকিলেই বা কি ? সুনীলদা আছে, আর আছে জন্মদুঃখিনী অথবা ভাগ্যবতী কমলা ! আমি কি ইহাদের চেয়ে বেশী কাজ করিতে পারি ?

চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরিয়া উঠিল। কমলার গলা জড়াইয়া আমি বলিলাম, "এই ত সব বেশ হচ্চে, তোমার কাছে ভাই, এই ত আমি আশা করি, সবই বেশ পারচ, এবারে তবে আমায় দিন কয়েকের জন্য ছুটি দাও।"

ছোট বোনটির মতই কমলা আমায় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তোমারই জন্যে দিদি, কাজ পেয়ে বেঁচে গেছি, এবারে একলা ফেলে আমায় কোথায় তুমি যাবে ?"

কিন্তু অবশেষে ছুটি আমি পাইলামই। সুনীলদা আশ্রমের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে মাস কয়েকের ছুটি দিল। কিন্তু ভয় ছিল আমার একটী জায়গায়, হইলও তাহাই। দাদা বলিল, "কেন তুই আমায় ছেড়ে যেতে চাস্ বল্, তোর কি কোন অসুবিধা, বা কষ্ট হচ্চে ? না কি, পিসিমারই কিছু হয়েছে ?"

আমি কিছু বলিতে পারিলাম না, কিন্তু সত্যি আমার দুঃখ হইতেছিল। দাদা কিছু জানেন না বটে, তবু সে যখন গৃহকর্ত্তা তখন বিধবা পিসিমা এবং আমার মত হতভাগ্য বোনের তত্বাবধান তাহার নিজেরই করা উচিত নয় কি ? মেয়েমানুষের কর্ত্তৃত্ব পুরুষ মানুষকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিবে কেন ?

দাদা মুখে যাহাই বলুক, মনে কিন্তু সত্যিই ভাবিয়াছিল, তাহার শোকসন্তপ্ত বোন্টী জুড়াইবার জন্যই অন্যত্র যাইতে চাহিতেছে, তাই আপত্তি বিশেষ করিল না, কিন্তু আমি যখন বলিলাম, "দাদা, আমার

বাড়ী ভাড়ার একশ' টাকা আমায় পাঠিয়ে দিয়ো, আর বাকী তিনশ' টাকা আশ্রমে যাবে।" তখন দাদা গোপনে ডাকিয়া আমাকে বলিল, "সত্যি বোন, বল্ দেখি আসল কথাটা কি হয়েছে?"

কিন্তু, হায়, কি বলিব, বিবাহের তিন মাস যাইতে না যাইতেই বধূকে আমি সহিতে পারিলাম না, কি করিয়া দাদাকে সে কথা আমি বলিব! দাদা কি আমাকে স্বার্থপর হিংসুটে ভাবিবে না?

দাদা করুণ স্বরে মিনতি করিয়া বলিল, "আমার টাকাটাও তুই নিতে চাস্-না, জানি না কি অপরাধ হয়েছে। কিন্তু এ কথাটা কিছুতেই ভুলিস্ নি দিদি, আমরা এক মায়ের পেটেরই ভাই বোন, ঘরে নতুন যে কেউ আসুক না কেন, তবু সে পর—আমাদের ভেতরে হাত দেবার কোন অধিকার তার নেই। যদি বা দেয় আমরা তা মান্‌ব কেন? দিদি, যেতে চাচ্ছিস্ যা, কিন্তু মনে রাখিস্, এ তোরই দাদার ঘর, তোরই আপনার—আবার নিশ্চয়, নিশ্চয় তোকে ফির্‌তে হবেই হবে।"

২৯

...এই সেই কাশী...বারাণসী, হিন্দুর আশ্রয়, মহাতীর্থ, পুণ্যতীর্থ...। পুণ্যতোয়া জননী জাহ্নবী নানাভঙ্গীতে, নানামূর্ত্তিতে নিম্নে বহিয়া চলিয়াছেন। শুনিয়াছি, তাহার নির্ম্মল শীতল জলে প্রতিদিন কত শত নরনারী আপনাদের পাপরাশি ধুইয়া যায়, কত অনুতপ্তের যাতনা, কত পীড়িতের বেদনা এই জলে সান্ত্বনা লাভ করে, আর আমারই কি কিছু হইবে না? মনে বিশ্বাস একেবারে নাই, কেমন করিয়া তা বলিব? প্রতিদিনের এই আরাধনা, এই যাগ যজ্ঞ, এই এমন বিশ্বাসী প্রাণগুলি দেখিয়া কত পাপীর মন ফিরিয়া যায়, আর আমার কি এমনই পাষাণ প্রাণ যে এ সব দেখিয়া শুনিয়া আমি অটল অচল হইয়া থাকিতে পারি? এই কাশীতে আসিয়া, এই গঙ্গায় স্নান করিয়া আমার প্রাণের জ্বালা কি একটুও উপশমিত হইবে না?

* * * *

এখানে আসিয়াছি সে আজ অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। এত দিন আর লিখিতে বসি নাই—কি লিখিব? নূতন কোন কথা ত আর আসে না, একই কথা একই বুলি কত আর আওড়াইব? পিসিমার সঙ্গে কত ঘুরিলাম, কত দেখিলাম, কিন্তু কই, সান্ত্বনা ত কোথাও মিলিল না—এ যে কি যাতনা—ঈশ—...একটা ঝড়ের বেগে যেন কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি, এ কি দুর্জ্জয় অভিমান! মৃণাল ঘরের বধূ, শুধু বধূ নয়—সে গৃহিণী—অধীশ্বরী। তাহার গৃহিণীপনা আমি সহিতে পারিলাম না—এ কি অসম্ভব কথা! ছিঃ ছিঃ ছিঃ, লোকে শুনিলে কি হাসিবে না? ভগবান আমাকে অনেক কিছুই দেন নাই

সত্য, কিন্তু যতটুকু দিয়াছেন তাহাতে ত কৃপণতা করেন নাই! আমার মা নাই, বাবা নাই, নারী-জীবনের সেরা তীর্থ শ্বশুরগৃহ নাই, কিন্তু আমার স্নেহকোমল সুন্দর-হৃদয় ভাই আছে, আমার রাজার ঐশ্বর্য্য আছে কিসের অভাব আমার, কিন্তু কপালে যে কিছুই সহে না!

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আরতি দেখিতে বহুদিন গিয়াছি। প্রথম প্রথম ভিড় এবং গোলমাল ভাল লাগিত না, তার পরে, প্রতিদিনই দেখিয়া দেখিয়া মনটা বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠিত। সত্যি যদি কিছু না-ই থাকে, লোকে ইচ্ছা করিয়া কি শুধু এত কষ্ট করে, এত ধাক্কা খায়? যদি কিছু না-ই থাকে, তবে এই একই খেয়াল মানুষের প্রতিদিনই কি করিয়া হয়?

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, একটু একটু করিয়া মন্দিরের ঐ পাষাণ মূর্ত্তির মধ্যে একটা সজাগ প্রাণের অনুভূতি কেমন যেন নিজের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, এত লোকের এত বিশ্বাস, এত ভক্তি শুধু শুধু কি হাওয়ায় মিলাইয়া যায়?—এ কখনো হইতে পারে না। দেহের প্রতি অঙ্গে কেমন একটা শিহরণ অনুভব করিতে লাগিলাম। ওই সুসজ্জিত পাষাণ মূর্ত্তির অন্তরালে কি শক্তি না জানি আছে! এই আরতি, এই নৈবেদ্য, এই এত গোলমাল যাহার জন্য, সে অদৃশ্য শক্তি কেমন তাহা কে জানে! আপনা আপনি চক্ষু মুদিয়া আসিল—আহা হা, বুকটায় এমন কেন করে গো! এই কাঁসর ঘণ্টার তীব্র শব্দ, এই ধূপধুনার মৃদু গন্ধ, বুকটায় আমার এ কি ঢেউ তুলিয়া দিল! কিছু বুঝিতেছি না, কিছু দেখিতে পাইতেছি না—কেবল—কেবল—কি জানি কি!

বেশ আছি, ওগো কাশীর ঠাকুর, এ আমার বেশ করিয়াছ! হিংসার রাগে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিলাম—এ আমার বেশ করিয়াছ! বেশী

কিছু বুঝি না, কিন্তু তোমার ঐ পাষাণ মূর্ত্তিটি দেখিতে দেখিতে চারিধারের ঐ সব গোলমালে আত্মহারা হইয়া যাইতে বেশ লাগে। এক একবার ভয় হয়, আমি কি বাবা মার ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া আসিলাম, আমি কি দাদার পর হইয়া গেলাম! কিন্তু ছিঃ, এ চিন্তা কেন? ওই এত বড় শক্তি কি পৃথিবীতে দু'টি থাকিতে পারে? একই দেবতারই না বহুরূপ!—

আমাদের এই বাড়ীখানি বেশ—ছোট একটি বাংলোর মত, শোবার ঘরখানি চারিধারে চওড়া রেলিং ঘেরা বারাণ্ডা, আর তারই গায়ে লাগান হাত দুইতিন চওড়া, লম্বা ধরণের ফুলবাগান বাড়ীখানির তিন দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে আতা পেয়ারার বড় বড় গাছ। নির্জ্জন দুপুরে উহাদের লম্বা লম্বা ছায়া কেমন একটা গভীর ভাবের সৃষ্টি করিয়া তোলে যা না কি খারাপও লাগে না, আবার সহ্যও হয় না।

কিন্তু তবু বেশ আছি। খাওয়া দাওয়া সারিয়া পিসিমা ঘুমান, আর আমি সারা বারাণ্ডা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই। কাক ডাকে, চড়ুই কিঁচিমিঁচি করে, ফেরিওয়ালা হাঁকাহাঁকি করিয়া যায়, হাওয়ায় মাঝে মাঝে গাছ হইতে আতা পেয়ারা ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে—আমি চাহিয়া চাহিয়া সব দেখি আর শুনি।

বাড়ীওয়ালার বাড়ী আমাদের এ বাড়ীর পাশেই, নানা রকমের ফুল, পাতাবাহার এবং অন্যান্য গাছ পালায় ঘেরা একই ধরণের লাল বাড়ী দুখানি রাস্তা হইতে ভারী সুন্দর দেখায়। সন্ধ্যার পর বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিয়া যখন বাড়ী ফিরিয়া আসি, রাস্তার আলোয় বাড়ী দু'খানাকে যেন স্বপ্নের মত মনে হয়। অনেক রাত্রে যখন চাঁদ উঠে, ঘরের আলো নিবিয়া যায়, একলা আমি নিদ্রাহীন চোখে সারাখানি

বাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই। এত সৌন্দর্য্য কি সহ্য হয়? এতে যে নিজের দীনতা স্পষ্ট করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া বুকের ভিতর হাহাকার জাগাইয়া তোলে! ওগো সারাটা পৃথিবী জুড়িয়া কেন কেবলই আঁধার হইল না? আলো—আলো—না, আলো আর সহ্য হয় না!

কর্ম্মহীন দুপুরে যখন এদিকে ওদিকে একটু দাঁড়াই, একটু বেড়াই, তখন সর্ব্বদাই দেখিতে পাই বাড়ীওয়ালাদের বাড়ীর একটী বউ ছেলে কোলে নিয়া আমারই মত বেড়াইতেছে। কিন্তু আমার মত এমন প্রাণহীন নিস্তেজ সে নয়, হাঁটিবার ভঙ্গীতে, ছেলেকে আদর করার ধরণে, কথার সুরে কেমন যেন একটা সহজ সুন্দর প্রফুল্লভাব তার ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আমিও তাহাকে প্রতিদিনই দেখি, সেও আমাকে দেখে, কিন্তু কোন দিন আমাদের একটী কথাও হয় নাই। চুপ করিয়া তাহার কাজ দেখাই আমার ভাল লাগিত, সেও মাঝে মাঝে আমাকে চাহিয়া দেখিত; আমি কোন দিন ডাকি নাই, তাই বোধ করি নিজে হইতেও কোন দিন সে কাছে আসে নাই। প্রথম যে দিন তাহার সঙ্গে আমার কথা হইল সে এক অদ্ভুত কাণ্ড! সে দিন কি একটা গাছের ডাল-পাতার আড়াল-করা জানালা দিয়া তাদের ঘরের ভিতরটা খুব স্পষ্ট দেখা না গেলেও ভিতরে বিছানায় যে কে এক জন শুইয়া আছে তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম। একবার মনে হইল নূতন ফ্যাসানের মাদ্রাজী সাড়ী পরিয়া এক গোছা চুড়ির শব্দে ঘরে ঝঙ্কার তুলিয়া কে একটী সুন্দরী যেন ঘরে আসিয়া ঢুকিল; এবং প্রথমেই বলিল, "মাসীমার গাড়ী এসেছে, দ্বরোয়ানও এসেছে, আমি চল্লুম।"

"আজ নাই বা গেলে, আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে—"

"রোজই বাধা দিচ্ছ, কবে যাব তবে?"

"কাল না হয় যেয়ো,—"

"হ্যাঁ, কাল যাব! মাসীমার মেয়েরা এসেছে, জামাইরা এসেছে, চার দিন পাঁচ দিন তোমায় নিতে লোক পাঠালেন,—তা' বড়লোক তুমি, তোমার কথা আলাদা, কিন্তু নিজে না গেলে, আমায় শুদ্ধু যেতে দেবে না,—মাসীমা কি ভাববেন, ওরাই বা কি ভাববে!—ছিঃ ছিঃ—বিশেষ দরকারও ত কিছু নেই, সুষমা রয়েছে, রামজীব আছে, ঝি আছে,—রাঁধুনী আছে, তবু আমি না হলে কিছুতে চল্‌বে না! পারি না বাবা, কবে যে মরণ হবে—"

"থাক্, হয়েছে সুশীলা, যাও তুমি, আমি তোমায় থাকতে বলেছিলাম, আমার অপরাধ হয়েছে, আর কক্ষণো বলবো না, যাও,—"

"অমন মিছিমিছি রাগ করলে আমি আর কি করবো!"

"রাগ করিনি, যাও—"

সুশীলা বারাণ্ডা হইতে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দেখ, মাসীমা যদি থাকতে বলেন ত আমি কিন্তু না বলতে পারবো না, আগে থেকেই বলে দিয়ে যাচ্ছি, পরে যে তাই নিয়ে কথা হবে সে কিন্তু ভাল নয়।"

"কিচ্ছু কথা হবে না, তোমার যতক্ষণ খুসী, যদ্দিন খুসী থেকো।"

বারাণ্ডায় সেই বউটী দাঁড়াইয়া ছিল, সে অগ্রসর হইয়া মৃদু গলায় বলিল, "দিদি, আজ ভাই না গেলেই পার্‌তে। মাসীমাকে একটু লিখে দিলেই ত হত!"

"তাই ত, তুমিও যে তোমার ভাসুরের সুরই ধরলে! কেন, জিজ্ঞেস্ করি, আজ গেলে ক্ষতিটা কি?"

"বড় ঠাকুরের শরীর ভাল নেই,—"

"কবে ভাল থাকে?"

"জানিনে,—তুমি যাও,—"

সদর রাস্তায় গাড়ীর শব্দে বুঝিলাম সুশীলা চলিয়া গেল, আমি সেখানে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মেয়ে মানুষের এমন তেজ! সর্ব্বনাশ, এ তেজে সর্ব্বস্ব পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে যে! পীড়িত স্বামীকে এমন অবহেলা! হায় নারী, সাবধান, সাবধান, এত দর্প! পুড়িয়া যাইবে, ভস্ম হইয়া যাইবে, মরিবে যে, সাবধান!

ততক্ষণে সেই বউটী ঘুরিয়া ফিরিয়া এধারে আসিয়াছে। চোখে চোখ পড়িতেই আমি অপ্রস্তুত হইয়া সরিয়া যাইতেছিলাম, চোরের মত এমনি ভাবে পরের ঘরের কথা শুনিবার কি অধিকার আমার আছে? বউটী কি ভাবিবে?—ছিঃ।

"দাঁড়ান না একটু, শুনুন—"

আমি বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া বলিলাম, "আমায় বল্ছেন?"

"হ্যাঁ, আপনারা বুঝি এ বাড়ীটায় থাকেন? রোজই দেখতে পাই, কিন্তু এত কাছে থেকেও কোন দিন আলাপ হয় না। সারাটা দিন বড্ড একলাটি বোধ হয়, সে সময়টা পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলে বেশ হয়—দিনটা তবু কাটে!"

"একলাটি কেন, আপনার জা' আছেন না?"

"আছেন, তবে তিনি প্রায়ই তাঁর মামাবাড়ী,—মাসীর বাড়ীই ঘুরে বেড়ান, আমায় প্রায় একলাই থাকতে হয়।"

"আজও বুঝি তিনিই গেলেন?"

"হ্যাঁ, ওঁর মাসীমা লোক পাঠালেন কি না, নইলে আজ আর যেতেন না, আমার ভাসুরের শরীর ভাল নয় ত!"

—অনেক কথা হইল, দেখিলাম বউটী বেশ লেখা পড়া জানে, কয়েক বছর বেথুনস্কুলেও পড়িয়াছে। বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছিল, এখন অবস্থা নামিয়া পড়িয়াছে। স্বামী কলিকাতার কোন্ কলেজে প্রোফেসর।

মোটের উপর সবই বেশ, দেখিলাম মুখখানি ভারী সুন্দর, ভরা যৌবনে, হাসিখুসীতে, আদরে সোহাগে, মাতৃত্বের নবগৌরবে যেন ঢল ঢল করিতেছে—বড় ভাল লাগিল।

তার পর হইতে কেমন যেন নেশার মত হইয়া গিয়াছে, কতক্ষণে দুপুর আসিবে, কতক্ষণে সে তাহার কাজ সারিয়া আসিবে, অধীর চিত্তে তাহারই প্রতীক্ষা কেবল করি! ভগবান মায়ের পেটের বোন আমায় দেন নাই সত্য, কিন্তু ভগ্নী-সৌভাগ্যে আমার কোথাও তিনি এতটুকুও কার্পণ্য ত করেন নাই! বড় দুঃখের দিনে একদিন আমার আমিনাকে পাইয়াছিলাম, বড় কষ্টের দিনে কমল একদিন তার স্নিগ্ধ প্রাণের মৃদু পরশটুকুতে এ ভাঙ্গা বুকটা জুড়াইয়াছিল,—আর আজ আবার কোথা হইতে এই সুষমা আসিয়া এই নিঃসঙ্গ জীবনটাকে আমার ভরিয়া তুলিল!

৩০

.. হাসি পায়...

হায় রে আমার দুর্ভাগ্য! কিন্তু এমনি করিয়া পেছনে লাগিয়া থাকা,—আমি ত মানুষ,—দেবতারা পারতেন কি?...

মরিতে আমি সুষমার সঙ্গে পিসিমার আলাপ করাইয়া দিয়াছিলাম, কেঁচো খুঁড়িতে তাই সাপ বাহির হইয়া পড়িল, এখন তার এই দংশন হইতে কোথায় পালাই!

খুঁটিয়া খুটিয়া লোকের সংসারের খবর বাহির করা এ পিসিমার একটা রোগ, নহিলে কে সুষমার ভাসুর, কি বা তাঁর রোগ, আর কোথায় তিনি কোন্ ব্রাহ্ম বিবাহ করিয়া, তাহাকে ত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন,—এ খবরে কি তাঁর দরকার ছিল? পরের সংসারের যে খবর জানিবার জন্য নিজে আমি কোন দিন এতটুকুন কৌতূহল প্রকাশ করি নাই, আজ আমার বুড়ো পিসিমার অতিরিক্ত কৌতূহলের ফলে, এ কি সর্ব্বনাশ হইল!

সে দিন সবটা কথা ভাল করিয়া শুনিতেও পারি নাই, চক্ষু মুদিয়া কেমন করিয়া যে রেলিং ধরিয়া ঘরের মেঝেয় আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিলাম সে কথা মনে পড়ে না!—এইটুকু শুধু মনে পড়ে, বড় বেদনায় সে দিন কাঁদিয়া উঠিয়াছিলাম,—হায়, এই কি পরীক্ষা আবার ঠাকুর, আবার এত কাছে কেন?

দুপুর কাটিয়া গিয়া বেলা সে দিন পড়িয়া আসিতে লাগিল, আমি তেমনি করিয়াই পড়িয়া রহিলাম। পিসিমা দিনের এই স্পষ্ট আলোয় আমার কাছে যে আসিতে পারেন নাই, আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম,—

ভালই হইয়াছে,—মুখ ফুটিয়া কাহারও কাছে কোন কথা প্রকাশের অবস্থা আমাদের আজ কাহারো ত নাই।

মনের ভিতর সব যেন কেমন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার আঁধারে মন্দিরের কথা মনে পড়িল, আজ আর আরতি দেখিতে যাওয়া হইল না। জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলাম, ছিন্ন মেঘরাশির অন্তরালে জ্যোৎস্নার ম্লান হাসি কেমন ধীরে ধীরে পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতেছে—ওধারের ঐ মেঘটা কি কাল, উঃ! পাশের বাড়ীতে ঐ কুকুরটা এত কাঁদিতেছে কেন? চারধারের নির্জ্জনতার মাঝে এ সব শব্দে কেমন একটা ভয় হয়।

* * * * *

ক'দিন ধরিয়াই বিকালের দিকটায় এ কি ভীষণ মেঘ করিয়া সন্ধ্যা হইতে না হইতেই প্রবলবেগে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়। কত রাত পর্য্যন্ত সে বর্ষণের আর বিরাম হয় না! মনের সঙ্গে আমার বিশ্বপ্রকৃতির এত মিল কোথা হইতে হইল! এ কয় দিন ক্ষুদ্র এই বুকটায় কি যে তুমুল ঝড় অবিরাম চলিয়াছে, তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? আর যে ভাবিতে পারি না,—ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি!

কাল সন্ধ্যার পর ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেলে আকাশ ক্রমে পরিষ্কার হইয়া উঠিল, রূপালি জ্যোৎস্নাখানি কেমন ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়াইয়া সিক্ত ধরণীতে চিক চিক করিয়া উঠিল, অবশ মনে তাহাই চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম। আলোটা নিবাইয়া দিয়া বিছানার এক পাশে পড়িয়াছিলাম, এমনি সময়ে ঘরের ভিতর সহসা কার পদধ্বনি শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলাম,—কে এ—এ কে!

—"দিদি,—"

"কে !—সুষমা !—কেন ?"

"দিদি, তুমি আমার এত আপনার ভাই, এদ্দিন ত জানি নি ! আর ত তোমায় দূরে রাখব না, ঘরের জিনিষ এবারে ঘরে নিয়ে যাব।"

"না, না সুষমা, একটী কথাও তুমি প্রকাশ করতে পারবে না, কক্ষণো না—যদি কর সেই দিনই আমরা চলে যাব।"

"কেন এমন করে বল্‌চ দিদি, আমার ভাসুর তোমায় মাথায় করে নিয়ে যাবেন। সতীন আছে—তাতে কি ? তুমি হবে ঘরের গিন্নী, ঘরের লক্ষ্মী—শ্বশুরের সংসারে তোমার অধিকারই ত আমাদের সকলের আগে, দিদি,—"

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ—সুষমা, বলো না, বলো না, এমন করে—যে অধিকার এক দিন আপনি হাত ছাড়া হয়ে গেছলো, সে আমি আজ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করছি,—যদি বেশী জোর তুমি কর কাশী ছেড়ে পালিয়ে গেলে আমাদের সন্ধানও ত তুমি পাবে না !"

কত রাত্রে সুষমা চলিয়া গেল, আমি ভাবিতে লাগিলাম, কি করা যায় ! এ সহর ছেড়ে পালাব কি ? পিসিমা আসিয়া বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, নিজের ঘর ছেড়ে বেশী দিন কি থাকে মা ? এবারে তোমায় যেতেই হবে। একটুও তা'র বদ্‌লায় নি মা ! এই বাড়ী পর্য্যন্ত সে আমায় পৌঁছে দিয়ে গেল।"

"তুমি গিছ্‌লে সেখানে ?"

আমার কণ্ঠস্বরে পিসিমা ভয় পাইলেন, সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "তাতে হয়েছে কি ?"

"ছিঃ ছিঃ পিসিমা, একটু কি মান অপমান জ্ঞান তোমার নেই ? ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ, কেন তুমি দয়া ভিক্ষা করতে গেলে ! কে চাইছিল ?"

"মেয়ে মানুষের স্বামীর কাছে হেঁট হয়ে যেতেও লজ্জা নেই মা,

তা'ছাড়া আমি ত নিজে থেকে কিছু বলিনি। মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করছিল, আমি কাছে বসে মাথাটা কোলে তুলে নিলুম, সে কেমন করে আমার মায়ের মত জড়িয়ে ধরলে, যুঁই! মা, আর আপত্তি করিস্‌ নে মা। যার জন্যে তার সমস্তটা জীবন ছাই হয়ে গেল, যার জন্যে সে আজ এত কষ্ট পাচ্চে, তুই-ই তাকে তা দিতে পারবি। কিন্তু মা, তুই সাহস না দিলে ত সে তোর কাছে এগোতেও ভরসা পাবে না মা।"

রাত্রি বাড়িয়া চলিল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি সব ভাবনায় আমার কাটিয়া গেল—জানি না। ভোরের বেলা বুঝি একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছিল, কি একটা স্বপ্ন দেখিয়া সেটুকুও ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া বসিলাম, বুকটা দুরু দুরু করিতে লাগিল। তার পর সারাটা দিনই কেমন একটা আতঙ্কের ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল। মনের ভিতর বিদ্রোহের যে একটা তীব্রস্বর আমার কণ্ঠে স্পষ্ট হইয়া বাজিতে লাগিল, তাহা হইতে নিজেকে রেহাই দিতে কিছুতে ত আমি পারিলাম না!

তাঁহাকে বসাইয়া, নিজের হাতে তাঁহাকে খাওয়াইয়া হঠাৎ তিনি একাকী মন্দিরে চলিয়া গেলেন, বাড়ীতে একলা আমি! কি করি—কোণের ঘরখানিতে একাকী বসিয়াছিলাম, পিসিমার চাতুরী বুঝিবামাত্র দরজা আবার বন্ধ করিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু মনে হইল অতখানি অভদ্রতা উচিত হইবে না, তাই চুপ করিয়া একাকী জানালার কাছে বসিয়া রহিলাম।

কিন্তু, এ কি ভয়! এ কি আতঙ্ক উদ্বেগ—মাগো!—বুকের এ দুরু দুরু কাঁপুনী, এ ঢিপ ঢিপ শব্দ, হাত পায়ের এ শীতলতা—এ কি? এ কেন?—

ছেলেবেলায় কিসে পড়িয়াছিলাম, না-কি প্রবাদই শুনিয়াছিলাম—ঠিক মনে নাই,

"যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়,"

তাই গো, তা-ই—তা-ই......আঃ—কতকাল, ক-ত কাল পরে চোখের উপর এ কি মূর্ত্তি! এ কে! এ কে! এ কেগো আমার চোখের সুমুখে! বিধাতা আমায় অবশ করিয়ো না, আমায় দুর্ব্বল করিয়ো না প্রভু, একটী দিন, একটী মুহূর্ত্তের জন্য শুধু আমায় তোমার ঐ বজ্রের শক্তিখানি দাও!...

৩২

শুধু অন্ধকার! বাহিরে ঐ মৌন বিশ্বপ্রকৃতি কে জানে কোন্ অজানা-রাহুর গ্রাসে, আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে......

তবু তার মুক্তি আছে, এ বিরাট আঁধারের পরে বিশ্ব প্রকৃতির আলোর আশা আছে, তাই এই থমথমে অন্ধকারও অসহনীয় নয়। দুঃখ তখনই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, যখন মন জানে, এ সমুদ্রের আর কিনারা নাই, এ দুঃখের আর পারাপার নাই।

এত দিন কি দুঃখ কিছু কম ছিল?—কিছু না,—কিন্তু তবু নিজের মনেরও কত অজ্ঞাতে, কতদূরে যে একটা অতি ক্ষীণরশ্মি-মৃদুতারকা চোখের উপর ফুটিয়াছিল,—শক্তি বুঝি তাহা হইতেই পাইতাম! আর আজ?—সব আঁধারে ঢাকা।......

আজ আর অস্বীকার করিব না, অস্বীকার করিবার প্রবৃত্তিও ত নাই। প্রিয় প্রিয়তম আমার, সর্ব্বস্ব আমার, দেবতা আমার—এ ভাঙ্গা বুকখানি যে তোমারই প্রেমের আশায় ভরিয়াছিল। কিন্তু, আজ?—আজ আর কি রহিল?

ফিরাইয়া দিয়াছি—নারীত্বের গর্ব্ব আসিয়া অভিমান আসিয়া, সমস্ত প্রবৃত্তিকে এমনি করিয়া জয় করিয়া বসিল, যে তাহাকে এড়ান কিছুতেই আর চলিল না। মনে হইল ছিঃ, আমি কি খেলার পুতুল, যে, যতক্ষণ ইচ্ছা হইল, খেলিলে, তার পর কোণায় ফেলিয়া দিয়া, আবার অবসর মত আসিয়া তুলিয়া লইবে?—হায় স্বামী, তোমার এ ভুল আমি সহিতে পারিলাম না।

কিন্তু আজ তুমি বড় দুঃখী। যে পিতৃভক্তি, মাতৃস্নেহ এক দিন

তোমার কণ্ঠে মণিহার পরাইয়া দিয়াছিল, আজ তাহা কালসাপ হইয়া গলায় তোমার ঝুলিতেছে! কিন্তু এ কেমন কথা প্রিয়তম, সাপ যত বিষাক্তই হোক না কেন, সাপুড়ের কি এমন শক্তি নাই, যে বিষ নষ্ট করিয়া দিতে পারে? দোষ কালসাপের নয়, দোষ সাপুড়ের!

তা হোক,—তবু এ হার কণ্ঠে তোমার রাখিতেই হইবে। বার বার তোমায় অপরাধী হইতে দিব না স্বামী,—যদিও তার সঙ্গলাভ বেশী দিন তোমার ভাগ্যে ঘটে না, তবু তাহার তুমি,—তাহারই থাকিবে।

—জান না ত স্বামী, এ যে কত জ্বালা, তোমাদের হাতের বিসর্জ্জন, এ যে নারীর জীবনের কতখানি বিসর্জ্জন,—জান না ত তা!—একজনকে যা দিয়াছ, তা এই একজনের উপর দিয়াই যাক্—নূতন করিয়া আর কাহাকেও না—কিন্তু, তবু—তবু যে একবার অভিশাপ দিতে ইচ্ছা করে, প্রাণাধিক,—পরজন্মে নারীর জন্ম যেন পাও!

৩৩

বুকের ভিতরে কিসের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে আজ আর সে কথা অস্বীকার করিব না। সারাটা জীবন নিজেকে ভুল বুঝাইয়া আসিয়াছি, আজ,- আর তার দরকার নাই। আজ যে আমার আমিত্বকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমার মন বড় হইয়া উঠিয়াছে, আজ সে কেবলই পদপ্রান্তে লুটাইয়া বলিতে চাহিতেছে—ওগো, প্রত্যাখ্যান না হয় আমি করিলামই, তোমার কি অতটা শক্তি নাই যে আমাকে জোর করিয়া তুমি নিতে পার ?

রাত্রে বারাণ্ডায় মাদুর বিছাইয়া অন্ধকারে পিসিমা একলাটি শুইয়াছিলেন। আজ তিন দিন তিনি আমার সঙ্গে রাগ করিয়া আছেন, কথা বলেন নাই, আমিও এই তিন দিনই আড়ালে আড়ালে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, তাঁহার সম্মুখে যাইতে সাহস পাই নাই। আজিকার এই নিদারুণ অন্ধকার এবং বর্ষার ধারায় বুকের ভিতর কি যে হাহাকার জাগাইয়া তুলিল জানি না, আমি ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিলাম, "তুমি রাগ করে থেকো না পিসিমা, আমি তা'হলে কার কাছে যাব ?"

পিসিমা আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া অনর্গল ধারায় জল পড়িতে লাগিল। আমি তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া নীরব তৃপ্তিতে তাঁহার বুকের কম্পন অনুভব করিতে লাগিলাম। এমন সান্ত্বনা, আহা, কত দিন পাই নাই,—বুকের ভিতরটা শুকাইয়া উঠিয়াছিল। এমনি ভাবে খানিকক্ষণ কাটিয়া গেলে আপনাকে সম্বরণ করিয়া নিয়া পিসিমাকে বলিলাম, "পিসিমা, চল, দিন কতক আবার ঘুরে আসি।"

"কোথায় যাবি মা ? যতীনের কাছে ?"

"না পিসিমা, আপনার লোকের মত এতবড় শত্রু মানুষের আর হয় না। চল আর কোথাও যাই।"

"তা' চল্, কিন্তু এই বুড়ো বয়সে একলা মেয়ে মানুষ কোথায় তোকে নিয়ে ঘুরবো বল্—"

"একলা কোথায়, দুটো দরোয়ান সঙ্গে থাকলে আবার ভয় কিসের, পিসিমা? চল, দিন কতক গিরিধি বৈদ্যনাথ ঘুরে আসি।"

তাহাই ঠিক হইল, পিসিমা কিন্তু সারা রাত কাঁদিয়াই কাটাইলেন। আমার চোখে জল নাই, আমি চক্ষু মুদিয়া তাঁহার বুকের উপর পড়িয়া রহিলাম। আর সারাটা রাত্রি মনের ভিতর এই কথাটিই খালি খোঁচাইতে লাগিল,—যে, কত কাছে পাইয়া,—কত কাছটাতে পাইয়া আবার ছাড়িয়া আসিলাম।

* * * * *

মাসখানেক হইতে চলিল গিরিধি আসিয়াছি। সহর হইতে খানিকটা দূরে এই ছোট বাংলাটায় আমরা আছি, আর আছেন আমাদের অভিভাবকরূপে পিসিমার এক দেওর। আসিবার সময় হঠাৎ কাশীতে তাঁহাকে পাইয়া এবং ভাল মানুষ জানিয়া পিসিমা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। ঠাকুর দেবতা নাই বলিয়া গিরিধি পিসিমার কাছে ভাল লাগে না, আমারো যে ঠিক কেমন লাগে বলিতে পারি না, তবে, আছি এক রকম বেশ—সাঁওতাল ঝিটার সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াই, আর যে পাহাড়গুলি দূরে ঘন নীল মেঘের মত আকাশের নীচে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, অবাক্ হইয়া সে গুলির দিকে চাহিয়া থাকি। পাহাড়ের গায় ছোট ছোট অসংখ্য গাছ, মাঝে মাঝে এক আধটা ঝরণাও দেখিতে পাই, আর ভাবি—ইহারা এত ভয়ে ভয়ে, এত মৃদু গতিতে চলিয়াছে কেন। মাঝে মাঝে

পোকা ডাকে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, জঙ্গলী গাছে ফুল ফোটে, কিছু ভাবি না, কেবল তাকাইয়া দেখি, আর মনে পড়ে কোন্ কবি কাব্যে প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছিলেন—

"তোমাদের ভালবাসি,
পরাণে পাইলে ব্যথা তোমাদেরি কাছে আসি।"

দূর হইতে পরেশনাথ পাহাড়ের সৌন্দর্য্য চোখে যেন কেমন একটা ব্যথা জাগাইয়া তোলে!

—কিন্তু কই, এত ঘুরিলাম, এত দেখিলাম তবু প্রাণে আরাম ত পাইলাম না—এ হাহাকারের নিবৃত্তি যে কিছুতেই হয় না। মিছামিছি হাসিয়া, মিছামিছি ঘুরিয়া, কথা বলিয়া, কত ছলে, কত উপায়ে ইহাকে চাপা দিতে চাই, কিন্তু না গো না, এ জ্বলন্ত পিপাসা কিছুতেই ঘুচে না। সারা-দিন বেড়াই, অতিথি অভ্যাগত আসিলে আদর যত্ন করি, পিসিমার সেবা করি, চিঠিপত্র লিখিয়া আশ্রমের খোঁজ নিই, লিখি পড়ি, কিন্তু এত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রাণটা দিনে দিনে যেন অসাড় হইয়াই পড়িতেছে, দেহটা যেন কলের পুতুল!

নারীজীবনের সার্থকতালাভের প্রথম স্তর বিবাহ—আমার তাহা হইয়াছিল, কিন্তু আর সকলের যেমন করিয়া হয় আমার তাহা হইল না কেন? সে সব দিনগুলির কথা ভাবিতে বুকে একটা ঢেউ উঠে, কি সুখী হইয়াছিলাম, কত গভীর সে সুখ, কেমন উচ্ছ্বসিত সে ভালবাসা! সংসারের বিরুদ্ধে ঝগড়া করিয়া এক অমূল্যরত্ন আমি পাইয়াছিলাম, সে কি সুন্দর মূর্ত্তি, কেমন মিষ্টি তার কথা, কি অপূর্ব্ব তেজ, কি অপরিসীম বুদ্ধি আর জ্ঞান! মুগ্ধ হইয়া দেখিতাম, আর প্রাণ ভরিয়া কত আশা জাগিয়া উঠিত! ভালবাসায় মানুষকে কোমল করে, দেবতা করে, পৃথিবী জুড়িয়া ভালবাসিতে লাগিলাম। মনে হইয়াছিল ক্ষুদ্র লতা

আমি, তাঁহার আশ্রয়ে যে রসটুকু তাঁহা হইতে পাইব পৃথিবীতে তাহা বিলাইয়া দিয়া তাঁহারই সৌরভে, তাঁহারই স্নেহধারায় বিকশিত হইয়া উঠিব। তিনি আপনার গৌরবে আপনি পূর্ণ হইয়া থাকিবেন, আর তাঁহার সে কীর্ত্তি পৃথিবীতে আমিই ছড়াইব, তাঁহার নামের সঙ্গে আমার নাম এক হইয়া যাইবে, তাঁহার কীর্ত্তিধারায় আমার কর্ম্ম গলিয়া মিশিয়া যাইবে।

সহসা চাহিয়া দেখিলাম,—এ কি! তাঁহার সে উন্নত মস্তক যে একেবারে ধূলি লুণ্ঠিত! ক্ষুদ্র লতা আমি, গহন বনে আশ্রয় হারাইয়া আপনাকেও হারাইয়া ফেলিলাম যে! দেখিলাম, দূরে—বহুদূরে তিনি হেলিয়া পড়িয়াছেন,—এ কি, আর ত মাথা উঁচু করিয়া তাঁহার দিকে চাহিতে হয় না! তাঁহার মূর্ত্তি কি এত নীচে নামিয়া পড়িয়াছে! যিনি আপনার গৌরবে শির উঁচু করিয়াছিলেন, দীন ভিখারীর ন্যায় তাঁহার মুখে এ কি দীনতার চিহ্ন। কোন্ কলঙ্ক তাঁহার দেহে এ কালিমা মাখিয়া দিয়া গেল! হায় অদৃষ্ট, এত পরিবর্ত্তন! আমার ভয় হইল, আমি তাঁহার সে মূর্ত্তির দিকে তাকাইতে পারিলাম না, চক্ষু মুদিয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার সেই আগেকার গৌরবান্বিত দেবমূর্ত্তি আপনার হৃদয়ে দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে সে মূর্ত্তি আমার ধ্যানের বিষয় হইয়া উঠিল। চক্ষু মুদিয়া তাহাই দেখিতাম, তাহাই পূজা করিতাম।

আজ তবে আবার এ প্রলোভন কেন? তোমার এ মূর্ত্তির দিকে আজ কি আমি চাহিতে পারি? না, না,—ওগো তাহা হইলে যে আমার ধ্যানের মূর্ত্তি হাওয়ায় মিলাইয়া যাইবে, তাহার পর কি নিয়া আমি বাঁচিব? না না, তোমার এ মানবমূর্ত্তি নিয়া তুমি দূরেই থাক,—আর ইহলোকের এ বাকী ক'টা দিন তোমার সে দেবমূর্ত্তিই আমার পূজার সামগ্রী হইয়া থাক্, তা'ছাড়া আর কিছু চাহি না, কিছু জানি না।

এ দূরদেশে, খবর দিই নাই। কিছু বলি নাই তবু এ ঠিকানা কি করিয়া তিনি জানিলেন? খামের উপর সে পরিচিত হস্তাক্ষরে বুকের রক্তে কি তুফান যে তুলিয়াছিল!

তিনি লিখিয়াছেন, "তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না, সে অধিকার তোমার নাই, ভগবান সাক্ষী, তুমি আমার—আমার—আমার। তবু তোমার উপর এতটুকু জোরও চালাইতে পারিব না? একি তুমি আমার করিয়াছ! তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, আমার সর্ব্বস্বের অধিকারিণী, এবার নিজের অধিকারে ফিরিয়া এসো! একটিবার অনুমতি দাও, নিজে ছুটিয়া গিয়া তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়ি। মেয়েমানুষের কি এমন পাষাণ হইয়া থাকিতে হয়? ছিঃ—

"যাহার জন্যে তোমার আপত্তি, সে সকল কথা শুনিয়াছে। তুমি জান না, এ বিবাহে সুখ আমি কোন দিন পাই নাই, সেও পায় নাই। পিতৃ-সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী সে, সেই লোভেই বাবা আমার এ বিবাহ দিয়াছিলেন, সে-ও তাহার অর্থের মাপেই চিরকাল আপনার ওজন করিয়া আসিয়াছে, আমাকে সে কোন দিন চায় নাই, আমি হতভাগা, তাহাকে চাহিয়াছি,—পাই নাই। এবারকার কথা সব সে শুনিয়াছে এবং রাগ করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে—আর আসিবে না।

"আমি ঘৃণ্য, অপরাধী, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, কিন্তু তুমি আমায় দয়া কর—আর তুমি দূরে থেকো না—এবারে আমার চিরদিনের লক্ষ্মী ফিরে এসো।"

পড়িলাম—ভাবিলাম—কাঁদিলাম। ভগবান, কেন আর এত প্রলোভনে ডুবাও? একাকী থাকিতে চাই, কোথা হইতে কি আনিয়া আমার আরাধনার মধ্যে কলঙ্কের ছাপ দিয়া যাও?—

উত্তর দিলাম,—"স্বামী, তুমি দেবতা, কিন্তু তোমাদের উপর

হইতে সকল বিশ্বাস আমার চলিয়া গিয়াছে, পুরুষ মানুষকে আমি আর ভালবাসিতে পারিব না। তোমাদের প্রতি আমার ভক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি—আর হইবে না। তাই আমি একাকীই থাকিব, যাইব না, সে অনুরোধও আর করিও না।

"তুমি আমার ছিলে, কিন্তু এখন তুমি অন্যের। সুশীলার ঘরে গিয়া, সুশীলার সে রাজ্যে হাত দিতে কোন অধিকার আমার নাই,—প্রবৃত্তিও নাই। এক দিন যাহা নিজের হাতে কাড়িয়া নিয়াছ, আজ অন্যের পরশ লাগিয়া তাহা কলঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাহাকে নিয়া ঘর করা আমার আর চলিবে না।

"সুশীলা থাকুক বা না থাকুক, তাহার উপর কোন দিন আমার ভালভাব আসিবে না, এবং তুমি যে সুশীলারই স্বামী সে কথাও আমি ভুলিতে পারিব না।

"আজ আর ডাকিও না, যদি দিন আসে, সুশীলার প্রতি আমার মনের এ ভাব যদি কাটিয়া যায়, তুমি সুশীলার স্বামী জানিয়াও যদি তোমায় শ্রদ্ধা করিতে পারি, তখন যাইব। আজ আর আমায় ডাকিও না।"

চিঠি লিখিয়া অকারণে একাকিনী অনেকক্ষণ বসিয়া কাঁদিলাম,—কিন্তু হোক্, এখন ত যাইতে পারিব না,—ওগো, তুমি কি আমার খেলার জিনিষ!—

* * * * *

সন্ধ্যার পর আঁধার বারাণ্ডার পিসিমার বুকে মাথা রাখিয়া বলিলাম, "গিরিধি দেখা হয়ে গেছে পিসিমা, এবার ফিরে যাই চল।"

"কোথায় ঘুরে মরবি, অভাগী—বল্, শান্তি তোর কোথাও নাই।"

"আছে পিসিমা, আছে—তোমার বিশ্বেশ্বরের পায়ের তলায়ই

আমায় নিবেদন করে দাও, সকল ভার আমার তিনিই বইবেন, শান্তিও আমার সেখানেই হবে।"

তাহাই ঠিক হইল। মনটা কেমন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, আজ এই মুহূর্ত্তেই রোয়ানা হইতে পারিলে যেন ভাল হইত, অশান্ত চিত্ত অপেক্ষা করিতে আর চায় না। জিনিষপত্র অল্প স্বল্প যাহা কিছু সব গুছাইয়া ফেলিয়াছি, কালই যাইব।

ওগো বিশ্বেশ্বর আমার মনের এ ছলনাটুকু তুমি ধরিয়ো না,—আমি যে তোমার কাছে যাইতে চাহিতেছি না, আমি যে আমার বিশ্বেশ্বরের ধ্যান করিতে যাইতেছি, সে কথা তোমার কাছে কি গোপন করা চলে? এত বছরের পর, যেখানে যে ঘরটিতে মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, সে জায়গাটুকু আঁকড়িয়া ধরিয়া আমি পড়িয়া থাকিব।

তাঁহাকে ছলনা করিয়াছি, কিন্তু এ মনকে এখন আর ছলনা করা চলে না ত! আমি গোপন মন্দিরে বসিয়া তাঁহার আরাধনা করিতে করিতে চলিয়াছি, সেই এক মুহূর্ত্তটিকেই শত সহস্ররূপে ভাবিয়া, চিন্তা করিয়া তাহার সকল রসটুকু নিঃশেষে পান করিতে চলিয়াছি। এ জীবনে বাকী যেটুকু আর হইল না, তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিব,—পরলোকেও কি ঠাকুর তুমি সদয় হইবে না? কাশী চলিয়াছি—তাঁহারই স্মৃতির উদ্দেশে, কিন্তু তিনি যে সুশীলার, সে কথা ত ভুলিতে পারি না! মনে তবু এইটুকু সান্ত্বনা থাকিবে যে *প্রত্যাখ্যাত হই নাই, প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।*

৩৪

আবার কাশীতে......

আবার সে-ই কাশী,—লোকে এখানে তীর্থ করিতে আসে, আমিও তাই আসিয়াছি; বড় জ্বালায় জ্বলিয়া লোকে এখানে শান্তি পাইতে আসে, আমিও তা-ই আসিয়াছি—কিন্তু লোকের সে আসা, আর আমার এ আসা কি এক!——কাশীনাথ, বিশ্বেশ্বর, আমার এ ছলনা তুমি ক্ষমা করিয়ো প্রভু, বহু চেষ্টা করিয়াও তোমাকে আমি উচ্চাসন দিতে পারিলাম না! কিন্তু তোমার উপর যতটুকু, যেটুকু আকর্ষণ আমার আসিয়াছে—সে যে তাঁকে ভালবাসি বলিয়াই!

......ভুলিতে পারি না,......কত দিন কত বচ্ছর পরে সেই যে একটা মাত্র মুহূর্ত্ত আমার আসিয়াছিল, তাহা যে এ মনখানির উপর আমার, অনন্ত অসীম হইয়া, যুগ-যুগান্তের ভালবাসার কাহিনী লইয়া একমাত্র সত্য হইয়া আছে, তাহাকে ত ভুলিতে পারি না।—এ যেন চুম্বকের আকর্ষণ! শত সহস্র কাজের ভিতর হইতে, কত কিছুর বন্ধন হইতে, এই কক্ষখানি আমায় বারে-বারেই খালি এ কিসের টানে টানিয়া আনে!

—কিন্তু, তবু ভাল লাগে না! এ কেমন একটা চঞ্চল অস্বোয়াস্তির ভাব!—আহার নিদ্রা ভাল লাগে না, লেখা পড়া ভাল লাগে না, বলিতে লজ্জা হয়, আমার এ রুগ্ন পিসিমার সেবা করাটাও যেন ক্রমে তিক্ত হইয়া উঠিতেছে,—এ কি, এ আমার এ-কি হইল!

কিন্তু, পিসিমার কাছ হইতে উঠিয়া আসিলেও ত কাজ কিছু

খুঁজিয়া পাই না, কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই, এ ঘর হইতে ও ঘরে ছুটাছুটি করিয়া মরি।

কালরাত্রে পিসিমার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া, খোলা জানালার পথে নীল আকাশে চাঁদটী দেখিতেছিলাম। চাঁদের হাসিতে কি মাদকতা ছিল কে জানে! দেখিতে দেখিতে কেমন কি জানি আনমনা হইয়া পড়িলাম। এ চাঁদ এ জীবনে কতবার দেখিয়াছি, এ জ্যোৎস্নায় মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কত দিন কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছি।

মনে মনে কল্পনার স্বপ্নরাজ্য গড়িয়া, সেই অতীতের যুথিকাটার কাছে একবার গেলাম। দেখিলাম কাহার অসীম প্রেমে ভরপুর, কাহার প্রাণঢালা অগাধ বিশ্বাসের গর্ব্বে গর্ব্বিতা হাসিখুসি মেয়েটি! ভবিষ্যতের এই সব ভাঙ্গাচোরা জোড়াতাড়া দিনগুলির মাঝখানে তখনকার এক একটী দিন যেন শ্যাওলা-পড়া পুকুরের মাঝখানে শতদলটীর মত ফুটিয়া উঠিল, এবং আজিকার এই শোকে তাপে জর্জ্জরিত, জীবনের ভারে পীড়িত জড়প্রকৃতি যুথিকার সমুদয় চিত্তখানি কিসে যেন আকর্ষণ করিয়া, তাহারই মর্ম্মকোষের ভিতর নিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিল। পীড়িতা পিসিমার সেবা ভুলিয়া আমি তাহাতেই ডুবিয়া রহিলাম।

ভাবিতে ভাবিতে কখন কে জানে, পিসিমার কপাল টিপিতে টিপিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ভোরবেলা কি একটা শব্দ শুনিয়া, জাগিয়া দেখিলাম অতিকষ্টে উঠিয়া নিজে পিসিমা কলসী হইতে জল গড়াইয়া খাইতেছেন,—দেখিয়া কষ্ট হইল, এবং পূর্ব্বরাত্রির আমার সুখের কল্পনা, ও তাঁহার প্রতি আমার অমনোযোগিতার অপরাধ আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। এই পিসিমা ছাড়া আমার আর কে আছে? কিন্তু তাঁহারই রুগ্নশয্যায় বসিয়াও আমার অন্য চিন্তা কেন? শুধু তাঁহাকেই আরাম দিবার চিন্তা যদি আমার থাকিত, তাহা হইলে কি এমনই ভাবে নিশ্চিন্ত

ঘুম আসিয়া আমায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারিত ?—আমার এ অমনোযোগিতা, এ অন্যমনস্কতা পিসিমার তীক্ষ্ণদৃষ্টির অন্তরালে আমি লুকাইতে পারি নাই,—নহিলে ক'দিন হইতেই কেন পিসিমা, অত বারে বারে কেবলই বলিতেছেন 'ওরে, যতীনকে খবর দে, একটীবার সে আসুক।'

কিন্তু দাদার কথা ভাবিতে গেলেই মনটা যেন আমার ছোট হইয়া আসে। পিসিমার অসুখের এ খবর ত তার অজানা নাই, তবু আপনি সাধিয়া তাহাকে আমি আসিতে লিখিব পিসিমাকে দেখিতে, কাজ নাই তার এমন দেখায় !

সেদিনের তা'র একটা চিঠি পড়িয়া মাথাটা আমার গরম হইয়া উঠিয়াছিল,—'দু'দিনের একটা মেয়ের শোকে অধীর মৃণালকে ফেলিয়া, কি করিয়া সে কাশী আসে ! যদিও আসা খুবই উচিত।'......ধিক্......তাও, মেয়ের শোকটা ত নতুন নয়, মাসখানেকেরও বেশী হইয়াছে। বড় দুঃখে তবু এই ভাবিয়া মনটাকে ঠাণ্ডা করিতে চাহিলাম, যে উচিত অনুচিতের জ্ঞানটুকু দাদার আমার এখনো আছে ! কিন্তু তাহার পর দিনই এমন একখানা চিঠি পুরী হইতে পাইলাম, যাহা পড়িয়া আমার আনন্দ কি বিষাদ, সুখ কিংবা দুঃখ, কি যে হইল, ঠিক বলিতে পারি না,—দুর্ব্বল মন কোনোটাকেই যেন প্রাধান্য দিতে চাহে না—কিন্তু, এ কি পরিবর্ত্তন আমার প্রকৃতিতে আজ আসিতে চাহে !......চিঠিখানা অবহেলার ভাবে দেওয়ালের ওধারের ঐ তাকটায় রাখিতে গিয়া, কতকগুলো উইএর ঢিপি দেখিয়া মনটা আপনি অজ্ঞাতে সরিয়া আসিল, —নিজের ভাব দেখিয়া হাসিতে গিয়া চোখে আমার জল আসিয়া পড়িল।

শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভাবনাটা যেন আপনি আসে! পিসিমার অসুখ, সে খবর ত এখান হইতে তাঁহাকে কেহ দেয় নাই, তবু এ সব সংবাদ তিনি কেমন করিয়া রাখেন কে জানে! পিসিমার অসুখ, তাই তিনি তাঁহার সেবা করিতে আসিতে চান, একটীবার তবু নাকি আমার অনুমতির প্রয়োজন! ধিক্, তুমি পুরুষ মানুস, তোমার দুর্ব্বলতা দেখিয়া লজ্জায় আমার মরিতে ইচ্ছা হয়। আমার স্বামীকে বারবার অত ছোট দেখিতে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। অত যদি বাসনা জন্মিয়াই থাকে, তবে কি নিজের ন্যায্য অধিকারটী তুমি আপনা হইতে বিস্তার করিতে পার না? বারে বারেই কেন এ অনুগ্রহ ভিক্ষা! তোমার নিজের পৌরুষ দেখিতে পাইলে আমার নীরীহৃদয় আপনি কি নত হইতে পারিত না?—আমি সে চিঠির উত্তর দি'ই নাই, কিন্তু কেন জানি না, প্রতিদিন পিয়নকে দেখিলেই মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া ওঠে!

পিসিমার অসুখ বাড়িয়াই চলিয়াছে, ডাক্তার বলিয়াছে—এ বুড়ো বয়সের রোগ, কিছুতেই সারিবার নয়। সারিবার নয়—তাহা ত বুঝি, মনকেও সে জন্যে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ভয়ঙ্কর ভাবনা যে আমার সমস্ত প্রাণ মনকে অনুক্ষণ জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে, এর আমি কি করি? পিসিমা বলিতেছিলেন, "মা, এবারে আর অভিমান করে থাকা ত সাজবে না মা, যতীনকে চিঠি লিখে দাও সে এসে তোমায় নিয়ে যাবে, আমার মেয়াদ ত ফুরিয়ে এল, বড় জোর আর ছ'সাত দিন।"

—কিন্তু তাও কি হয়?—মৃণালের ঘরে গিয়া তার কর্ত্তৃত্ব সহ্য

করা—অসম্ভব! পিসিমাকে বলিলাম, "পিসিমা, আর যদি কোন পথ না থাকে, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই বিষ খেয়েই আমি যাব, তবু দাদার ঘরে যেতে আমায় বলো না।"

ভাবিতেছি, নারী প্রকৃতি ভগবান কি করিয়া সৃজন করিয়াছেন! অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে কিছুতে কি সে জীবন ধারণ করিতে পারে না? সে কি চিরকাল কেবল সেবা করিবার, ভাল বাসিবার এবং অশ্রু ফেলিবার জন্যই? এ নিয়ম কি চিরকাল থাকে? মনে যদি বিরোধ আসিয়াছে, তথাপি গণ্ডি ছাড়িয়া একতিল বাহিরে যাইবার শক্তি নাই কেন?—কিন্তু পুরুষ মানুষের জন্য তাঁহার এ কি করুণা! সে নিয়ম লঙ্ঘন করিবে, সে উচ্ছৃঙ্খল হইবে, সে প্রতারক মিথ্যাবাদী চোর হইবে, আগাগোড়া জীবনটাতে তার আমরণ ভাঙ্গনগড়ন চলিবে, তথাপি সে-ই কি দেশের শক্তি, সে-ই কি নারীর অবলম্বন!

দাদা টেলিগ্রাম করিয়া জানিতে চাহিয়াছে—পিসিমার অবস্থা কেমন? পড়িয়া আমার হাসি পাইল, এখনো তা হ'লে আমাদের জন্যে তার মনে এতটুকু স্থান আছে? একটা কথা মনে পড়িতেছে, মার পুরণো ঝিকে পিসিমার সেবার জন্য মাস দুই আগে কাশীতে আনাইয়াছি, তার মুখে এমন একটা কথা শুনিয়াছিলাম যাহাতে মনে সেই শৈশব-সুখের স্মৃতিটুকু একটু স্পর্শ দিয়া গিয়াছিল। আমাদের কলিকাতার বাসায় যে ঘরখানিতে আমার জীবনের কয়েকটী মূল্যবান বছরের সুখ-দুঃখ-বিরহ মিলনের ছায়াটুকু লাগিয়া রহিয়াছে, আমি আসিবার সময় সে ঘরটীর ভার দাদার উপর দিয়া আসিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, আমার এ খাটে কেউ যেন কখনো না শোয়, আমার এ টেবিল চেয়ার কেউ যেন কখনো না ব্যবহার করে। দাদা সে কথা শুনিয়াছিল এবং স্বহস্তে সে ঘরে তালাচাবি দিয়া বন্ধ করিয়াই

রাখিয়াছিল। ইহার পর কবে না কি এক দিন মৃণাল তার বোন ও ভগ্নীপতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া অতিথির তৃপ্তির জন্যে আমার ঘরখানিতেই তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। দাদা সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া, সমস্ত ঘটনাটা দেখিয়া অত্যন্ত রাগ করিয়া আবার তৎক্ষণাৎই নিজের হাতে সে ঘর বন্ধ করিয়া আসিল। ইহার পর স্বামী-স্ত্রীতে বহুদিন মনোমালিন্য চলিয়াছে, কিন্তু দাদাই আগে ক্ষমা চাহিয়া, নামা রকমে তাহার গভীর পত্নীপ্রীতির পরিচয় দিয়া মৃণালের রাগ ভাঙ্গাইয়াছে। তথাপি, কখনো কিন্তু মৃণালের নিমন্ত্রিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের সেবার জন্য বাড়ীর সকলের সেরা সেই সুন্দর কক্ষটি মৃণালের শত ইচ্ছা সত্বেও এক দিনের জন্যও খুলিয়া দেয় নাই। দাদার এই কোমল মূর্ত্তিটী আমার কাছে কত সুন্দর,—ভাবিতে যেন চোখে জল আসে! দাদাকে ত মন্দ আমি কখনো বলি না, কিন্তু সে যে আপনার পৌরুষটীকে পর্য্যন্ত পত্নীপ্রীতির তলে ডুবাইয়া রাখিয়াছে, তাহাই যে আমার কিছুতে সহ্য হয় না। আর, তাহা না হইলেও, বোধ হয় আমার কুমারী জীবনের সেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মৃণালকে আমি, কিছুতেই সহিতে পারিতাম না।

যাক—দাদাকে আসিতে আমি ত কখনো লিখিব না, একবার চুপ করিয়া, শক্ত হইয়া বসিয়া দেখিব, তাহার নিজত্ব তাহার মধ্যে আর কতটুকু আছে!—

—শেষ !......

সব—সব শেষ হইয়া গেল !......

কাল গভীর রাত্রিতে, ঝড়ে জলে যখন পৃথিবীখানি আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, আমার পিসিমা তখনই আমায় ছাড়িয়া গিয়াছেন ! আগে হইতে ত সকলই জানিতাম, প্রস্তুত হইয়াই ত ছিলাম, তথাপি কেন বুকের ভারটা এমন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে ?...সহে না গো—আর সহে না ! এত কষ্টের পর এ যে আর কিছুতেই সহে না...বড় গর্ব্ব করিয়া পিসিমাকে বলিয়াছিলাম, 'আমার জন্য ভেবোনা পিসিমা, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আত্মহত্যা করে মরব।' পিসিমা নিশ্চিন্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তাই করিস অভাগী, সংসার ভোগ কর্ব্বার মত ভাগ্য ত তোর নয় কাউকে যখন সইতেও পারিস না, তখন মরাই তোর মঙ্গল। ওরে, আমার আগেই যদি তুই মরতিস্, মরবার সময় এ জ্বালা নিয়ে ত তবে আমায় যেতে হোত না !—তাই, মরিতেই গিয়েছিলাম, কিন্তু আফিংএর কৌটাটা হাতে তুলিয়াও মুখে দিতে ত হাত আর উঠিল না। এ কি রহস্য মানুষের জীবনের ! মৃত্যু যখন এত কাম্য, তখন তাহাকে হাতের কাছে পাইয়াও এই চিরদগ্ধ চির-অভিশপ্ত জীবনটার উপরও মায়া আসিল ! তখন কোথা হইতে সহস্র কামনারাশি নানাবিধ রঙ্গীনরূপে ফুটিয়া উঠিয়া জীবনটাকে প্রলোভিত করিতে লাগিল। হায় রে, এ জীবনটাতেও কি আবার সুখের আশা আছে ?...

কিন্তু আমি এখন কি করি ? এই বাঁচিয়া থাকার ভারটা কোথায়, নিয়া ফেলি ! মনে মনে অহঙ্কার ছিল আমার সাহায্যের জন্য কাহাকেও

চাই না, আমি একাকীই আমার সব। সে অহঙ্কার গেল কোথায়? এ কি আশ্চর্য্য, আমাদের মাতা মাতামহীদের যুগ হইতে, আজন্মকাল ধরিয়া যে সংস্কার তাঁহাদিগকে বর্দ্ধিত করিয়া আসিয়াছে, পালন করিয়া আসিয়াছে, তাহা এই দীন ভারতের আকাশে বাতাসে জলে স্থলে এমনিভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, যে নারীজগতে আজ শত সহস্রভাবে বিদ্রোহের সূচনা সত্ত্বেও সমাজের কোনও গৃহ হইতে কোনও নারীর প্রকৃতি হইতে তাহা কি কিছুতেই দূরীভূত হইয়া গেল না! এ কি ভীষণ প্রভাব সংস্কারের!

নারী-জীবনের একাকিত্ব কি এত ভয়ঙ্কর! কিন্তু এত দিনই বা পিসিমা আমার কি কাজে লাগিতেন? তিনি বাঁচিয়া আমার ঘরটী পূর্ণ করিয়া ছিলেন এইমাত্রই নয় কি? কিন্তু তবু তিনি আছেন এই সাহসটাই যে আমার সবখানি মন পূর্ণ করিয়াছিল, আজ যে তাঁহার অভাবে চতুর্দ্দিকে কেবল দানবের রক্তচক্ষু দেখিতে পাইতেছি। ওগো, আজ আমি কি করি! শুনিয়াছিলাম বিশ্বেশ্বর নাকি দয়াময়; কিন্তু তিনিও ত পায়ে স্থান দিলেন না। তিনি যে ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন,—"দূর হ!"......

গা'টা যেন জ্বলিতেছে। তাই ত, আমি যাই কোথায়? সংসার যদি নাই, আশ্রয়ও যদি নাই, ভগবানও বিরূপ, তবে কি নিজের পায়ের ক্ষুদ্র বল নিয়া আপনি একবার দাঁড়াইয়া দেখিব? তবে তাই হোক্, তাই হোক্। মনটা আমার,—একবার সংসারের বিরুদ্ধে সংহার মূর্ত্তি নিয়া দাঁড়াত' দেখি, রাজপুতনার মেয়েদের মত আপনাকে রক্ষা করিতে, সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে একবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াত' দেখি! কে বলে নারী ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, শক্তিহীন? একবার সে জাগিয়া উঠুক দেখি! পায়ের শৃঙ্খল সকলের কাটে না বটে কিন্তু, যার কাটিয়াছে সে-ই একবার